পরিবর্তনশীল বিশ্বে

আন্তর্জাতিক আইন

International Law in a Changing World

ড. মিজানুর রহমান
অধ্যাপক, আইন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সূচিপত্র

মামলার তালিকা

প্রারম্ভিক

Introduction

আইন ও রাষ্ট্র অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একটি ছাড়া অপরটির অস্তিত্ব অসম্ভব। আদিম সমাজে এদের যেমন কোন অস্তিত্ব ছিল না, তেমনি শ্রম বিভাজনের মাধ্যমে সৃষ্ট একটি শ্রেণী বিভক্ত সমাজে এদের উৎপত্তিও ঘটেছে একসাথে। আইন হচ্ছে কতগুলো নিয়মের সমষ্টি, যা নিয়ন্ত্রণ করে জীবন প্রণালী। আইনের বাধ্যকরী শক্তিটি আসে রাষ্ট্রের কাছ থেকে। আবার রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যও এই নিয়মগুলো অত্যাবশ্যক।

আইন ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, ব্যক্তির সাথে রাষ্ট্রের, আবার প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রতিষ্ঠানের বা রাষ্ট্রের সম্পর্ক আলোচনা করে। আর আইনের যে বিশেষ শাখা স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে দিক নির্দেশনা দেয়, তাকেই বলা হয় 'আন্তর্জাতিক আইন।' আন্তর্জাতিক আইনের এই সংজ্ঞা সরলিকৃত এবং একেবারে গোড়ার দিকের।

আন্তর্জাতিক আইনের সংজ্ঞা

লর্ড বার্কেনহেডের মতে, আন্তর্জাতিক আইন হলো সভ্য সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক স্বীকৃত কিছু নিয়মের সমষ্টি, যা রাষ্ট্রসমূহ তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাধ্যকরী বলে বিবেচনা করে।

সেমন্ড (Salmond) আন্তর্জাতিক আইনকে সংজ্ঞায়িত করেছেন প্রথাগত আইনের একটি বিশেষ প্রজাতি হিসেবে, যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আন্তর্জাতিক সম্মতির মাধ্যমে। তাঁর এই সংজ্ঞার সূত্র ধরে এই সম্মতিকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে – (ক) প্রকাশ্য সম্মতি (বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তি), (খ) প্রচ্ছন্ন সম্মতি (বিভিন্ন রাষ্ট্র কর্তৃক চর্চাকৃত প্রথা ও রীতিনীতি)। একই রকম ধারণা পোষণ করেন ওপেনহেইম (Oppenheim)।

আন্তর্জাতিক আইনের উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলোর আরেকটু বিস্তৃত রূপ পাওয়া যায় জে.জি. স্টার্ক (J.G. Starke) এর সংজ্ঞায়। তিনি আন্তর্জাতিক আইনকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে– 'আন্তর্জাতিক আইন হলো কতগুলো নীতি এবং আচরণ বিধি, যা পালনে রাষ্ট্রসমূহ নিজেদেরকে বাধ্য বিবেচনা করে এবং তদানুসারে তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই নীতিসমূহকে অনুসরণ করে।'

স্টার্কের সংজ্ঞার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে, তিনি আন্তর্জাতিক আইনের সঙ্গে সে সমস্ত নিয়ম নীতিও যোগ করেছেন, যা আন্তর্জাতিক সংগঠন ও ক্ষেত্র বিশেষে ব্যক্তিকেও আন্তর্জাতিক আইনের বিষয়বস্তু বলে পরিগণিত করেছে।

রাষ্ট্রীয় আইন ও আন্তর্জাতিক আইনের পার্থক্য

আন্তর্জাতিক আইন ও রাষ্ট্রীয় আইনের মধ্যকার পার্থক্য বহুবিধ। একটি হচ্ছে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের আইন আর অপরটি রাষ্ট্রীয়– এই সরল বক্তব্যই এ দুইয়ের মধ্যকার পার্থক্য সূচিত করার জন্য যথেষ্ট নয়। বিষয়বস্তু, লক্ষ্য, ভিত্তি, প্রকৃতি, এখতিয়ার ইত্যাদি অনেক বিষয়কে কেন্দ্র করেই আমরা আন্তর্জাতিক আইন ও রাষ্ট্রীয় আইনের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারি। তবে এক্ষেত্রে এটাও মনে রাখতে হবে যে, এই পার্থক্যগুলো আন্তর্জাতিক আইন ও রাষ্ট্রীয় আইনের গভীর সম্পর্ককে প্রভাবিত করে না।

১. **বিষয়বস্তু :** আইনের বিষয়বস্তু বলতে তাদেরকেই বোঝায়, যাদের উপর আইন অধিকার ও দায়িত্ব বর্তিয়েছে। রাষ্ট্রীয় আইনের বিষয়বস্তু হলো প্রাকৃতিক ব্যক্তি, আইনগত ব্যক্তি, আবার আইনগত ব্যক্তি হিসেবে কখনো কখনো রাষ্ট্র।

   উল্টোদিকে আন্তর্জাতিক আইনের বিষয়বস্তু মূলত: রাষ্ট্র। আন্তর্জাতিক আদালতে কোন ব্যক্তির অবস্থান নেই। তবে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহকেও আন্তর্জাতিক আইনের বিষয়বস্তু হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যেমন– জাতিসংঘ, বিশ্ব খাদ্য সংস্থা ইত্যাদি। আবার খুব সীমিত ক্ষেত্রে ব্যক্তি বিশেষকেও আন্তর্জাতিক আইনের বিষয় বলে বিবেচনা করা হয়। স্বৈরশাসক পিনোশের বিচারের উদাহরণ থেকে এটা ধারণা করা হয় যে, মানবাধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যক্তি বিশেষও আন্তর্জাতিক আইনের বিষয়বস্তু হতে পারে। তবে অবশ্যই এই ধারণা খুবই সংকীর্ণ অর্থে প্রয়োগযোগ্য। আন্তর্জাতিক আইনের মূলনীতি অনুসরণে একে বিষয়বস্তু হিসেবে বিবেচনার সুযোগ কম। তবে প্রাসঙ্গিকভাবে এখানে এটাও উল্লেখ করতে হয় যে, আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালতে (ICC) ব্যক্তিকে আন্তর্জাতিক আইনের বিষয়বস্তু বিবেচনা করা হবে। কাজেই ব্যক্তিকে আন্তর্জাতিক আইনের বিষয়বস্তু হিসেবে বিবেচনার সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। এটি একটি বড় ধারণাগত পরিবর্তন।

২. **লক্ষ্য :** রাষ্ট্রীয় আইনের লক্ষ্য হলো রাষ্ট্রের নাগরিকদের অধিকার সংরক্ষণ করা এবং নাগরিকদের মাঝে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা। অপরদিকে আন্তর্জাতিক আইন, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তাকেই লক্ষ্য বিবেচনা করে। বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রসমূহের পারস্পরিক সম্পর্কে যেন আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত না হয়, আন্তর্জাতিক আইনের লক্ষ্য সেটাই।

৩. **আইন প্রণয়ন :** রাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়নের জন্য পৃথক প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব আছে। আইন প্রণেতারা রাষ্ট্রের জন্য সময়োপযোগী আইন প্রণয়ন করে থাকেন। কিন্তু আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়নের জন্য এমন কোন পৃথক প্রতিষ্ঠান নেই। রাষ্ট্রসমূহ বিভিন্ন সময়ে সম্মেলনে যোগদান করে পারস্পরিক আলোচনা সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ হয়। এই চুক্তিই আন্তর্জাতিক আইন হিসেবে প্রয়োগ করা হয়। এছাড়াও কিছু প্রথাও আইনের মর্যাদা লাভ করে থাকে।

৪. **আইন প্রয়োগ ব্যবস্থা :** রাষ্ট্রীয় আইন প্রয়োগ ব্যবস্থা সুসংজ্ঞায়িত ও নির্ধারিত। যখনই কোন আইন ভঙ্গ করা হয়, তার জন্য ক্ষেত্রমত শাস্তি, জরিমানা, ক্ষতিপূরণ ইত্যাদির ব্যবস্থা আছে। অপরদিকে, আন্তর্জাতিক আইন প্রয়োগের জন্য এখন পর্যন্ত খুব সুদৃঢ় কোন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে নি। আন্তর্জাতিক আদালত থাকলেও তার এখতিয়ার এখনো রাষ্ট্রসমূহের সম্মতি সাপেক্ষ। এছাড়াও রায় প্রয়োগ করার ক্ষেত্রও খুব সীমিত।

৫. **আইনের ভিত্তি :** রাষ্ট্রীয় আইনের ভিত্তি হলো সার্বভৌমত্ব। এই সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের একটি অপরিহার্য উপাদান। এই ক্ষমতা বলেই রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করে। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এমন কোন একক সার্বভৌম প্রতিষ্ঠান নেই, যার অস্তিত্ব, সকল রাষ্ট্রের উপরই কর্তৃত্বশীল। রাষ্ট্রসমূহের সমঝোতাপূর্ণ সম্মতিই আন্তর্জাতিক আইনের ভিত্তি।

৬. **আইনের গণতান্ত্রিক প্রকৃতি :** আইনের গণতান্ত্রিকতা নির্ধারণ করা হচ্ছে প্রণয়ন প্রক্রিয়াকে বিচার্য্য ধরে। আগেই বলা হয়েছে, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আইন প্রণয়ন করার জন্য প্রতিষ্ঠান থাকে। পৃথিবীর অধিকাংশ আইন সভাতেই কিছু কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া আইন প্রণীত হয় সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায়। কিন্তু আন্তর্জাতিক আইনের ভিত্তি যেহেতু রাষ্ট্রসমূহের সম্মতি, কাজেই আইন বাধ্যকরী হতে হলে সকলের সম্মতি প্রয়োজন। কাজেই এখানে সকলের অর্থাৎ সকল পক্ষ-রাষ্ট্রসমূহের সম্মতির মাধ্যমেই আইন প্রণীত হচ্ছে। কাজেই এই ব্যবস্থা অনেক বেশি গণতান্ত্রিক।

৭. **এখতিয়ার :** রাষ্ট্রীয় আইনের এখতিয়ার রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে, এর বাইরে নয়। আন্তর্জাতিক আইন স্বাভাবিক বিচারেই এই সীমাবদ্ধতা হতে মুক্ত।

আন্তর্জাতিক আইনের শ্রেণীবিভাগ

আন্তর্জাতিক আইনকে দু'টি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায় :

ক. রাষ্ট্রকেন্দ্রিক আন্তর্জাতিক আইন (Public International Law)

খ. ব্যক্তিকেন্দ্রিক আন্তর্জাতিক আইন (Private International Law)

অধ্যায়ের শুরুতে আমরা আন্তর্জাতিক আইনের যে সব সংজ্ঞাগুলো আলোচনা করেছি, মূলত: সেগুলোই হলো Public International Law এর সংজ্ঞা, এক সময় Public বা রাষ্ট্রকেন্দ্রিক আন্তর্জাতিক আইন বলতে আন্তর্জাতিক অঙ্গনের সেই সব নিয়ম-নীতিকেই বোঝাত, যা শুধুমাত্র বিভিন্ন রাষ্ট্রের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করতো এবং অপর দিকে Private বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক আন্তর্জাতিক আইন বিভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যকার ব্যক্তি পর্যায়ের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করতো। কিন্তু কালের আবর্তনে এই সীমাবদ্ধতার গণ্ডি ভেঙ্গে গেছে এবং এখন ব্যক্তি বিশেষও মাঝে মাঝে রাষ্ট্রকেন্দ্রিক আন্তর্জাতিক আইনের বিষয়বস্তু বলে বিবেচিত হ[illegible] কাজেই প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় Private বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক আন্তর্জাতিক আইনের [illegible] সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞার।

Private বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক আন্তর্জাতিক আইন হলো আন্তর্জাতিক আইনের সেই শাখা, যা 'আইনের দ্বন্দ্ব (Conflict of Law) নিরসনে পরিচালিত হয়। আরও সহজভাবে বললে, আন্তর্জাতিক আইনের যে শাখা এমন একটি বিরোধপূর্ণ বিষয়ে, যাতে 'বৈদেশিক উপাদান' (foreign element) বিদ্যমান, নির্ধারণ করে দেয় কোন দেশের আইন প্রযোজ্য হবে কিংবা এই বিরোধ-মীমাংসার জন্য কোন দেশের আদালত এখতিয়ার সম্পন্ন, তাকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক আন্তর্জাতিক আইন বলে। অর্থাৎ, কোন একটি সম্পর্কের মধ্যে যদি বৈদেশিক উপাদান বিদ্যমান থাকে, তাহলে সেটা ব্যক্তিকেন্দ্রিক আন্তর্জাতিক আইন।

এখানে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, বৈদেশিক উপাদান বা Foreign Element বিষয়টি কি? নিম্নোক্ত চার ধরনের কোন একটি সম্পর্কের মধ্যে বিদ্যমান থাকলে তাকে Foreign Element বলা যাবে :

১. যদি সম্পর্কের কোন একটি পক্ষ বিদেশী আইনের বিষয়বস্তু হয়। উদাহরণ : বাংলাদেশের কোন যুবক যদি পশ্চিম বাংলার কোন মেয়েকে বিয়ে করে, তবে এই সম্পর্কে বিদেশী উপাদান বিদ্যমান।

২. যদি বিরোধের হেতু কোন বিদেশী এখতিয়ারাধীনে উদ্ভূত হয়। উদাহরণ : সেই ভারতীয় স্ত্রী'কে বাংলাদেশে তালাক দিলে, সেখানে বৈদেশিক উপাদান বিদ্যমান। যেহেতু বিবাহের ঘটনাটি ঘটেছে বিদেশী আইনের অধীনে বা অন্য একটি রাষ্ট্রের এখতিয়ারাধীনে। তেমনিভাবে ভারতীয় আদালতের জন্য বাংলাদেশে দেওয়া 'তালাক' একটি বৈদেশিক উপাদান।

৩. যদি সম্পত্তি বা দাবির বিষয়বস্তু বিদেশে অবস্থিত হয়। উদাহরণ : বিবাহ বিচ্ছেদের পর কনে পক্ষ বিবাহের সময় উপহার দেয়া গাড়ি ফেরত চায়, তবে সেখানে বৈদেশিক উপাদান বিদ্যমান, যদি গাড়িটি তখন বাংলাদেশের ভূ-খণ্ডে থাকে।

৪. কোন বিদেশী আদালতের রায় অথবা সেই রায়ের স্বীকৃতি। উদাহরণ : 'খ' কে ভারতীয় আদালত ৩ মাসের কারাদণ্ড দিল। বাংলাদেশী দূতাবাস তাকে এই শর্তে ফিরিয়ে আনলো যে তার শাস্তি বাংলাদেশে প্রদান করা হবে। এখানে বৈদেশিক আদালতের সিদ্ধান্ত একটি বৈদেশিক উপাদান।

উপরোক্ত উপাদানগুলোর কোন একটি বর্তমান থাকলে, তা ব্যক্তিকেন্দ্রিক আন্তর্জাতিক আইনের বিষয়বস্তু।

রাষ্ট্রকেন্দ্রিক আন্তর্জাতিক আইনকে আরও দুই ভাগে বিভক্ত করা যায় :

ক. সার্বজনীন আন্তর্জাতিক আইন

খ. আঞ্চলিক আন্তর্জাতিক আইন

যে আইনটি সার্বজনীনভাবে সকল স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, পারস্পরিক সম্মতির মাধ্যমে সৃষ্ট, সেটাই সার্বজনীন আন্তর্জাতিক আইন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, জেনেভা কনভেনশনসমূহের কথা। ১৯৪৯ সালের এই কনভেনশনগুলো সমগ্র বিশ্বের সকল প্রান্তের যুদ্ধবন্দি ও যুদ্ধাহতদের প্রতি প্রযোজ্য। একই ভাবে বলা যায়, জাতিসংঘ সনদের কথা।

অপরপক্ষে, শুধুমাত্র একটি অঞ্চলের ক্ষেত্রে যে আন্তর্জাতিক আইন প্রযোজ্য, গৃহীত ও স্বীকৃত, তাকে আঞ্চলিক আন্তর্জাতিক আইন বলা হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, সার্ক সনদ, ন্যাটো সনদ ইত্যাদির কথা। আঞ্চলিক আন্তর্জাতিক আইন, আন্তর্জাতিক আইনের মর্যাদা লাভ করে। নিম্নোক্ত মামলাটি তারই প্রমাণ বহন করে।

মামলা : The Asylum Case; রাজনৈতিক আশ্রয় মামলা, (Columbia Vs. Peru, ICJ, 1950)

মামলার ঘটনা : ভিক্টর রাউল হায়া দেলা টোরে ছিলেন পেরুর একজন রাজনৈতিক নেতা। ১৯৪৮ সালে পেরু সরকার তার বিরুদ্ধে সামরিক বিদ্রোহে উস্কানী দানের অভিযোগ আনে এবং অপরাধমূলক কাজের অভিযোগের বিপরীতে তার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি হয়। এই গ্রেপ্তার এড়াতে তিনি ১৯৪৯ সালের ৩ জানুয়ারি লিমায় অবস্থিত কলম্বিয়ান দূতাবাসে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করেন। এখানে উল্লেখ্য, দূতাবাসে রাজনৈতিক আশ্রয় (Diplomatic Asylum) এর চর্চা শুধুমাত্র দক্ষিণ আমেরিকাতেই বিদ্যমান। এই রাজনৈতিক আশ্রয় দানের ঘটনাকে কেন্দ্র করে পেরু এবং কলম্বিয়ার মাঝে বিরোধের উৎপত্তি ঘটে। উভয়পক্ষ সম্মত হলে আন্তর্জাতিক আদালতে ১৯৪৯ সালের ১৫ অক্টোবর এই মামলার বিচার শুরু হয়।

এই মামলার রায় পেরুর পক্ষে যায়: কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে এখানে দূতাবাসে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণের প্রথাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয় নি। এটিকে আঞ্চলিক আন্তর্জাতিক আইনের মর্যাদা দেয়া হয়েছে। এই বিষয়ে পেরুও কোন প্রশ্ন উত্থাপন করে নি। এই মামলায় দু'টি কনভেনশন আলোচনায় আসে। প্রথমটি হচ্ছে ১৯১১ সালের The Boliverian Agreement on Extradition এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে The Pan-American Havana Convention on Asylum. এটি ১৯২৮ সালের। এই কনভেনশন অনুসারে, কিছু ব্যতিক্রম সাপেক্ষে কোন দূতাবাস যে দেশে অবস্থিত, সে দেশের রাজনৈতিক অপরাধীদের রাজনৈতিক আশ্রয় দিতে পারে। অন্যান্য কারণে এই মামলার রায় পেরুর পক্ষে গেলেও এটি পরিষ্কার যে একটি আঞ্চলিক আন্তর্জাতিক আইন, আন্তর্জাতিক আদালতের রায়ের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক আইন হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে।

আন্তর্জাতিক আইনের প্রকৃতি

আন্তর্জাতিক আইন প্রকৃতই কোন আইন কি না?

রাষ্ট্রীয় আইনের সাথে তুলনায় আমরা আগেই দেখেছি, আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ প্রক্রিয়া সুনির্দিষ্ট নয়। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠেছে– আন্তর্জাতিক আইন আসলেই আইন কি না। Hobbes, Austin এবং Pufendorf এর মতো আইন বিজ্ঞানীগণ মনে করেন, আইন

হলো সার্বভৌম ক্ষমতার আদেশ। যেহেতু আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এরূপ কোন সার্বভৌম শক্তি অনুপস্থিত, কাজেই আন্তর্জাতিক রীতিসমূহকে আইন বলার উপায় নেই। আবার আইন বিজ্ঞানীদের আরেকটি ভিন্ন মতবাদ হলো, আইনকে শুধুমাত্র উচ্চতর কর্তৃপক্ষের আদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যুক্তিযুক্ত নয়। যারা এই দলে আছেন, তারা আন্তর্জাতিক আইনকে 'আইন' হিসেবেই দেখতে ইচ্ছুক। কাজেই দেখা যাচ্ছে, আন্তর্জাতিক আইন আসলেই আইন কি না, তা নির্ভর করছে আইনকে আমরা কিভাবে সংজ্ঞায়িত করছি তার উপর।

Austin, Hobbes প্রমুখ আইন বিজ্ঞানীগণ মনে করেন যে, মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই নিয়ম ভঙ্গ করার প্রবণতা ধারণ করে। এজন্যই আইনের পেছনে একটি বাধ্যকরী শক্তি থাকে। কেউ যদি আইন ভঙ্গ করেন, রাষ্ট্রীয় আইনে তার শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা থাকে। এই বাধ্যকরী ক্ষমতাই হচ্ছে আইনের মূল বৈশিষ্ট্য। আন্তর্জাতিক আইনে এটি অনুপস্থিত বিধায়, পূর্বোক্ত আইন বিজ্ঞানীগণ আন্তর্জাতিক আইনকে 'আইন'-এর মর্যাদা দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। বরং তারা আন্তর্জাতিক এসব রীতিনীতিকে 'ইতিবাচক নৈতিকতা' বা Positive Morality নামে ডাকার পক্ষপাতী। আরেক আইন বিজ্ঞানী Holland একই কারণ প্রদর্শন করে আন্তর্জাতিক আইনকে 'আইন বিজ্ঞানের বিলীয়মান বিন্দু' বা Vanishing Point of Jurisprudence বলে উল্লেখ করেছেন।

সব আইন বিজ্ঞানীই যে একই ধারণা পোষণ করেন, এটা ভাবার কোন কারণ নেই। Prof. Oppenheim আইনের উপরোক্ত সংজ্ঞাকে বাতিল করেছেন। তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন যে, আইনের উপরোক্ত সংজ্ঞা প্রথা ও অন্যান্য অলিখিত আইনকে অন্তর্ভুক্ত করে না, যদিও প্রতিটি সভ্য দেশের আইনেই প্রথার গুরুত্ব অনেক। কাজেই তিনি শুধুমাত্র উচ্চতর কর্তৃপক্ষের আদেশকেই আইন হিসেবে মানতে রাজি নন। তার মতে, 'আইন হলো কোন একটি সম্প্রদায়কে পরিচালনা করার লক্ষ্যে কিছু নিয়মের সমষ্টি, যা ঐ সম্প্রদায়ের সদস্যদের, সাধারণ সম্মতির মাধ্যমে কোন বাহ্যিক শক্তির দ্বারা প্রয়োগযোগ্য।' আইনের এই সংজ্ঞার ছাঁচে ফেলে তিনি আন্তর্জাতিক আইনকে আইনের মর্যাদা দেয়ার পক্ষপাতী, কারণ আন্তর্জাতিক আইনও সাধারণ সম্মতির ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত।

আধুনিক বিশ্বের অধিকাংশ আইন বিজ্ঞানীই আন্তর্জাতিক আইনকে আইনের মর্যাদা দিয়ে থাকেন। J.G. Starkeও এদের মধ্যে একজন। তিনি যুক্তি দেখান যে, Austin তাঁর সময়ে যেভাবে আইনকে দেখেছেন, বর্তমান সময়ে সেভাবে বিবেচনা করার সুযোগ খুবই সীমিত। আধুনিককালে প্রথাগত আন্তর্জাতিক আইনগুলোর জায়গা নিয়ে নিচ্ছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তি, যেগুলোর প্রতিটিতেই একটি প্রয়োগ কৌশল বর্ণিত আছে। আইন প্রণয়ন ব্যবস্থাও একই সাথে অনেক সুগঠিত, রাষ্ট্রীয় আইনের মতোই। Prof. Oppenheim-এর একটি যুক্তিও এখানে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, কোন রাষ্ট্র যখন আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করে, তখন সে রাষ্ট্র কখনোই আন্তর্জাতিক আইনের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলে না, বরং আন্তর্জাতিক আইনকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করে, যাতে দায়িত্ব এড়ানো যায়। এই যুক্তি থেকে তিনি উপসংহার টানেন যে, এভাবেই রাষ্ট্রসমূহ আন্তর্জাতিক আইনকে আইন হিসেবে স্বীকৃতি দিচ্ছে।

আন্তর্জাতিক আইনকে যারা আইনের মর্যাদা দিতে চান না, তারা অনেক সময় যুক্তি দেখান যে, রাষ্ট্রসমূহ প্রায়শই আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি কোন তোয়াক্কা করে না। একই কথা কিন্তু রাষ্ট্রীয় আইনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আর আইন মান্য না করা আর আইনের অস্তিত্বহীনতা সমার্থক নয়। মোদ্দা কথা হলো, বর্তমান বিশ্বে আন্তর্জাতিক আইন, আইন হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত এবং সময়ের সাথে সাথে এই আইন আরও শক্তিশালী রূপ লাভ করছে।

আন্তর্জাতিক আইনের ভিত্তি ঃ বিভিন্ন মতবাদ

আন্তর্জাতিক আইনের প্রকৃতি অনেকাংশেই এর ভিত্তির উপর নির্ভর করে। অন্য কথায় বললে, 'কোন ভিত্তির উপর আন্তর্জাতিক আইন দাঁড়িয়ে আছে, তাই নির্ধারণ করে দিচ্ছে আন্তর্জাতিক আইনের প্রকৃতি।' আন্তর্জাতিক আইনের ভিত্তি সংক্রান্ত বেশ কিছু মতবাদ আছে। এর মধ্যে প্রধান কয়েকটি বিধৃত হলো:

প্রকৃতিবাদ (Natural School) : আইন প্রকৃতি থেকে উৎসারিত। প্রকৃতির একটি প্রতিবিম্ব হচ্ছে আইন। প্রাচীন গ্রীক মতবাদে দার্শনিকরা বলেছেন– প্রকৃতিই হলো আইনের উৎস; এটি হতে পারে আগুন, পানি, গতি ইত্যাদি। Hegel বলেছেন, যা কিছু সত্য, তা-ই যুক্তি। এই যুক্তিই হলো আইনের ভিত্তি। গ্রীক মতবাদে Stoic রা বলেন, প্রকৃতির অন্যতম উপাদান হচ্ছে Human Reason বা মানুষের যুক্তি। কাজেই তারা বলছেন, আইনও তাই প্রকৃতির মত যুক্তি নির্ভর। যুক্তি বলে দিচ্ছে, আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতাই আন্তর্জাতিক আইনের ভিত্তি।

গ্রীকদের পর রোমানরাও এই ধারণা লালন করে। রোমান আইনের একটি স্পষ্ট বিভাজন লক্ষ্যণীয়– Jus civilis এবং Jus gentium. দ্বিতীয়টি হলো আন্তর্জাতিক আইন। আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনে প্রকৃতিবাদের অন্যতম প্রবক্তা হচ্ছেন হুগো গ্রোসিয়াস।

হুগো গ্রোসিয়াস (Hugo Grotius) : রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটে ৪২৬ খ্রিস্টাব্দে। তারপর মধ্যযুগের (৪২৬–১৬৪১/১৭৮৯ খ্রী.) ইতিহাস হলো অন্ধকারের ইতিহাস। শাসন কার্য পরিচালিত হতো ভ্যাটিকান থেকে। প্রাকৃতিক মতবাদকে মধ্যযুগে ধর্মের আবর্তে ঢেকে ফেলা হয়। বলা হয়, যা কিছু ঈশ্বর কর্তৃক প্রদত্ত, সেটিই হচ্ছে আইন, আর এভাবেই ঈশ্বর বলে দিয়েছেন রাষ্ট্র ও জাতি কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে। এই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটান Hugo Grotius.

Hugo Grotius ১৫৮৩ সালে হল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন। এই আইনবিদ ও কূটনীতিবিদ ১৬০৯ সালে তার প্রথম বই Mare liberum বা মুক্ত সমুদ্র প্রকাশ করেন। সপ্তাদশ শতাব্দীতে সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র ছিল ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, স্পেন, নেদারল্যান্ড, ইটালি, কারণ তারা সমুদ্র পথে বাণিজ্য করার পথ আবিষ্কার করে এবং তাদের শক্তিশালী নৌবাহিনী ছিল। এই শক্তির বলেই তারা সমুদ্রের বিশাল অংশকে নিজেদের অধিকারে দাবি করে। Hugo Grotius তার Mare Liberum গ্রন্থে ঘোষণা করেন, সমুদ্র হলো সমগ্র মানবজাতির জন্য উন্মুক্ত। প্রকৃতির এই ভাণ্ডারের উপর সবার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। তার এই

প্রকৃতিবাদী মতবাদ ব্যাপক সাড়া ফেলে। অবশ্য তার আগেই Bynkershoek, কামান দাগা নীতি বা Canon Shot Rule-এর প্রস্তাব করেন। অর্থাৎ, রাষ্ট্রীয় ভূ-খণ্ড হতে ৩ সামুদ্রিক মাইল পর্যন্ত রাষ্ট্র তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারবে রাষ্ট্রীয় সমুদ্র হিসেবে।

১৬২৫ সালে Grotius তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ De Jure Belli ac Pacis (যুদ্ধ এবং শান্তির আইন) প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থটি তাকে আইনের ইতিহাসে একটি চিরস্থায়ী অবস্থান দিয়েছে। এই গ্রন্থে তিনি বিশ্ব শান্তির একটি রূপরেখা তুলে ধরেন, যার উপরই টিকে আছে আন্তর্জাতিক আইনের একটি বিশাল ক্ষেত্র। এই বইতে তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন যে, রাষ্ট্রসমূহ তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যুক্তিকে প্রাধান্য দেয়া উচিৎ। এটি তার প্রকৃতিবাদী মনোভাবেরই প্রতিফলন।

প্রত্যক্ষবাদ (Positive School) : প্রত্যক্ষবাদীদের মতে, সার্বভৌম ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের আদেশ বাধ্যকরী। এদের মতে চুক্তি ও প্রথাই হলো আন্তর্জাতিক আইনের ভিত্তি। চুক্তি হলো পক্ষসমূহের ইচ্ছার প্রতিফলন। প্রতিটি রাষ্ট্র কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে তার দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করে। রাষ্ট্রের এই দৃষ্টিভঙ্গি একটি প্রকাশিত রূপ পরিগ্রহ করে চুক্তির মাধ্যমে; অর্থাৎ আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ রাষ্ট্রের ইচ্ছার ফলাফল। Hegel, Brierly প্রমুখ প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিক মনে করেন যে, আন্তর্জাতিক আইন হলো সেই সমস্ত নিয়মের সমষ্টি, যা রাষ্ট্রসমূহ তাদের উপর বাধ্যকরী বলে মত প্রকাশ করে। তাদের ভাষায়, রাষ্ট্রের এই সম্মতিই আন্তর্জাতিক আইনের ভিত্তি।

আরেক প্রত্যক্ষবাদী ইতালিয় আইনজ্ঞ Anzilotti এই ধারণায় ভিন্ন মাত্রা যোগ করেন। তাঁর মতে আন্তর্জাতিক আইনের মূলভিত্তি হলো চুক্তি পালনের বাধ্যবাধকতা। তাঁর নীতিটি হলো Pacta sunt servanda বা চুক্তি অবশ্য পালনীয়। চুক্তি পালনের মধ্যেই আছে রাষ্ট্রসমূহের ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ। Anzilotti একজন নিরেট প্রত্যক্ষবাদী। তবে তাঁর এই মতবাদ সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। এই মতবাদের একটি বড় ত্রুটি হলো প্রথাগত আইনের ক্ষেত্রে এই নীতির প্রভাব নেই। এর জবাবে অবশ্য তিনি মত প্রকাশ করেন যে, রাষ্ট্রসমূহ যখন কোন প্রথা ক্রমাগত পালন করতে থাকে, তখন ধরে নিতে হবে এটা তাদের ইচ্ছা এবং সম্মতিরই বহিঃপ্রকাশ; আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় একটি পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমেই প্রথাগুলোকে নিজেদের উপর বাধ্যকরী করে তোলে। এই নীতির আরেকটি সমস্যা হলো, সকল সমস্ত চুক্তির পেছনের রাষ্ট্রীয় সম্মতিকে সনাক্ত করা খুব সহজসাধ্য নয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটা অসম্ভব। অনেক ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রসমূহ সম্মতির চেয়েও বড় করে দেখে রাষ্ট্রীয় চর্চাকে। সুইজারল্যান্ড জাতিসংঘের সদস্য না হয়েও অতীতে জাতিসংঘের নিয়ম-নীতি মেনে চলেছে। তবে সকল সমালোচনা সত্ত্বেও একথা স্পষ্ট ভাষায় বলা যায় যে, চুক্তি বা প্রথা–এসব কিছুর পেছনেই রাষ্ট্রের সম্মতি বিদ্যমান; তা প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্ন, যাই হোক না কেন। রাষ্ট্রসমূহ এই সব চুক্তি বা প্রথা মেনে চলতে অবশ্য অবশ্যই বাধ্য। এমনকি রাষ্ট্রীয় আইনকেও এই সব আন্তর্জাতিক প্রথা ও চুক্তির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। নিম্নের মামলায় এই ধারণাটি তার যথার্থতা খুঁজে পায় :

মামলা : Charming Betsy Case; চার্মিং বেট্‌সী মামলা; (যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রীম কোর্ট, ১৮০৪)

মামলার ঘটনা : জনৈক আমেরিকার নাগরিক ডেনমার্কের দখলকৃত সেন্ট থমাস দ্বীপে বসবাস করতেন। তিনি একটি জাহাজের মালিক ছিলেন। ১৮০০ সালের 'Non-Intercourse Act-এর অধীনে তার জাহাজখানা বাজেয়াপ্ত করা হয়। এই আইনের অধীনে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা ছিল। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হয় যে, তিনি এই আইন ভঙ্গ করেছেন। এই বাজেয়াপ্তির পেছনে আরও কারণ দেখানো হয় যে, তিনি দীর্ঘদিন ধরে বিদেশে অবস্থান করছেন।

মামলার বিচার্য বিষয়

ক. শুধুমাত্র বিদেশে অবস্থানের কারণে মার্কিন কর্তৃপক্ষ তার কোন নাগরিকের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে কর্তৃত্ববান কি-না?

খ. মার্কিন নাগরিক ১৮০০ সালের উল্লিখিত আইনটি ভঙ্গ করেছে কি না?

মামলার রায় : এই মামলার রায়ে প্রধান বিচারপতি মার্শাল আন্তর্জাতিক প্রথাগত আইনগুলো আলোচনা করেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর এই আইনগুলোর প্রভাব পর্যালোচনা করে মতামত ব্যক্ত করেন যে, মার্কিন কংগ্রেসের কোন আইন আন্তর্জাতিক আইনের বিরুদ্ধাচরণ করা উচিত নয়। তার এই রায়ের পেছনে কারণ ছিল যে, আন্তর্জাতিক প্রথাগত আইনগুলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় আইনের মতই মর্যাদা লাভ করে। কাজেই কংগ্রেস তার বিপরীতে অবস্থান নিতে পারে না।

মামলা : The Alabama Claims Award; দি এলাবামা ক্লেইম্‌স সালিশ মামলা; (USA Vs. UK, Moore 1 Int. Arb., 1872)

মামলার ঘটনা : মার্কিন গৃহযুদ্ধে (১৮৬১–১৮৬৫) যুক্তরাজ্য তার নিরপেক্ষতা ঘোষণা করে। কিন্তু গৃহযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে কনফেডারেট নৌবাহিনীর অনেক যুদ্ধ জাহাজ যুক্তরাজ্যে নির্মিত হয়। লন্ডনে মার্কিন প্রতিনিধি এই বিষয়ে যুক্তরাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, এই জাহাজগুলো যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হবে এবং তিনি এই বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যুক্তরাজ্যকে অনুরোধ করেন। কিন্তু তারা এই বিষয়ে কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করে নি এই যুক্তিতে যে, ব্রিটিশ রাষ্ট্রীয় আইন ব্যক্তিগত চুক্তির ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ সমর্থন করে না। শেষ পর্যন্ত এই জাহাজগুলো যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয় এবং প্রভূত ক্ষতিসাধন করে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক ছিল 'এলাবামা', এটি লিভারপুলে নির্মিত হয়েছিল। যুদ্ধ শেষে যুক্তরাষ্ট্র তার ক্ষতির কারণ উদ্ভবের জন্য যুক্তরাজ্যকে দায়ি করে ক্ষতিপূরণ দাবি করে। যুক্তরাজ্য আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে তার কোন দায়দায়িত্ব নেই বলে ঘোষণা করে। বিষয়টি শেষ পর্যন্ত আর্বিট্রেশনে যায়।

বিচার্য বিষয় :

ক. ওয়াশিংটন চুক্তির অধীনে যুক্তরাজ্য একটি নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে তার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে কি না?

খ. যুক্তরাজ্য ক্ষতিপূরণ দানে বাধ্য কি না? হলে এর পরিমাণ কত হবে?

সিদ্ধান্ত : সকল মধ্যস্থতাকারী এই বিষয়ে একমত হন যে, নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে যুক্তরাজ্য ব্যর্থ হয়েছে। তাই সিদ্ধান্ত হয় যে, যুক্তরাজ্য ক্ষতিপূরণ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রকে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মার্কিন ডলার মূল্যমানের স্বর্ণ পরিশোধ করবে।

এই মামলার রায় থেকে এই নীতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয় যে, কোন রাষ্ট্র তার আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতা এড়ানোর জন্য রাষ্ট্রীয় আইনের আশ্রয় নিতে পারে না; বরং রাষ্ট্রীয় আইনকে আন্তর্জাতিক আইনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। এই একই নীতি প্রতিফলিত হয়েছে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালতের রায়েও।

মামলা : Professor Nurul Islam Vs. Govt. of Bangladesh & Others; অধ্যাপক নুরুল ইসলাম ও অন্যান্য বনাম বাংলাদেশ সরকার ও অন্যান্য (52 D.L.R. 413)

এই মামলার রায়ে 'বিচারপতি মোঃ ফজলুল করিম' বলেন যে, বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৫ (১) অনুসারে রাষ্ট্র সকল আন্তর্জাতিক আইন এবং জাতিসংঘ অনুসৃত নীতি পালনে বাধ্য।

মামলার ঘটনা : ১৯৯৯ সালে বিখ্যাত সিগারেট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বৃটিশ আমেরিকান টোবাকো কোম্পানি (বাংলাদেশ) লিঃ তাদের উৎপাদিত ব্রান্ড 'গোল্ড লীফে'র প্রচার কার্যক্রম হিসেবে 'ভয়েজ অব ডিসকোভারী'কে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ জানায়। এই দেশের তরুণ প্রজন্ম এই প্রচার কার্যক্রমের ফলে ধূমপানের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে–এই আশংকায় বাংলাদেশে ধূমপান বিরোধী প্রখ্যাত সংস্থা 'আমরা ধূমপান নিবারণ করি' (আধূনিক)-এর সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অধ্যাপক নুরুল ইসলাম হাইকোর্ট বিভাগে এই প্রচার কার্যক্রম এর বিরুদ্ধে একটি রীট পিটিশন দায়ের করেন। শুধু এই নির্দিষ্ট প্রচার কার্যক্রমই নয়, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিভিন্ন রিপোর্টে বর্ণিত ধূমপানের বিবিধ ক্ষতিকর দিক তুলে ধরে তামাক জাত দ্রব্যাদির প্রচারের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের অনুরোধ জানান।

তামাক কোম্পানিটি যুক্তি প্রদান করে যে, বাংলাদেশে তামাক সামগ্রীর বিপণন নিয়ন্ত্রণ হয় ১৯৮৮ সালের 'তামাক সামগ্রী বিপণন (নিয়ন্ত্রণ) আইনের মাধ্যমে। এই আইনে তামাক সামগ্রীর প্রচার নিষিদ্ধ করা হয় নি, শুধু পণ্যের প্রচারের সময় সতর্কতামূলক বাণী উল্লেখের বিধান আছে, যা কোম্পানিটি মেনে চলছে। কোম্পানি পক্ষের আইনজীবী আরও যুক্তি দেখান যে, যদিও ১৯৯০ সালের ১৬ নং অধ্যাদেশ দ্বারা তামাকজাত সামগ্রীর প্রচার নিষিদ্ধ করা

হয়েছিল, তথাপি অধ্যাদেশটি যথাযথভাবে সংসদে উত্থাপিত না হওয়ায় আইনের মর্যাদা হারিয়েছে। কাজেই, বাংলাদেশে বর্তমানে তামাক সামগ্রীর প্রচার নিষিদ্ধকারী কোন আইন নেই।

বিচার্য বিষয় : আদালত এতদসংক্রান্ত কোন নির্দিষ্ট আইনের অনুপস্থিতিতে 'ভয়েজ অব ডিসকোভারী'র আগমনের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারে কি না?

মামলার রায় : এই মামলার রায়ে আদালত 'ভয়েজ অব ডিসকোভারী'র মাধ্যমে তামাক সামগ্রীর প্রচার কার্যক্রমের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। কারণ হিসেবে আদালত যুক্তি দেখান যে, যদিও বাংলাদেশে তামাকজাত দ্রব্যের প্রচার নিষিদ্ধকরণে কোন আইন নেই, তথাপি বাংলাদেশের কিছু আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতা আছে। বাংলাদেশ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সদস্য এবং এই সংস্থার ধূমপান বিরোধী কার্যক্রমের অংশীদার। বাংলাদেশ প্রতিবছর তামাকমুক্ত দিবস উদ্‌যাপন করে। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনায় এনে বিজ্ঞ আদালত মত প্রকাশ করেন যে, বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৫ (১) অনুসারে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক আইন, জাতিসংঘ সনদের বিধানাবলী এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তামাকজাত দ্রব্যের প্রচার নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্ত রেজুলেশন মানতে বাধ্য। অবশ্য আদালত 'ভয়েজ অব ডিসকোভারী'র মাধ্যমে প্রচারাভিযানের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলেও সামগ্রিক অর্থে তামাক দ্রব্যের প্রচার নিষিদ্ধ করার আদেশ দেয় নি, তবে এই বিষয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য সরকারকে কিছু দিকনির্দেশনা দিয়েছে।

নব্য গ্রোসিয়ান মতবাদ (Neo-Grotian School) : পূর্বের আলোচনায় আমরা দেখেছি প্রকৃতিবাদী এবং প্রত্যক্ষবাদীদের মধ্যে আন্তর্জাতিক আইনের ভিত্তি বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট বিরোধ আছে। প্রথম দল মনে করেন আন্তর্জাতিক আইন হলো যুক্তি নির্ভর; যুক্তিই হলো আন্তর্জাতিক আইনের ভিত্তি। অপরদিকে প্রত্যক্ষবাদীরা বলেন, রাষ্ট্রসমূহের সম্মতি যা প্রকাশিত হয় চুক্তি এবং প্রথায়, সেগুলোই হলো আন্তর্জাতিক আইনের ভিত্তি। এই বিরোধ নিরসনেই নব্য গ্রোসিয়ান মতবাদের উৎপত্তি। মূলত: এটি কোন মৌলিক মতবাদ নয়। এটি প্রথম দুই মতবাদের মাঝামাঝি একটি পথ। এঁরা মনে করেন, আন্তর্জাতিক আইনের ভিত্তি একদিকে যেমন যুক্তি, অপর দিকে সম্মতি। বস্তুতঃ এটি একটি সমঝোতামূলক মতবাদ।

আন্তর্জাতিক আইনের ক্রমবিকাশ

আলোচনার সুবিধার্থে আমরা আন্তর্জাতিক আইনের ক্রমবিকাশকে তিনটি শিরোনামের অধীনে উল্লেখ করতে পারি:

ক. আদিম যুগ

খ. মধ্য যুগ

গ. আধুনিক যুগ

আদিম যুগ : যে কোন পশ্চিমা লেখকের মধ্যে এটা প্রচলন করার প্রবণতা রয়েছে যে, আন্তর্জাতিক আইনের জন্ম হয়েছে সপ্তদশ শতাব্দীর ইউরোপকে ঘিরে, কারণ তখনই John

Boden সর্বপ্রথম সার্বভৌমত্বের ধারণার প্রকাশ ঘটান। কিন্তু প্রকৃত সত্য হচ্ছে, মানবজাতি যেখানেই সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করেছে সেখানেই আন্তর্জাতিক আইন ছিল। যে কোন প্রাচীন সভ্যতাতেই আন্তর্জাতিক আইনের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। খৃষ্টপূর্ব ২৩০০ সালে আকাডিয়া (Akkadia) সাম্রাজ্যের রাজা 'নারামসিন', ইলাম (Ellam) রাজ্যের সঙ্গে একটি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। বৃটিশ মিউজিয়ামে এখনও এই চুক্তিটি সংরক্ষিত আছে।

এরও বেশ পরে খৃষ্টপূর্ব ১২৭৮ সালে মিশরের রাজা ৩য় রামসেস্-এর সাথে হিট্রিট রাজ্যের রাজা কাটুসিলির একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এটিতে শুধু শান্তি ও সহযোগিতাই নয়, যুদ্ধবন্দিদের বিনিময়ের একটি শর্তও এই চুক্তিতে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সে সময়ও আন্তর্জাতিক আইনের অস্তিত্ব ছিল।

প্রাচীন চীনেও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তি লক্ষ্য করা যায়। তখন সমগ্র চীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। তখন ভ্রাম্যমান কূটনৈতিক (Roaming Diplomat) সংক্রান্ত চুক্তির অস্তিত্বও পাওয়া যায়। এছাড়াও প্রাচীন চীনে অনাক্রমণ চুক্তি (Non-Aggression Treaty)'র অস্তিত্ব পাওয়া যায়। এই চুক্তিতে প্রথমে আক্রমণ না করার নীতি প্রতিফলিত হয়েছে।

প্রাচীন ভারতে যুদ্ধ এবং শান্তি সংক্রান্ত একাধিক বিধান মনুসংহিতা, রামায়ণ ও মহাভারতে সন্নিবেশিত হয়েছে। এমনকি এক রাষ্ট্রের সাথে আরেক রাষ্ট্রের সম্পর্ক কেমন হবে, সে সংক্রান্ত বিধানও বর্ণিত হয়েছে। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' হচ্ছে এই প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থে অর্থনীতি, আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের বিশ্লেষণ, যুদ্ধ পরিচালনা, যুদ্ধবন্দি সংক্রান্ত নীতিমালা ইত্যাদি নানান বিষয়ে দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এখানে যুক্ত করে বলা হয় যে কোন শাসক যদি যুদ্ধ পরিহার করে অন্য কোন শান্তিপূর্ণ পন্থায় দেশ পরিচালনা করতে পারেন, তাহলে তিনিই সবচাইতে শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক। এছাড়াও তখন শান্তির দূত প্রেরণের রেওয়াজ ছিল। রামায়ণ ও মহাভারতে এই সব দূতদের বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্তির ও মর্যাদার বিধান আছে। তৎকালীন সময়ে এই সব দূতকে হত্যা একটি অত্যন্ত গর্হিত অপরাধ বলে বিবেচিত হতো।

প্রাচীন গ্রীসেও রাষ্ট্রদূতগণ একই ধরনের সুবিধা ভোগ করতেন। গ্রীসে যখন কোন নতুন দূত আসতেন, তখন তার নাম পরিচয় খোদাই করে রাখা হতো। একে বলা হতো Diplomat শব্দটা আমরা সেখান থেকেই পাই। এরিস্টটল গ্রীসে ১৫৩টি দেশের সংবিধান নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। প্রাচীন গ্রীসে আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলোকে অত্যন্ত পবিত্র বিবেচনা করা হতো। এই ধরনের চুক্তিগুলো পাথরে খোদাই করে গীর্জায় ঈশ্বরের তত্ত্বাবধানে রাখা হতো এবং চুক্তি হতে উদ্ভূত কোন বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘিত হলে গীর্জা থেকে পাথর এনে ভেঙে ফেলা হত। অর্থাৎ সেখানেও আন্তর্জাতিক আইনের উপস্থিতি ছিল।

মধ্যযুগ : ৪২৬ খ্রীস্টাব্দে রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর হতে আন্তর্জাতিক আইনের ক্রমবিকাশকে মধ্যযুগের আওতায় ফেলা হয়। নবম শতকে নগরের সৃষ্টি হয়, কিন্তু মূল পরিবর্তনগুলো সূচিত হয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। ইতালি তখন ছোট ছোট রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল

এবং এদের নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। ১২৫৫ খ্রীস্টাব্দে ইতিহাসে প্রথমবারের মত ইটালির মিলান ও জেনোয়া'র মধ্যে স্থায়ী কূটনৈতিক বিনিময়ের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। একই ভাবে Machiavelli তার The Prince গ্রন্থে তুলে ধরেন আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত।

১৬৪৮ খ্রীস্টাব্দে Treaty of Westphalia স্বাক্ষরিত হয়, যা ইউরোপে ৩০ বছরের যুদ্ধের অবসান করে। এই চুক্তিটি শান্তি চুক্তির মর্যাদা লাভ করে। ১৭৮৯ সালে ঘটে মানব সভ্যতার ইতিহাসের এক অতিগুরুত্বপূর্ণ ঘটনা– ফরাসি বিপ্লব। আন্তর্জাতিক আইনের ইতিহাসে মধ্যযুগের এই সব তাৎপর্যমণ্ডিত মাইল ফলকগুলো অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

আধুনিক কাল : আদিম ও মধ্যযুগের অর্জনগুলো আন্তর্জাতিক আইনের ক্রমবিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। আন্তর্জাতিক আইন ততদিনে এগিয়ে গেছে অনেক দূর। আধুনিক যুগের শুরুতেই এই ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয় যে, যুদ্ধে না গিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে আন্তর্জাতিক বিরোধের মীমাংসা হতে পারে। **Alabama Claims Award (USA Vs. UK, 1872)** মামলায় তাই হয়েছিল। ১৮৯৯ এবং ১৯০৭ সালে নেদারল্যান্ডের হেগে বেশ কিছু কনভেনশন স্বাক্ষরিত হয়। এই সব কনভেনশনে রাষ্ট্রগুলো কতক নীতিমালা গ্রহণ করেছে, যা আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করেছে।

আন্তর্জাতিক আইন এবং আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি রাষ্ট্রসমূহের শ্রদ্ধাবোধ–এই দুইয়ের উপর সবচে' বাজে প্রভাব পড়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে। সমাজতান্ত্রিক দেশ রাশিয়া ঘোষণা করে যে, মেহনতী মানুষের রাশিয়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে না। কারণ হিসেবে ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন বলেন, এই যুদ্ধ জনগণের কল্যাণের জন্য নয়; সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো কতটুকু এলাকা তাদের বাজার হবে, এই নিয়ে যুদ্ধ করছে। শ্রমিকদের দেশ হিসেবে রাশিয়া যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকে। যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে গঠিত হয় 'সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ।' আন্তর্জাতিক আইনের ইতিহাসে এ এক বিরাট ঘটনা। ১৯৩৩ সালে জার্মানীতে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের নেতা এডলফ হিটলার ক্ষমতায় যান। তার স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃত্বে বিশ্ব রাজনীতি অতিক্রম করে এক সংকটময় পরিস্থিতি এবং ইউরোপেই সংঘটিত হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং ক্রমে তা এশিয়া সহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। মানবতার এত বড় লঙ্ঘন পৃথিবী এর আগে আর দেখে নি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্ব নেতৃত্ব প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন আরও কার্যকর কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার; প্রতিষ্ঠিত হয় জাতিসংঘ। ১৯৪৫ সালের এই ঘটনার হাত ধরেই এগিয়ে চলছে আন্তর্জাতিক আইনের ক্রমবিকাশ। আর সবচে' উল্লেখযোগ্যভাবে একটি সুসংহত অবস্থা দখল করে নিয়েছে মানবাধিকারের ধারণা।

মানবাধিকার ও আন্তর্জাতিক আইন

মানবাধিকারের ধারণা সুপ্রাচীন। জাতিসংঘ গঠিত হওয়ার বহু আগে থেকেই মানবাধিকারের মূলনীতি বিদ্যমান ছিল এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, আমেরিকার বহু দেশে। মানবাধিকারের

ক্রমবিকাশে প্রথমেই ১২১৫ সালের বৃটেনের ম্যাগনাকার্টার কথা সাধারণতঃ বলা হলেও এশিয়া এমনকি এই উপমহাদেশেও মানবাধিকারের মূলনীতিগুলো প্রতিষ্ঠিত ছিল। রামায়ণ, মহাভারত, মনুস্মৃতি ইত্যাদি গ্রন্থে একাধিক বিধান আছে, যা শুধুমাত্র ধর্মীয় বিধানের অনেক উর্ধ্বে উঠে মানবাধিকারের ধারণাকেই আলোকিত করেছে। একই কথা প্রযোজ্য ইসলাম ধর্মের ক্ষেত্রেও– পবিত্র কোরআন ও বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে মানবাধিকারের মূলনীতিগুলোর উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে ম্যাগনাকার্টাই মানবাধিকারের একটি পৃথক ও স্বতন্ত্র দলিল হিসাবে সর্বাধিক মনোযোগ পেয়েছে। এই ম্যাগনাকার্টাকে অনুসরণ করে বৃটেনের রাজনৈতিক ইতিহাসে আরও কিছু দলিলের জন্ম হয়, যার প্রতিটিই মানবাধিকারের ধারণাকে সুসংহত করেছে; যার মধ্যে আছে ১৬২৭ সালের পিটিশন অব রাইটস্, ১৬৮৮ সালের বিল অব রাইটস ও ১৭০২ সালের এ্যাক্ট অব সেটেলম্যান্ট। মানবাধিকারের ধারণা শুধু বৃটেনেই সীমাবদ্ধ ছিল না, ছড়িয়ে পড়েছিল পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে। ১৭৭৬ সালের আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র, ১৭৯১ সালের আমেরিকার বিল অব রাইটস বা ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লব পরবর্তী ঘোষণাপত্র– এর প্রতিটিতেই ধ্বনিত হয়েছে মানবাধিকারের সেই সুর।

এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে উপরোল্লিখিত প্রতিটি দলিলই জাতীয় পর্যায়ের, যদিও এগুলোর কোন কোনটির প্রভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম বেগবান হয়েছে। তবে মানবাধিকারের ধারণাকে রাষ্ট্রীয় সীমানার প্রাচীর ভেঙে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এনেছে জাতিসংঘ সনদ। এই আন্তর্জাতিক চুক্তিটির মাধ্যমেই সকল রাষ্ট্রের উপর দায়িত্ব বর্তেছে মানবাধিকার সমুন্নত রাখার। আন্তর্জাতিক আইনের গ্রহণযোগ্যতার পেছনে এটি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ চালিকা শক্তি।

জাতিসংঘ সনদের প্রস্তাবনা ও অনুচ্ছেদ ১, ১৩, ৫৫, ৫৬, ৬২, ৬৮ এবং ৭৬-এ মানবাধিকারের উল্লেখ থাকলেও তাতে মানবাধিকারগুলো সুনির্দিষ্টভাবে উল্লিখিত হয় নি। অন্য কথায়, সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য একটি অভিন্ন ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য (মানবাধিকার সংক্রান্ত) বেঁধে দেয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, যার ফল হিসেবে ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর গৃহীত হয় মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র (Universal Declaration of Human Rights), খুলে যায় আন্তর্জাতিক আইনের নতুন দুয়ার। এই ঘোষণাপত্র প্রণীত হওয়ার অনেক আগে থেকেই এই অধিকারগুলো বিভিন্ন দেশের সংবিধানে লিপিবদ্ধ ছিল; কিন্তু আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে 'সকল জাতি ও সকল দেশের কর্ম প্রয়াসে সাফল্য অর্জনের একটা অভিন্ন মান' নির্ধারণ সম্ভব হয়েছে এই ঘোষণার মাধ্যমেই। নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক–মোটামুটি মানবিক বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ সব অধিকারই লিপিবদ্ধ হয় এই ঘোষণাপত্রে।

প্রণীত হওয়ার পর হতেই মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রটি সমগ্র বিশ্বে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়। এর অনুকরণে একের পর এক অঞ্চলভিত্তিক মানবাধিকার দলিল প্রণীত হতে থাকে। এটি প্রভাব বিস্তার করে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রীয় আইন ও বিচারিক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রেও। ১৯৪৮ সালের পর বিশ্বে যতগুলো সংবিধান প্রণীত হয়েছে, তাদের প্রায় সবগুলোতেই

ঘোষণাপত্রে বিদ্যমান অধিকারগুলোর উল্লেখ ছিল। এই ব্যাপক ভিত্তিক গ্রহণযোগ্যতা সত্ত্বেও প্রশ্ন উত্থাপিত হয়-এর আইনগত মর্যাদা নিয়ে। একটি বিতর্কের সূচনা হয়– মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র আইনত বাধ্যকরী কি না? যেহেতু এটি একটি ঘোষণা, কোন চুক্তি নয়, তার কোন বাধ্যকরী প্রভাব থাকবে কি না? অনেকেই মত দেন যে, যেহেতু এটা একটা ঘোষণা মাত্র, কাজেই একে বাধ্যকরী বলা যাবে না। উল্টো দিকে, অনেক আইনজ্ঞ মতামত ব্যক্ত করেন যে, সমগ্র বিশ্বব্যাপী ব্যাপক চর্চা ও গ্রহণযোগ্যতার কারণে এটি একটি প্রথাগত আন্তর্জাতিক আইনে পরিণত হয়েছে। কাজেই এই ঘোষণাপত্র পরিপন্থী কোন কাজ প্রকারান্তরে আন্তর্জাতিক আইনের'ই লঙ্ঘন বলে বিবেচিত হবে। সেই হিসেবে অবশ্যই এই ঘোষণাপত্রের একটি বাধ্যকরী প্রভাব আছে। এই বিতর্কে তৃতীয় আরেকটি মতেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। এদের বক্তব্য হলো : সার্বজনীন ঘোষণাপত্রটি যদি 'ঘোষণাপত্র' হওয়ার কারণে আইনত: বাধ্যকরী না হয়; কিংবা এক যোগে সমগ্র বিশ্বব্যাপী প্রচলিত না হওয়ার কারণে যদি প্রথাগত আন্তর্জাতিক আইনের মর্যাদা লাভে ব্যর্থও হয়, তবুও এই ঘোষণাপত্রের একটি বাধ্যকরী প্রভাব আছে; কারণ এই ঘোষণাপত্রে বর্ণিত অধিকারগুলো আন্তর্জাতিক আইনের মূলনীতিগুলোরই প্রতিফলন; কাজেই এর বিধান লঙ্ঘনের অর্থই হচ্ছে আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করা।

মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রের আইনগত মর্যাদা (Legal Status) সংক্রান্ত বিতর্কের সমাপ্তি ঘটে ১৯৬৬ সালে, যখন ঘোষণাপত্রের অধিকারগুলো দু'টি আন্তর্জাতিক চুক্তির অধীনে চলে আসে। এই অধিকারগুলো যেহেতু এবার চুক্তির অধীনে এলো, কাজেই আইনগত বাধ্যবাধকতা নিয়ে বিতর্ক অবান্তর প্রতীয়মান হলো। তবে এই বিতর্ক যে একেবারেই শেষ হয়ে গেছে, তা নয়। যে রাষ্ট্রগুলো আন্তর্জাতিক চুক্তি দু'টি স্বাক্ষর করে নি, তাদের ক্ষেত্রে ঘোষণাপত্র বাধ্যকরী কি না, সে বিতর্কের এখনও নিষ্পত্তি হয় নি।

সার্বজনীন ঘোষণাপত্রে নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক-এই সকল ধরনের অধিকারের উল্লেখ থাকলেও এই সকল ধরনের অধিকারের ক্রমবিকাশ কিন্তু একসাথে ঘটে নি। আরও সুনির্দিষ্টভাবে বললে– নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারগুলো সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর অর্জন, অপরদিকে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারগুলোর ধারণা বিকশিত হয়েছে অনেক পরে– বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। এই দুই গোত্রের অধিকারের প্রকৃতি নিয়ে বিতর্কও প্রচুর। একদল মনে করেন, শুধুমাত্র নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারগুলোই প্রকৃত মানবাধিকার এবং চরিত্রে সার্বজনীন। অপরদিকে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারগুলো কোন দেশের অর্থনীতি, সমাজ কাঠামো ইত্যাদির সাথে অংগাংগিভাবে জড়িত বলে সার্বজনীন হতে পারে না। আবার বিশেষজ্ঞদের আরেকটি দল মত প্রকাশ করেন যে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকারগুলোই প্রকৃত মানবাধিকার; এগুলো বাদ দিয়ে শুধু নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার দিয়ে মানব উন্নয়ন সম্ভব নয়, এতে বিদ্যমান বৈষম্য আরো প্রকট হবে। এই বিতর্ক নিরসনে এবং সার্বজনীন ঘোষণাপত্রকেন্দ্রিক পূর্ববর্ণিত মতদ্বৈততা দূরীকরণে ১৯৬৬ সালে দু'টি ভিন্ন ভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। একটি হলো নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি

(International Covenant on Civil and Political Rights). এবং অপরটি হলো অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) প্রয়োজনীয় অনুসমর্থন লাভের পর এই চুক্তি দু'টি বলবৎ হয় ১৯৭৬ সালে। আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনের ক্রমবিকাশে এই চুক্তি দু'টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উপনিবেশবাদের অবসান

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অনেকগুলো কুফলের পরেও একটি খুব উঁচু দরের সুফল হচ্ছে বিশ্ব নেতৃত্ব মানবাধিকার সম্বন্ধে ভাবতে শিখেছে, যা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। এর পাশাপাশি আরেক বড় অর্জন হলো উপনিবেশবাদের অবসান। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার (Right of self-determination) জাতিসংঘের সনদে যেমন জায়গা করে নিয়েছে, একই ভাবে গুরুত্ব পেয়েছে মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রে এবং তৎপরবর্তী আন্তর্জাতিক চুক্তিতে। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারটির সবচেয়ে প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের এতদসংক্রান্ত ১৯৫৮ সালের ১২ ডিসেম্বর তারিখের রেজুলেশনে। তবে এই নীতির আরও ব্যাপক প্রসার ঘটে ১৯৬০ সালের উপনিবেশ রাষ্ট্র ও জনগণের প্রতি স্বাধীনতা প্রদানের ঘোষণায় (Declaration on the Granting of Independence of Colonial Countries and Peoples). এই উপনিবেশনবাদ বিরোধী মনোভাবের প্রতিফলন ঘটেছে একইভাবে ১৯৭০ সালের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আইনের মূলনীতি বিষয়ক ঘোষণায়।

উপনিবেশভুক্ত রাষ্ট্রের জনগণের নির্যাতিত হওয়ার ইতিহাস দীর্ঘ দিনের। মানব সভ্যতার কলংকজনক এই বিষয়ের অবসানে আন্তর্জাতিক আইনের শক্তিশালী ভূমিকা তার অগ্রযাত্রায় অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন

১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লব ইতিহাসে এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে একদিকে যেমন মেহনতী মানুষের মধ্যে শুরু হয় অধিকার আদায়ে সংঘবদ্ধ হওয়ার প্রবণতা, অন্যদিকে এর বিপরীতে শোষক ও শাসক শ্রেণীও জোট বদ্ধ হয় এর মোকাবেলায়। এই ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার স্রোত রাষ্ট্রীয় সীমানা পেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বব্যাপী। পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র– এই দুই আদর্শের ভিত্তিতে সমগ্র ইউরোপও বিভাজিত হয়ে পড়ে। সোভিয়েত ও তার মিত্ররা সমাজতান্ত্রিক আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে পূর্ব ইউরোপকে নতুন রূপ দেয়ার চেষ্টায় নিয়োজিত থাকে; অন্যদিকে পুঁজিবাদী ধ্যান ধারণায় অভ্যস্ত পশ্চিম ইউরোপ একটি রক্ষণশীল অবস্থানে থেকে সচেষ্ট ছিল সমাজতন্ত্রের আঁচ থেকে বেঁচে থাকতে। সাম্যবাদের প্রবক্তা কার্ল মার্কস জার্মানীর সন্তান, হিটলারের শাসনামলে সেই জার্মানীই প্রকাশ লাভ করে বিশ্বের সবচাইতে আগ্রাসী রাষ্ট্র হিসেবে, যার ফলাফল ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। জার্মানীর আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন, পশ্চিম ইউরোপ, এমনকি চরম পুজিবাদী রাষ্ট্র আমেরিকাও একই কাতারে নেমে আসে এবং একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সক্ষম হয়

অক্ষশক্তিকে (জার্মানী, ইটালি, জাপান) পরাজিত করতে। যুদ্ধের সবচে' বাজে প্রভাব পড়ে ইউরোপেই। যুদ্ধোত্তোর ইউরোপ নিয়োজিত হয় পুনর্গঠনে। সে সময়ে পুঁজিবাদী গোষ্ঠীর, বিশেষ করে আমেরিকার ভয় ছিল যে এ সময়ে সমাজতন্ত্রের প্রভাব পশ্চিম ইউরোপেও বিস্তারিত হতে পারে। এ থেকে বাঁচতে আমেরিকার পৃষ্ঠপোষকতায় পশ্চিম ইউরোপের পুনর্গঠনে সৃষ্ট হয় বিশ্ব ব্যাংক এর মত সংস্থাগুলো। একই পদক্ষেপ গৃহীত হয় সামরিক ক্ষেত্রেও– NATO (North Atlantic Treaty Organization) ১৯৪৯ সালে গঠিত হয় এই লক্ষ্যেই। পাল্টা জোট হিসেবে গঠিত হয় ওয়ারসো জোট। ১৯৫৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে এভাবেই সৃষ্টি হয় ব্যাপক ভিত্তিক সামরিক শক্তিবর্ধনের প্রতিযোগিতা। পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র– এই দুই নীতিতে এই দুই পরাশক্তিকে কেন্দ্র করে সমগ্র পৃথিবী দু'টি জোটে পরিণত হতে থাকে, যা ক্রমে স্নায়ু যুদ্ধের রূপ লাভ করে। এই পরিস্থিতি থেকে শান্তিপ্রিয় রাষ্ট্রগুলো চেষ্টা করে এই দুই জোট থেকে পৃথক অবস্থানে থাকতে। এই প্রচেষ্টারই নাম জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন বা Non Aligned Movement. ১৯৫৫ সালে ইন্দোনেশিয়ায় বান্দুং সম্মেলনের মাধ্যমে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের অগ্রযাত্রা শুরু হলেও এর আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৬১ সালে। ন্যাম আন্দোলনের মূল উদ্যোক্তারা ছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু, ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি ডঃ সুকর্নো. মিসরের রাষ্ট্রপতি নাসের ও যুগোশ্লাভিয়ার রাষ্ট্রপতি মার্শাল টিটো। এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল বৃহৎ শক্তির অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে নিজেদেরকে সম্পূর্ণ দূরে রাখা এবং সকল দেশের সাথে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার সম্পর্ক বজায় রাখা। দুই-মেরু ভিত্তিক বিশ্ব ব্যবস্থায় যে টানটান উত্তেজনা ছিল, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন ছিল তারই সরাসরি ফলাফল। তৃতীয় শক্তি হিসাবে এই জোটই ছিল সে সময় আন্তর্জাতিক আইনের মর্যাদা ধরে রাখার সবচেয়ে বড় সহযোগী শক্তি। একটি যুদ্ধ আন্তর্জাতিক আইন তথা নিয়ম-নীতিকে কতোটা পেছনে ঠেলে দিতে পারে, এর আগে মানুষ সেটা দেখেছে এবং এর ফলে এটাও অনুভব করেছে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উত্তেজনা প্রশমন কতোটা জরুরি। সেই লক্ষ্যে ন্যাম অবশ্যই বড় ভূমিকা পালন করেছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন

পৃথিবীর ছয় ভাগের এক ভাগ নিয়ে গঠিত সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৯১ সালের ডিসেম্বে আনুষ্ঠানিকভাবে ভেঙে যায়; যদিও এই ভাঙনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল অনেক আগে, ঠিক কি কারণে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটলো, সেটা একটি গভীর বিতর্কের বিষয়। সবচেয়ে জনপ্রিয় ধারণা হলো পুঁজিবাদী রাষ্ট্র আমেরিকাই সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনে। ব্যাপক বিধ্বংসী যুদ্ধাস্ত্র তৈরি আর ঘন ঘন মহাশূন্য অভিযান– এই দুই প্রতিযোগিতা সোভিয়েত অর্থনীতির উপর গভীর প্রভাব ফেলে, যা তৈরি করে জন অসন্তোষ। এটাও মনে করা হয় আমেরিকার সাথে হাত মিলিয়ে মিখাইল গর্বাচভই ত্বরান্বিত করেছেন সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন। সমগ্র বিশ্বব্যাপী মানুষ মুক্তির জন্য যে সোভিয়েত ইউনিয়নকে ঘিরে স্বপ্ন দেখেছিল, যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল মেহনতী মানুষের জীবন সংগ্রামের প্রতীক, তার পতনে আশাহত মানুষের অভিযোগের আঙুল অধিকাংশ

ক্ষেত্রেই গর্বাচভের দিকেই; কারণ তিনিই ব্যর্থ হয়েছেন সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঠেকাতে। সেক্ষেত্রে গর্বাচভের বক্তব্যও প্রাসঙ্গিক। তার আত্ম জৈবনিক থিসিস অন মাই কান্ট্রি অ্যান্ড দি ওয়ার্ল্ড (কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস, নিউইয়র্ক, ২০০০) গ্রন্থে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের কারণগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে সোভিয়েত সাম্রাজ্যে মানবিকতার বিপর্যয়ই তার পতনের সবচেয়ে বড় কারণ। ত্রিশের দশকে স্তালিনের নির্মম শাসন ব্যবস্থাই মানুষকে ভিন্নরূপ ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে। ত্রিশের দশকে স্তালিনীয় সন্ত্রাসের সেই নির্মম সময়ে শুধু মস্কোতেই ৩০ হাজার মানুষকে গুলি করে হত্যা করা হয়। গর্বাচভ মনে করেন, ১৯৫৬ সালে সোভিয়েত কম্যুনিস্ট পার্টির কংগ্রেসে স্তালিনকে অভিযুক্ত করে রাজনৈতিক সন্ত্রাসের অনৈতিকতা বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, আদর্শগত রাষ্ট্র হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙন তখন থেকেই শুরু।

গর্বাচভ আরও মনে করেন, ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের পর লেনিন কম্যুনিস্ট একনায়কতন্ত্রের বিপরীতে একটি গণতান্ত্রিক বিকল্প সরকার গড়ে তোলার যে ইঙ্গিত করেছিলেন, তা না করতে পারাও সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের বড় কারণ। তার মতে, বিপ্লবের আগে লেনিন যদিও বলেছিলেন যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির বাইরে অন্য কোন প্রক্রিয়ায় সর্বহারার পক্ষে ক্ষমতায় আসা অসম্ভব, তথাপি বিপ্লবের গোড়া থেকেই সোভিয়েত নেতৃত্ব গণতন্ত্রকে নির্বাসন দিয়ে বসে। স্তালিনের হাতে এই নির্বাসন আরো কঠোর হয়। সে সময় ব্যক্তি স্বাধীনতা চরমভাবে উপেক্ষিত হয়। এই সমস্যা থেকে উত্তোরণের একটা শেষ চেষ্টা গর্বাচভ করেছিলেন তার পেরেস্ত্রোইকা ও গ্লাসনস্তের মাধ্যমে। পেরেস্ত্রোইকার মাধ্যমে অর্থনৈতিক সংস্কারে হাত দেয়া হয়েছিল, উৎপাদন ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার প্রতিটি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নিরঙ্কুশ আধিপত্য হ্রাসের উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। অন্য দিকে গ্লাসনস্তের অধীনে দেশের মানুষ তাদের গণতান্ত্রিক ও নাগরিক অধিকার ফিরে পেতে শুরু করেছিল। কিন্তু বিভিন্ন জাতিগত সমস্যায় এই দু'টি কার্যক্রম বেশি দূর এগুতে পারে নি।

পেছনের কারণ যাই থাকুক, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটেছে, এখন সেটাই বাস্তবতা। এই পতন রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতার, না কি আদর্শের– সেটা অন্য বিতর্ক; সবচেয়ে বড় কথা হলো এই ঘটনার ফলে আন্তর্জাতিক আইন প্রবেশ করেছে তার ক্রমবিকাশের নতুন একটি ধাপে।

নতুন সহস্রাব্দে আন্তর্জাতিক আইন : ইরাক আগ্রাসন ও আন্তর্জাতিক আইনের পরিবর্তিত রূপ

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্বে তুলনামূলক শান্তি বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে মূলত: জাতিসংঘের সাহায্যে, আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মাধ্যমে ও মানবাধিকারের প্রতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের বিশেষ দৃষ্টির কল্যাণে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবী যখন শত্রুভাবাপন্ন দুটো শিবিরে বিভক্ত ছিল, তখনও আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদ ছিল সজাগ, সক্রিয় ও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আশাতীতভাবে সফল।

আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র/রাষ্ট্রসমূহের স্বার্থ রক্ষার্থে ভেটো প্রয়োগের ক্ষমতা যেমন ব্যবহার করা হয়েছে তেমনি তার অপব্যবহারও হয়েছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়

কর্তৃক স্বীকৃত ও জাতিসংঘ সনদে বর্ণিত পরিষদের কর্মপন্থা তৎকালীন প্রেক্ষাপটে সময়ে সময়ে ঘোর সমালোচনার সম্মুখীন হলেও তাকে অবজ্ঞা করা হয় নি, তাই অযাচিত শক্তি প্রয়োগ পরিহার করা গেছে এবং আন্তর্জাতিক আইন ক্রমাগত শক্তিশালী হয়েছে এবং আন্তঃ রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে প্রধান নিয়ামকে রূপান্তরিত হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর ১৯৯১ সালে উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় আন্তর্জাতিক আইনের অন্তর্নিহিত শক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটে। 'আঞ্চলিক অখণ্ডতার' ও 'সার্বভৌম সমতার নীতির' উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত, 'রাজনৈতিক স্বাধীনতা' রক্ষার্থে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় জাতিসংঘের মাধ্যমে একজোট হয়েছে এবং সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে কুয়েতের অখণ্ডতা ও স্বাধীনতাকে সমুজ্জল রেখেছে। এর মাধ্যমে সোভিয়েত পরবর্তী বিশ্বে জাতিসংঘ আরও কার্যকর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক আইনের অফুরন্ত সম্ভাবনা সকলের মনে গভীর আশার সঞ্চার করেছে– বিশেষত: দুর্বল ও ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের মনে।

কিন্তু আজ যেন এক ভিন্ন পৃথিবীর বাসিন্দা আমরা। যে 'ভেটো' ব্যবস্থা নিরাপত্তা পরিষদ ও জাতিসংঘকে এতদিন কার্যকর করে রেখেছিল, তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে, জাতিসংঘকে পাশ কাটিয়ে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মতামতকে চরম-উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করে, জাতিসংঘ সনদের চরম লংঘন করে, মানবাধিকারের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুল প্রদর্শন করে ২০০৩ সালে ইরাকের বিরুদ্ধে যে আগ্রাসন সংঘটিত হয়েছে, তাতে করে জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক আইন ইত্যাদির প্রতি সৃষ্টি হয়েছে চরম অনাস্থা। সঙ্গত ভাবেই প্রশ্ন দেখা দেয়, জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক আইনের ভবিষ্যত কী? মানবাধিকারের এহেন চরম লংঘনের পরও কি আন্তর্জাতিক আইন বলে কিছু থাকে?

আন্তর্জাতিক আইনের বৈধতার মাপকাঠি হচ্ছে আন্তর্জাতিক আইন নিজেই। আজ আমরা আন্তর্জাতিক আইনের যে নীতিমালাকে অবশ্য পালনীয় হিসেবে গণ্য করি এবং যে নীতি সমূহ থেকে কোন অবস্থাতেই কোন ধরনের বিচ্যুতি বৈধ নয়, সেগুলো কিন্তু একদিনে জন্ম লাভ করে নি, উদাহরণ হিসেবে ধরা যেতে পারে 'আন্ত রাষ্ট্রীয় সম্পর্কের শক্তির না- প্রয়োগের নীতির কথা। এমনকি গত শতকের প্রথমার্ধেও এরূপ ক্ষেত্রে শক্তির ব্যবহার বেআইনী ছিল না। ১৯২৮ সালের ব্রায়ানকেলগো চুক্তিতে (মার্কিন-ফরাসী চুক্তি) সর্বপ্রথম শক্তি প্রয়োগের বিধানকে পরিহার করার কথা বলা হয়; এবং জাতিসংঘ সনদে এই নীতিটি চূড়ান্তরূপ ধারণা করে। বিরোধ নিরোধে শক্তি প্রয়োগের বৈধতা থেকে মানব সমাজ প্রভূত অগ্রগতি সাধন করেছে এবং এরূপ শক্তির প্রয়োগকে আইনের লংঘন হিসাবে শনাক্ত করা হয়েছে। যে কোন বিচারে ইরাকের বিরুদ্ধে আগ্রাসন আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনের, জাতিসংঘ সনদের সুস্পষ্ট ও চরম লংঘন। আমরা কিন্তু ইঙ্গ-মার্কিন পদক্ষেপকে 'আগ্রাসন; 'আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকারের চরম লংঘন' হিসেবে চিহ্নিত করছি সমকালীন আন্তর্জাতিক আইনের আলোকে। তাই যখন কোন রাষ্ট্রনায়ক জাতিসংঘকে 'জাতিসমূহের তর্কের নিছক প্লাটফর্ম' বা ভেটো প্রয়োগের ক্ষমতাকে কোন কোন রাষ্ট্রের যুক্তিহীন খামখেয়ালীপনা' ইত্যাদি পদে তাচ্ছিল্য ভরে অভিহিত করেন, তখন সেই বক্তব্য প্রদানকারীকে আমরা সমীহ করতে পারি না এবং তারা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ঘৃণার উদ্রেক করে। বর্তমান বিরোধের একটি পক্ষ যখন নির্বিচারে ক্লাস্টার বোমা (যা আর্ন্তজাতিকভাবে নিষিদ্ধ) ব্যবহার করে বেসামরিক জনগণের অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্টকে আরও চরমে নিয়ে যায়, পরক্ষণে তারাই যুদ্ধবন্দিদের প্রতি

আন্তর্জাতিক আইনে স্বীকৃত আচরণ করার জন্য দাবী জানায়। স্ববিরোধীতা থাকলেও, আন্তর্জাতিক আইনের প্রয়োজনীয়তা ও শক্তির প্রতি কি এটি দিক নির্দেশ করে না?

এমনকি যখন শক্তি প্রয়োগ অবৈধ ছিল না, তখনও যুদ্ধকে দু'ভাগে ভাগ করা হত: ন্যায় যুদ্ধ ও অন্যায় যুদ্ধ। এবং আন্তর্জাতিক আইনে পক্ষপাতিত্ব ছিল ন্যায়যুদ্ধের দিকে। আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনে, শক্তি প্রয়োগ যখন অবৈধ হিসেবে চিহ্নিত হল, তখনও দেখা গেল যে বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে শক্তিপ্রয়োগ বৈধ হতে পারে। যেমন-চাপিয়ে দেয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, বা আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ বা মানবাধিকারের চরম ও সুস্পষ্ট লঙ্ঘন রোধক যুদ্ধ বা শক্তি প্রয়োগ যা না করলে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে-এমন ক্ষেত্রে যুদ্ধ বৈধ। কিন্তু ইরাকে আগ্রাসনের ক্ষেত্রে এর কোন একটি কি প্রযোজ্য? অবশ্য আগ্রাসী শক্তি তদের স্বপক্ষে যুক্তি দেখায় যে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসরোধে, Weapons of mass destruction ধ্বংস করার নিমিত্তে এবং জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের ১৪৪১নং সিদ্ধান্ত পালন না করার শাস্তি হিসেবে ইরাকের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ যুক্তিসঙ্গত। বলাবাহুল্য যে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে ইরাকের যোগসূত্রের দাবিটি বড়ই ভঙ্গুর ও ঠুনকো। ইরাকের হাতে গণবিধ্বংসী মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে-এরূপ প্রমাণ জাতিসংঘের অস্ত্র পরিদর্শকরাও দিতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত নং ১৪৪১ প্রতিপালনের জন্য কোন বেঁধে দেয়া সময় সীমা ছিল না। তাই তা লংঘনের কোন যুক্তিও টেকে না। অর্থাৎ সমকালীন আন্তর্জাতিক আইনের যে কোন মানদণ্ডে ইরাকের বিরুদ্ধে আগ্রাসন আন্তর্জাতিক আইন ও নৈতিকতার পরিপন্থী।

তবে, একই সাথে আমাদের বোধ হয় ভাবতে হবে যে, সম্ভবত: আন্তর্জাতিক আইনের ক্রম বিকাশের ধারায় কিছু নতুন নতুন নীতি সংযোজিত হতে চলেছে। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়, জাতিরাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের নীতি যে অটুট অবস্থানে ছিল, তার পরিবর্তন হতে চলেছে, যেসকল কারণে শক্তি প্রয়োগ বৈধতা পেতে পারে তার মধ্যে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা একটি প্রধান কারণ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে এবং আন্তর্জাতিক আইনের যে আপাত: 'সাম্যবাদী' নীতি (সার্বভৌম সমতার নীতি) প্রচলিত ছিল (যা বাস্তবে কদাচিৎ ছিল) তার স্থলে শক্তিশালী রাষ্ট্রের বিশেষ ভূমিকার উল্লেখ করার চেষ্টা হতে পারে। এর কোনটিই হয়তো বর্তমানের আঙ্গিকে ও যুক্তিতে সমর্থনযোগ্য নয়। কিন্তু বাস্তব অবস্থা তো আমাদের চিন্তা চেতনা ও যুক্তিরও পরিবর্তন ঘটায়। রাষ্ট্রীয় আইন সর্বদাই অর্থনৈতিকভাবে অধিক শক্তিশালী শ্রেণীর আজ্ঞাবহ ভৃত্য হিসেবে কাজ করে। আন্তর্জাতিক আইনও এক্ষেত্রে ভিন্নতর নয়। কিন্তু এযাবৎকাল বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের জীবনকালে আন্তর্জাতিক আইনের এই দিকটি বড়ই উহ্য ছিল। আজ একক পরাশক্তির বিশ্বে, যে কোন আইনের ন্যায় আন্তর্জাতিক আইনেরও এই বর্বর, অসম, শোষকের প্রতি উলঙ্গ আনুগত্যের পরিচয়টি স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে।

আমরা আন্তর্জাতিক আইনের এবং জাতিসংঘের এক সংকট কালে অবস্থান করছি। বলা যেতে পারে, আধুনিক আন্তর্জাতিক আইন, ইরাকে আগ্রাসনের মাধ্যমে উত্তর-আধুনিক স্তরে উপনীত হতে চলছে। কী হবে উত্তর-আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনের মূল নীতিমালা ও পরিচয়? বোধ করি, এর উত্তরের জন্য আমাদের আরও কিছুটা সময় অপেক্ষা করতে হবে।

আন্তর্জাতিক আইনের উৎস

Sources of International Law

উৎস হচ্ছে সৃষ্টিস্থল। আন্তর্জাতিক আইনের উৎস আইন সৃষ্টির সাথে সম্পর্কিত। আন্তর্জাতিক আইন একদিনে গড়ে ওঠে নি। এটি ক্রমে ক্রমে কতিপয় উৎসের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। বহুদিন ধরে বহু বিচার বিশ্লেষণ ও বিতর্কের পরে অনেক প্রভাবশালী রাষ্ট্রের সাধারণ সম্মতিক্রমে তা গড়ে উঠেছে এবং ধীরে ধীরে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক আইনের বিধান সৃষ্টি হচ্ছে একটি প্রক্রিয়া যার ফলাফল হচ্ছে আন্তর্জাতিক আইনের উৎস। আন্তর্জাতিক আইনের উৎস আমাদেরকে বলে দেয় কোন বিশেষ আকারে আইনের বিধানসমূহ বিরাজ করে বা কোন বস্তুতে এ আইনের সাক্ষাত পাওয়া যায়। আন্তর্জাতিক আইনের উৎসসমূহকে ২ ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

১. বস্তুগত (material) উৎস

২. আনুষ্ঠানিক (formal) উৎস

একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিতে সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহের সাধারণ সম্মতি সৃষ্টি হয় যা আন্তর্জাতিক আইনের মূল ভিত্তি। এই প্রক্রিয়া এবং এর ফলে সৃষ্ট রাষ্ট্রসমূহের সাধারণ সম্মতি থেকেই আন্তর্জাতিক আইন তার বৈধতা লাভ করে। সুতরাং আন্তর্জাতিক আইনের উৎসের ক্ষেত্রে 'সাধারণ সম্মতি'কে আন্তর্জাতিক আইন পালনের মূলসূত্র হিসেবে ধরে 'জনগণের ইচ্ছা' যা রাষ্ট্রসমূহের সমন্বিত ইচ্ছার মাধ্যমে প্রতিফলিত হচ্ছে তাকে আন্তর্জাতিক আইনের আনুষ্ঠানিক উৎস বলা হয়। এ অর্থে সাধারণ সম্মতি ও এর সৃষ্টি প্রক্রিয়াই আন্তর্জাতিক আইনের আনুষ্ঠানিক উৎস। অপরদিকে যে সমস্ত বিষয় বা বস্তু (materials) আন্তর্জাতিক আইনের বিধানের উপস্থিতির সাক্ষ্য বহন করে অর্থাৎ যে প্রকৃত উৎস থেকে আইন তার শক্তি আরোহণ করে তাকে বস্তুগত উৎস বলা হয়। আন্তর্জাতিক চুক্তি, প্রথা, আন্তর্জাতিক আদালতের সিদ্ধান্ত বা জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে পূর্ণ ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত প্রস্তাবাবলী বস্তুগত উৎস-এর অন্তর্গত।

আন্তর্জাতিক আইনের উৎস নির্ণয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের সংবিধির ৩৮ (১) ধারা যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে। এ ধারা অনুযায়ী বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আদালত যে আইন প্রয়োগ করবে তা হচ্ছে :

ক. বিভিন্ন বিধি-বিধান সৃষ্টিকারী আন্তর্জাতিক কনভেনশন বা চুক্তি যা বিরোধপক্ষসমূহ কর্তৃক স্বীকৃত;

খ. আন্তর্জাতিক প্রথা যা আইন হিসেবে সাধারণভাবে স্বীকৃত;

গ. আইনের সাধারণ নীতিমালা যা সভ্য জাতিসমূহ কর্তৃক স্বীকৃত;

ঘ. বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্ত;

ঙ. বিভিন্ন দেশের খ্যাতিমান পণ্ডিত ব্যক্তিদের মতবাদ যা আইনের বিধান নির্ণয়ে সহায়ক ভূমিকা পালনে সমর্থ।

সমসাময়িককালে আন্তর্জাতিক আইনের উৎস হিসেবে ন্যায়পরায়ণতাকে (equity) বিবেচনায় আনা হয়।

আন্তর্জাতিক আইন মূলত প্রথাভিত্তিক আইন হিসেবেই তার যাত্রা শুরু করেছে এবং এখন পর্যন্ত এটা এই আইনের একটি অন্যতম প্রধান উৎস হিসেবে স্বীকৃত। যেহেতু প্রথাই আন্তর্জাতিক আইনের প্রাথমিক উৎস এবং অনেকাংশে প্রথাসমূহই ক্রমান্বয়ে চুক্তি আইনে রূপ লাভ করেছে বা করছে, সেহেতু প্রথা দিয়েই আন্তর্জাতিক আইনের উৎসসমূহের আলোচনা আরম্ভ করা যেতে পারে।

১. আন্তর্জাতিক প্রথা

আন্তর্জাতিক আইন ও রাষ্ট্রীয় আইন উভয় ক্ষেত্রেই প্রচলিত এবং সর্বজন স্বীকৃত প্রথা আইনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস। প্রাচীনকাল থেকেই আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে সমস্ত রীতি-নীতি রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক ব্যাপক প্রয়োগের ফলে সাধারণ গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে তা প্রথাভিত্তিক আইন হিসেবে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের প্রধান নিয়ন্ত্রক বলে বিবেচিত হয়ে আসছে।

সব প্রথাকেই আইন বলা যায় না। যে সমস্ত প্রথা আইন হিসেবে সর্বজন স্বীকৃত তাকেই শুধু আইনের বৈধ উৎস বলা যেতে পারে। ৩৮ (১/খ) অনুচ্ছেদের ভাষায় রাষ্ট্রসমূহের কার্যক্রম বা আচরণ (State Practice) প্রথাসিদ্ধ আইনে পরিণত হয়েছে, এ মর্মে সুস্পষ্ট সাক্ষ্য বহন করলেই শুধু তাকে উৎসের মর্যাদা দেয়া যাবে, অর্থাৎ প্রথাকে আইনের মর্যাদায় ভূষিত করতে হলে রাষ্ট্রসমূহের কাছে তার সাধারণ গ্রহণযোগ্যতা অবশ্যই যাচাই করতে হবে।

প্রথাকে আইনের মর্যাদা প্রদানের ক্ষেত্রে কয়েকটি শর্ত অপরিহার্য

প্রথমত : প্রথাকে স্মরণাতীত কাল থেকে প্রচলিত হতে হবে। যে প্রথা যতো দীর্ঘদিন যাবত প্রচলিত সে প্রথাকে আইন হিসেবে প্রমাণ করা ততো সহজতর। স্বল্পকালের প্রথা মূল্যহীন বিধায় আইনের মর্যাদা লাভ করতে পারে না। আইনবিদগণ প্রথাকে আইনের মর্যাদা দানের পূর্বে প্রাচীনত্ব বিবেচনা করার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তবে কম সময়ের প্রচলনেই যদি কোন প্রথার সার্বজনীনতা ও নিরবচ্ছিন্নতা প্রমাণ করা যায় তাহলে সে প্রথা আইনে রূপান্তরের প্রশ্নে কোন বাধা নেই। এ প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক মহাকাশ আইন ও সমুদ্র আইনে অর্থনৈতিক অঞ্চল ও মহীসোপান সংক্রান্ত বিধি-বিধানের উল্লেখ করা যায়।

দ্বিতীয়ত : আন্তর্জাতিক আইনের মর্যাদা লাভের জন্য প্রথাকে অবশ্যই যুক্তিসংগত হতে হবে। প্রথা সত্য ও ন্যায়ের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

তৃতীয়ত : প্রথাকে অধিকার আদায় ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার সাথে সম্পর্কযুক্ত হতে হবে। দীর্ঘকাল যাবত অবিরামভাবে অধিকাররূপে পালনের ফলে একটি প্রথা আন্তর্জাতিক আইনে মর্যাদা লাভ করে।

চতুর্থত : প্রথাকে হতে হবে সুনির্দিষ্ট। যে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রথাটির উপর নির্ভর করা হয়েছে তার প্রযোজ্যতা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ ও স্বীকৃতি থাকতে হবে।

আন্তর্জাতিক আদালত সংবিধির ৩৮(খ) অনুচ্ছেদে আইনে স্বীকৃত সাধারণ রীতিনীতির প্রমাণ স্বরূপ আন্তর্জাতিক প্রথার কথা বলা হয়েছে। সমাজের উপর প্রথার একটি ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে। বিশ্ব জনমতের অনুমোদন ক্রমে দীর্ঘদিনের আচার ব্যবহার প্রথায় পরিণত হয়েছে। এভাবে বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত আন্তর্জাতিক রীতিসমূহই আন্তর্জাতিক প্রথার মর্যাদা লাভ করেছে এবং এভাবেই রাষ্ট্রীয় আচার আচরণের মাধ্যমে বোঝা যায় যে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রথার অস্তিত্ব বিদ্যমান। রাষ্ট্রীয় আচার আচরণ হিসেবে প্রথার অস্তিত্ব নিরূপণের পদ্ধতিগুলো নিম্নরূপ :

১. **কূটনৈতিক সম্পর্ক :** দ্বি-পাক্ষিক ও বহু পাক্ষিক চুক্তি হতে বোঝা যায় যে, রাষ্ট্রসমূহের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক প্রথা বিদ্যমান। যেমন- রাষ্ট্র বা তার প্রধান কর্তৃক অথবা তার কোন সরকারি কর্মচারী কর্তৃক কোন ঘোষণা অথবা বিভিন্ন আইনগত উপদেষ্টা কর্তৃক প্রণীত পরিকল্পনা বা চিন্তাধারা আন্তর্জাতিক আইনে প্রথার অস্তিত্ব নির্দেশ করে থাকে।

২. **আন্তর্জাতিক সংগঠন :** আন্তর্জাতিক সংগঠনসমূহের কার্যকলাপের মাধ্যমে বোঝা যায় যে, রাষ্ট্রীয় আচার আচরণের ক্ষেত্রে প্রথার অস্তিত্ব বিদ্যমান। এরূপ আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর মধ্যে রয়েছে ILO, UNO প্রভৃতি।

৩. **রাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়ন :** একটি দেশের রাষ্ট্রীয় আইন কী রকম, রাষ্ট্রীয় আদালতের পদ্ধতি কী রকম, আন্তর্জাতিক কোন প্রথা অনুসৃত হচ্ছে কিনা অথবা রাষ্ট্রীয় আইন কী ঘোষণা করেছে, এটি প্রথাকে স্বীকৃতি দিচ্ছে কি না এগুলোর উপর রাষ্ট্রীয় আচার আচরণ তথা প্রথার অস্তিত্ব নির্ভরশীল। রাষ্ট্রীয় আদালতের সিদ্ধান্ত প্রথার উপর নির্ভরশীল। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত মামলা –

মামলা : The Scotia Case; স্কইশিয়া মামলা; (USA Vs. UK; Supreme Court of USA,1871)

এ মামলায় ১৮৬৩ সালে বৃটিশ পার্লামেন্ট সমুদ্রযানের মধ্যে সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য উন্মুক্ত সমুদ্রে জাহাজ চলাচলের ক্ষেত্রে প্রতিরোধ এবং সতর্কতামূলক অবস্থা হিসেবে রাতে বাতি ব্যবহার করার আইন প্রণয়ন করে। একই সময়ে ১৮৬৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসও অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। আস্তে আস্তে অনেক রাষ্ট্রই এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণে সম্মত হয় এবং এগুলো সবই ছিল রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত (Domestic Decision)। অতঃপর ১৮৭১ সালে (Scotia) নামক বৃটিশ জাহাজের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাহাজ Berkshire এর সংঘর্ষ হয়। উল্লেখ্য, Berkshire কোন বাতি ব্যবহার করছিল না। ফলে Berkshire ডুবে যায় এবং কয়েকজন নাবিক মারা যান। এছাড়া মালামালের যথেষ্ট ক্ষতিসাধন হয়। ফলে Berkshire ক্ষতিপূরণ দাবি করে Scotia'র বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে।

এই মামলার বিচার্য বিষয় হলো জাহাজ দু'টির নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য ১৮৬৪ সালের আইনের পূর্বে সাধারণ সামুদ্রিক আইন দ্বারা নির্ধারিত হবে কি না?

এই মামলাটির বিচার করতে গিয়ে আদালত বলেন যে, Berkshire কোন ক্ষতিপূরণ পাবে না। আদালত এই সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা প্রদান করতে গিয়ে বলেন যে, এই মামলার বিচার আন্তর্জাতিক প্রথা ভিত্তিক আইন অনুসারে হবে এবং যেহেতু জাহাজে বাতি জ্বালানোর নীতি আন্তর্জাতিক প্রথাভিত্তিক আইনে পরিণত হয়েছে এবং এটি যেহেতু উন্মুক্ত সাগরে সংঘটিত হয়েছে এবং Berkshire কোন বাতি ব্যবহার করে নি তাই সে আন্তর্জাতিক প্রথা লঙ্ঘণ করেছে। এবং কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ পাবার যোগ্যতা অর্জন করে নি।

একটি রাষ্ট্রীয় বিচারিক সিদ্ধান্ত (Domestic Judicial Decision) কিভাবে আন্তর্জাতিক প্রথায় পরিণত হতে পারে Scotia মামলা তার সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ।

যে কোন ধরনের আন্তর্জাতিক প্রথাই আন্তর্জাতিক প্রথাভিত্তিক আইনে রূপান্তরিত হতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে এরূপ প্রথাকে কতিপয় শর্তপূরণ করতে হয়। অর্থাৎ দু'টি পৃথক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। সেগুলো নিম্নরূপ :

১. বস্তুগত পরীক্ষা (Material Test) : কোন একটি আন্তর্জাতিক প্রথা যদি অবশ্যম্ভাবীরূপে বারবার আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় বা অনুসৃত হয় তাহলে তা Material test এ উত্তীর্ণ হয়েছে বলে ধরে নেয়া হয়। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত মামলা –

মামলা : The Asylum Case; রাজনৈতিক আশ্রয় মামলা; (Colombia Vs. Peru, ICJ, 1950)

এই মামলায় Haya De La Torre ছিলেন পেরুর একজন নাগরিক। ১৯৪৮ সালে তিনি পেরু সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন, তবে শেষ পর্যন্ত তিনি ব্যর্থ হন। পরে তার পক্ষে ওয়ারেন্ট ইস্যু হয় এবং তিনি লিমায় অবস্থিত কলম্বিয়ার দূতাবাসে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করেন। কলম্বিয়া এতে সম্মত হলেও পেরু সরকার তা মেনে নেয় নি। তারা Haya De La Torre কে নিরাপদে-দেশের বাইরে নিয়ে যাবার নিশ্চয়তা দিতে অস্বীকার করে।

এই মামলার বিচার্য বিষয় হলো এটি কোন রাজনৈতিক অপরাধ ছিল কি না? এবং কলম্বিয়া সরকারের এরূপ আশ্রয় প্রদানের ক্ষমতা রয়েছে কি না?

এই মামলাটির বিচার আন্তর্জাতিক আদালতে সম্পন্ন হয় এবং আদালত সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে, কলম্বিয়া সরকারের এরূপ নিরাপদ আশ্রয় প্রদানের কোন অধিকার নেই। আদালত এ সিদ্ধান্তের পক্ষে ব্যাখ্যা প্রদান করেন যে, কোন প্রথাকে আইনে পরিণত হতে হলে তাকে অবশ্যই Material test এ উত্তীর্ণ হতে হবে। যে পক্ষ এই প্রথার উপর নির্ভর করবে তাকে প্রমাণ করতে হবে যে, উক্ত প্রথা বারবার ব্যবহৃত ও অনুসৃত হয়েছে। কিন্তু কলম্বিয়া এরূপ কোন প্রমাণ দেখাতে না পারায় ধরে নেয়া হয়েছে যে উক্ত প্রথা কোন আন্তর্জাতিক আইন হিসেবে পরিগণিত হতে পারে না। অর্থাৎ এটি Material test এ উত্তীর্ণ হয় নি।

২. মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা (Psychological test) : শুধু একটি নীতি অনুসরণ করাই নয়, এটি কেন অনুসরণ করা হচ্ছে অর্থাৎ এর কোন প্রয়োজনীয়তা আছে কি না তাও বিবেচনায় আনতে হবে। কোন সুনির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা থাকলেই কোন প্রথা Psychological test এ উত্তীর্ণ হতে পারবে। এভাবে কোন প্রথা অনুসরণের পেছনে আন্তর্জাতিক সম্মতি থাকতে হবে। অর্থাৎ একটি রাষ্ট্র যদি কোন প্রথা মেনে চলে, এই কারণে যে তার নিকট এরূপ প্রতীয়মান হয় যে ঐ প্রথাটি মেনে চলতে সে আইনগতভাবে বাধ্য; তাহলে প্রথাটি মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে বলে ধরে নেয়া হয়। Psychological test এর ক্ষেত্রে যে ল্যাটিন term টি রয়েছে তাহলো – "opinio juris sive necessitatis"-এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত মামলা হচ্ছে :

মামলা : Lotus Case; লোটাস মামলা; (France Vs. Turkey, PCIJ, 1927)

এই মামলায় ফ্রান্সের জাহাজ Lotus-এর সঙ্গে উন্মুক্ত সমুদ্রে তুরস্কের জাহাজ Boz Kourt এর সংঘর্ষ হয়। এর ফলে Boz Kourt ডুবে যায় এবং কয়েকজন নাবিক মারা যান। এরপর Lotus ইস্তাম্বুলে নোঙর করলে তুরস্ক এটিকে আটক করে এবং ক্ষতিপূরণ দাবি করে এবং Lotus এর নাবিক Demons কে আটক করে। এরপর ফ্রান্স Lotus কে ছেড়ে দিতে বলে কিন্তু তুরস্ক এতে অস্বীকৃতি জানায় এবং তুর্কীর আদালতেই মামলাটির বিচার শুরু করে।

এই মামলাটির বিচার্য বিষয় হলো তুরস্কের আদালতের মামলাটি বিচার করার কোন এখতিয়ার আছে কি না?

বিষয়টি আন্তর্জাতিক স্থায়ী আদালতে (PCIJ) উত্থাপিত হয় এবং আদালত সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে, ফ্রান্স এবং তুরস্ক উভয় রাষ্ট্রের আলোচ্য অপরাধ বিচারের ক্ষমতা আছে এবং তুরস্ক ফৌজদারি ব্যবস্থা গ্রহণ করে কোন আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করে নি। এই মামলার রায়ে আদালত বলেন, এটা ঠিক যে, কিছু ব্যতিক্রম সাপেক্ষে পতাকা রাষ্ট্রেরই (Flag State) একচ্ছত্র এখতিয়ার আছে গভীর সমুদ্রের কোন অপরাধের বিচার করার। তথাপি, এর অর্থ এই দাঁড়ায় না যে, কোন রাষ্ট্র তার নাগরিকদের প্রতি সংঘটিত অপরাধের বিচার তার ভূ-খণ্ডে করতে পারবে না। বিচারক আরও বলেন, সাধারণত: এইসব ক্ষেত্রে একটি রাষ্ট্র তার আদালতে ফৌজদারি কার্যক্রম গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে; এর অর্থ এই না যে, রাষ্ট্রটি এরূপ করতে বাধ্য। এটি একটি চর্চা, যা কোন বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করে না। আদালত আরও বলেন যে পূর্বে পতাকাবাহী নয় এমন রাষ্ট্র উন্মুক্ত সমুদ্রে সংঘটিত অপরাধের বিচার করে নি সত্য, কিন্তু কোনরূপ আইনগত বাধ্যবাধকতার কারণে তারা বিরত থেকেছে বলে আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় নি। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় আচরণ মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় নি বিধায় প্রথা হিসেবে স্বীকৃতি পেতে পারে না।

উল্লেখ্য, বর্তমানে এই মামলার সিদ্ধান্তটি অনুসরণ করা হয় না।

২. আন্তর্জাতিক চুক্তি

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাসে চুক্তির গুরুত্ব অপরিসীম। 'pacta sunt servanda' অর্থাৎ 'চুক্তি অবশ্য পালনীয়' এই মতবাদ আন্তর্জাতিক আইনের মূল ভিত্তি। আন্তর্জাতিক আদালত সংবিধির ৩৮ (১) (ক) অনুচ্ছেদে আন্তর্জাতিক চুক্তিকেই প্রথমে স্থান দেয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী চুক্তি বলতে দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের মধ্যে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিষয়ে লিখিত দলিলমূলে আবদ্ধ আন্তর্জাতিক ঐক্যমতকে বুঝায়।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে কোন আইন পরিষদ নেই। রাষ্ট্রসমূহ নিজেদের মধ্যে চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে আইন প্রণয়ন করে। Vienna Convention on the Law of Treaties-1969 অনুযায়ী রাষ্ট্রসমূহ আন্তর্জাতিক বিষয়ে একাধিক চুক্তি করতে পারে। তাই বর্তমান যুগে আন্তর্জাতিক চুক্তির ভূমিকা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় আন্তর্জাতিক আইনের উৎস হিসেবে আন্তর্জাতিক চুক্তি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। চুক্তিসমূহ আন্তর্জাতিক কনভেনশন বা আন্তর্জাতিক কভিন্যান্ট, প্রটোকল, চার্টার, এগ্রিমেন্ট ইত্যাদি নামেও পরিচিত।

চুক্তি চার (৪) প্রকারের হতে পারে –

ক. সার্বজনীন চুক্তি : এই চুক্তি সকল রাষ্ট্রের উপর প্রযোজ্য হয়। উদাহরণস্বরূপ : জাতিসংঘ সনদ। এ প্রসঙ্গে জাতিসংঘ সনদের ১০৩ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, জাতিসংঘ সনদ ও অন্যান্য চুক্তির মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে জাতিসংঘ সনদ প্রাধান্য পাবে।

খ. **আঞ্চলিক চুক্তি :** একটি বিশেষ অঞ্চলকে কেন্দ্র করে যে বহুপাক্ষিক চুক্তি হয় তা আঞ্চলিক চুক্তি। আঞ্চলিক চুক্তি সব সময় বহুপাক্ষিক হয়।

গ. **বহুপাক্ষিক চুক্তি :** দুয়ের অধিক রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি।

ঘ. **দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি :** দু'টি রাষ্ট্রের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে তা দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি।

একটি বৈধ চুক্তির জন্য কতগুলো শর্ত পূরণ হওয়া প্রয়োজন। যেমন –

ক. চুক্তির পক্ষগণকে চুক্তি করার যোগ্য হতে হয়। সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহ চুক্তির যোগ্য পক্ষ।

খ. যে ব্যক্তি বা প্রতিনিধি চুক্তি আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন এবং উহাতে স্বাক্ষর করবেন, তাকে সংশ্লিষ্ট সরকার কর্তৃক যথাযথ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হতে হয়।

গ. যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে সেই চুক্তি সম্পর্কে রাষ্ট্রসমূহের সম্মতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অনুচিত প্রভাব ও প্রতারণার দ্বারা চুক্তি করা হলে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের ইচ্ছায় চুক্তি বাতিল হতে পারে। রাষ্ট্রসমূহ চুক্তিতে স্বাক্ষর করলে সেটিকে বাধ্যতামূলক বলে স্বীকার করে নিচ্ছে বলে ধরে নেয়া হয়।

ঘ. চুক্তিকে আন্তর্জাতিক আইনের বিধান মোতাবেক সম্পাদিত হতে হয়। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক আইনের বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

সব আন্তর্জাতিক চুক্তিই আইন সৃষ্টির ক্ষেত্রে সমান গুরুত্ব বহন করে না। তবে অনেক চুক্তিই রয়েছে যা দ্বি-পাক্ষিক বা ত্রি-পাক্ষিকভাবে কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সম্পাদিত হয়। এ ধরনের চুক্তি পারস্পরিক দায়দায়িত্ব সৃষ্টি করে বটে তবে কোন বিধান সৃষ্টি করে না এবং চুক্তির উদ্দেশ্য সাধিত হলেই তার কার্যকারিতা শেষ হয়ে যায়। চুক্তিসমূহকে তাই দুই ভাগে ভাগ করা যায় –

১. আইন সৃষ্টিকারী চুক্তি (Law making treaty)

২. চুক্তি কনট্রাক্ট (Treaty Contract)

১. আইন সৃষ্টিকারী চুক্তি : আইন সৃষ্টিকারী চুক্তিসমূহ আন্তর্জাতিক আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। এই চুক্তি মূলত বহুপাক্ষিক। এ ধরনের চুক্তিসমূহে চুক্তিভুক্ত পক্ষগণের মধ্যে পারস্পরিক আচরণ সম্পর্কিত নিয়মাবলী নির্দেশিত হয় এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগণ উক্ত নির্দেশিত নিয়মাবলী পালন করতে বাধ্য থাকে। এটাকে এক ধরনের আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়ন ব্যবস্থা বলা যেতে পারে। আন্তর্জাতিক আইনের বিভিন্ন ক্ষেত্র যেমন যুদ্ধ সংক্রান্ত আইন, সমুদ্র আইন, কূটনৈতিক আইন, চুক্তি আইন ইত্যাদি বিষয়ে প্রচলিত প্রথার চুক্তিকরণের পাশাপাশি বিশেষ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বিগত বছরসমূহে শিল্প সম্পদ

রক্ষণাবেক্ষণ, দাস ব্যবসায়, বর্ণবাদ ও মাদকদ্রব্য সেবন নিরোধ, বিমান পরিবহন, আন্তর্জাতিক জল প্রবাহ, বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমস্যা, আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ও অর্থ বিষয়ক প্রশ্নাবলী, অস্ত্র সীমিতকরণ, রাষ্ট্র ও জাতীয়তাহীনতা, রাসায়নিক ও জীবাণু অস্ত্রের নিষিদ্ধকরণ, পারমানবিক অস্ত্রের প্রসার রোধ, পরিবেশ রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে অসংখ্য প্রয়োজনীয় বিধি প্রণীত হয়েছে।

২. চুক্তি কন্ট্রাক্ট : কন্ট্রাক্ট চুক্তিসমূহ সাধারণত আন্তর্জাতিক আইনের পরোক্ষ উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়। এরূপ চুক্তিসমূহ দ্বি-পাক্ষিক বা মুষ্টিমেয় পক্ষের মধ্যে অধিকার ও দায়দায়িত্ব সৃষ্টি করে। এদের কার্যকারিতা সীমিত সংখ্যক পক্ষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এ সমস্ত চুক্তি সাধারণ পক্ষসমূহের মধ্যে নির্দিষ্ট কোন বিষয়ে পারস্পরিক অধিকার ও দায়দায়িত্ব সৃষ্টি করে। আন্তর্জাতিক আইনবিদগণের অনেকেই চুক্তি কন্ট্রাক্টকে (treaty contract) আইনের উৎস বলে গণ্য করেন না। তাদের অনেকেই আইন সৃষ্টিকারী চুক্তিকেই (Law making treaty) আন্তর্জাতিক আইনের উৎস বলে বিবেচিত করেন। তাছাড়া আন্তর্জাতিক আদালত সংবিধির (ICJ)-এর Art. 38 (1) (a) অনুযায়ী সাধারণ কনভেনশন বলতে আইন সৃষ্টিকারী চুক্তিকে এবং বিশেষ কনভেনশন বলতে চুক্তি কন্ট্রাক্টসমূহকে বোঝায়। তবে চুক্তি- কন্ট্রাক্টসমূহকে রাষ্ট্রসমূহ যদি বার বার তাদের আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে এবং এভাবে যদি কিছু সময় অতিক্রান্ত হয় আন্তর্জাতিক প্রথায় রূপান্তরিত হয়।

চুক্তি শুধু রাষ্ট্রসমূহের মধ্যেই সম্পাদিত হয় না। আন্তর্জাতিক সংগঠনসমূহের নিজেদের মধ্যে এবং রাষ্ট্র ও সংগঠনসমূহের মধ্যে প্রতিনিয়ত অসংখ্য চুক্তি সম্পাদিত হচ্ছে। এ সমস্ত চুক্তিও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সাধারণভাবে প্রয়োগের জন্য আইনের বিধান তৈরি করতে পারে।

চুক্তি আইনের একটা সমস্যা হচ্ছে বহুপাক্ষিক এমনকি সার্বজনীন চুক্তিতেও যারা পক্ষ নন তারা এ ধরনের চুক্তির শর্তাবলী দ্বারা বাধ্য কি না? বহুপাক্ষিক চুক্তির ক্ষেত্রে অবশ্য এটা ঠিক যে, যারা পক্ষ নন তারা যদি আচরণের মাধ্যমে উল্লেখিত চুক্তির প্রতি মৌন সম্মতি জ্ঞাপন করেন তবেই শুধু তাদেরকে বাধ্য করা যাবে অন্যথায় নয়, ১৯৬৯ সালের Continental Shelf মামলায় আন্তর্জাতিক আদালত এই অভিমত ব্যক্ত করেন।

মামলা : North Sea Continental Shelf Cases; উত্তর সাগর মহীসোপান মামলা; (Germany Vs. Netherlands;Germany Vs. Dermark, ICJ, 1969)

জার্মানী ১৯৬৪ এবং ১৯৬৫ সালে যথাক্রমে নেদারল্যান্ডস ও ডেনমার্কের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়। এই চুক্তিদ্বয়ের বিষয়বস্তু ছিল সম দূরত্বে উপকূলের বিভাজন। কিন্তু পরবর্তীতে উত্তর সাগর মহীসোপানে রাষ্ট্রসমূহের সীমানা নির্ধারণে জটিলতার উদ্ভব হয় এবং দু'টি পৃথক পৃথক চুক্তির আওতাধীন রাষ্ট্রসমূহ বিষয়টি শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য তা আন্তর্জাতিক আদালতে

উত্থাপন করে। একটি মামলায় পক্ষদ্বয় হলো জার্মানী ও নেদারল্যান্ডস এবং অপরটিতে জার্মানী ও ডেনমার্ক। যেহেতু উভয় মামলার বিষয়বস্তু অভিন্ন, কাজেই আদালত একই কার্যক্রমে দু'টি মামলার নিষ্পত্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

মামলার বিচার্য বিষয়

১. ১৯৫৮ সালের জেনেভা কনভেনশনের অনুচ্ছেদ ৬ অনুসারে 'সম দূরত্ব নীতি' জার্মানীর উপর বাধ্যকরী কি না?

২. যদি এই নীতি প্রযোজ্য না হয়, তবে কোন নীতির অধীন বিষয়টির নিষ্পত্তি হবে।

সিদ্ধান্ত : এই মামলায় আদালত সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে, নেদারল্যান্ডস্ এবং ডেনমার্ক কর্তৃক দাবিকৃত 'সম দূরত্ব নীতি' (Principle of equidistance) এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না, কারণ ১৯৫৮ সালের জেনেভা কনভেনশনে জার্মানী স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র নয়। কাজেই জার্মানী এই নীতি মানতে বাধ্য নয়, আদালত আরও মত প্রকাশ করেন যে, কোন একটি নির্দিষ্ট নীতির অধীনে এই ধরনের সমস্যা সমাধান করা কঠিন; বিভিন্ন অবস্থাধীনে বিভিন্নভাবে সমস্যা নিরসন করতে হবে। এক্ষেত্রে আদালত 'সমতার নীতি' (equitable pinciple) অনুসরণ করার দিক নির্দেশনা দেন। তবে সার্বজনীন চুক্তির ক্ষেত্রে, যেমন–জাতিসংঘ সনদ, পক্ষ নয় এমন রাষ্ট্রসমূহেরও চুক্তির মূল শর্তাবলী মেনে চলার বাধ্যবাধকতা আছে বলে ধরে নেয়া যায়।

৩. সভ্য জাতিসমূহ কর্তৃক স্বীকৃত আইনের সাধারণ নীতিসমূহ

আন্তর্জাতিক আদালতের গঠনতন্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে যে, সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য এবং জটিল সমস্যাবলী সমাধানের উদ্দেশে আন্তর্জাতিক আদালত আইনের সাধারণ নীতিসমূহ প্রয়োগ বা অনুসরণ করতে পারেন। আইনের সাধারণ নীতিসমূহ হচ্ছে সার্বজনীন। আন্তর্জাতিক আদালতের সংবিধির ৩৮(১/গ) অনুচ্ছেদ থেকে এ ধারণা করা যায় যে, সভ্য জাতিসমূহ কর্তৃক স্বীকৃত আইনের সাধারণ নীতিসমূহও আন্তর্জাতিক আইনের একটি প্রধান উৎস।

আইনের এমন কিছু সাধারণ এবং অভিন্ন নীতিমালা রয়েছে যে নীতিগুলো থেকে দূরে সরা যায় না বা অমান্য করা যায় না। এ নীতিগুলো সভ্য জাতিসমূহ মেনে চলে। এ সমস্ত নীতিমালাসমূহের স্বরূপ নিরূপণের জন্য বিচারক বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কিছু স্ববিবেচনা প্রসূত ক্ষমতা (discretionary power) প্রয়োগের সুযোগ রয়েছে। তবে এ ক্ষমতা প্রয়োগ অবশ্যই স্বেচ্ছামূলক (arbitrary) নয়, সুবিবেচনাপূর্ণ হতে হবে। এ সাধারণ নীতিসমূহ দু'প্রকারের হতে পারে –

১. আন্তর্জাতিক আইনের সাধারণ নীতিসমূহ;

২. রাষ্ট্রীয় আইনের সাধারণ নীতিসমূহ।

তবে সাধারণ নীতিসমূহ আন্তর্জাতিক আইনের প্রত্যক্ষ উৎস নয়, কিন্তু আন্তর্জাতিক আইনের উৎস নির্ণয়ে সহায়তা করে। বিশেষ করে যেখানে প্রথাগত আইন ও চুক্তিভিত্তিক আইনের মধ্যে বিরোধ পরিলক্ষিত হয় সেক্ষেত্রে কিংবা যেখানে আন্তর্জাতিক আইনের কোন শূন্যতা বিরাজ করে তখনই সাধারণ নীতিসমূহ (General principles) এর মাধ্যমে সে শূন্যতা পূরণ করা যায়।

আইনের সাধারণ নীতিসমূহ নির্ধারণের জন্য প্রত্যেক রাষ্ট্রের আইন পর্যবেক্ষণ করা যখন সম্ভব হয় না সেক্ষেত্রে প্রধান প্রধান বিশ্ব আইন ব্যবস্থাসমূহের মধ্য থেকে সাধারণ নীতিমালা গ্রহণ করা হয়। পৃথিবীর প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের যে আইন ব্যবস্থাগুলোকে বৃহৎ কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন–

(i) ধর্মীয় আইন ব্যবস্থা (Religious Legal System), যেমন : মুসলিম আইন, হিন্দু আইন;

(ii) কমন ল ব্যবস্থা (Common Law System) যেমন : বাংলাদেশ, ভারত, যুক্তরাজ্য;

(iii) সমাজতান্ত্রীক আইন ব্যবস্থা (Socialist Legal System) যেমন : চীন, কিউবা, প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন;

(iv) সিভিল আইন ব্যবস্থা (Civil Law System) যেমন : ফ্রান্স, জার্মানী, ইতালি;

(v) প্রথাভিত্তিক আইন ব্যবস্থা (Traditional or customary Legal System) যেমন : মধ্য আফ্রিকার রাষ্ট্রসমূহ।

এমনিভাবে যখন বিশ্বের রাষ্ট্রীয় আইন ব্যবস্থাকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায় তখন সাধারণ নীতিমালাসমূহকে সনাক্ত করা সহজ হয়। এছাড়া কিছু কিছু নীতি রয়েছে যেগুলো প্রত্যেক রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ নীতিমালাতে রয়েছে। এমনকি অনেক সময় রাষ্ট্রীয় আইনের সাধারণ নীতিসমূহ আন্তর্জাতিক আইনের সাধারণ নীতিরূপে কাজ করে।

আইনের এ সাধারণ নীতিমালা বিশ্বের অধিকাংশ সভ্য রাষ্ট্রের স্বীকৃতি লাভ করেছে। আইনের এমন আরো অনেক স্বতঃসিদ্ধ নীতি ও যুক্তির কথা উল্লেখ করা যায় যা সব আইন ব্যবস্থাতেই স্বীকৃত, যেমন lex specialis derogat generali অর্থাৎ বিশেষ আইন সাধারণ আইনকে বাতিল করে, lex posteriori derogat priori পরবর্তী আইন পূর্ববর্তী আইনকে বাতিল করে, nemo plus juris transferre potest quam ipse

habet, অর্থাৎ কোন একজন তাঁর নিজের যা অধিকার আছে– তার চেয়ে বেশি অন্যকে প্রদান করতে পারে না ইত্যাদি। ১৯২০ সালে স্থায়ী আন্তর্জাতিক আদালতের সংবিধি রচনায় আইনবিদদের নিয়ে গঠিত উপদেষ্টা কমিটির সদস্য লর্ড ফিলিমোর উল্লেখ করেছিলেন যে, সংবিধিতে আইনের সাধারণ নীতি বলতে বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রীয় আইন ব্যবস্থায় স্বীকৃত অভিন্ন নীতিসমূহকেই বোঝানো হয়েছে। আন্তর্জাতিক আদালত কর্তৃক যেসব মামলায় আইনের এ সাধারণ মূলনীতিসমূহ প্রয়োগ করা হয় তন্মোধ্যে Chorzow Factory Case (PCIJ, 1928) এবং Barcelona Traction Power & Light Co. Ltd. (ICJ, 1970) মামলা উল্লেখযোগ্য। নিম্নে এ মামলাগুলো সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো–

মামলা : Chorzow Factory Case, চোর্জ কারখানা মামলা; (Germany Vs. Poland, PCIJ, 1928)

এই মামলাটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মান ও পোল্যান্ডের মধ্যে স্বাক্ষরিত একটি দ্বি-পাক্ষিক চুক্তির বিষয়ে। চুক্তির একটি বিধানে বলা হয় Upper Silesia তে, যা পোল্যান্ডের অন্তর্ভূক্ত হয়, জার্মান স্বার্থ সংরক্ষিত হবে এবং Upper Silesia তে জার্মানীর কিছু কোম্পানি রয়েছে যা বাজেয়াপ্ত করা যাবে না। কিন্তু পোল্যান্ড চুক্তি ভঙ্গ করে Upper Silesia তে অবস্থিত জার্মানীর দুইটি কোম্পানি বাজেয়াপ্ত করে। ফলে জার্মানী, পোল্যান্ড এর বিরুদ্ধে PCIJ তে মামলা দায়ের করে এবং অভিযোগ করে যে, পোল্যান্ড চুক্তি ভঙ্গ করে তাদের ক্ষতিসাধন করেছে। এই মামলার বিচার্য বিষয় হলো–

১. চুক্তির অধীনে পোল্যান্ড এর কোন আন্তর্জাতিক দায় আছে কি না?

২. Upper Silesia তে দুটো কোম্পানির বাজেয়াপ্তি ঐ দায়ের পরিপন্থী ছিল কি না?

৩. কোন চুক্তি বা দায় ভঙ্গের কারণে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে কি না?

এই মামলায় PCIJ রায়ে বলেন যে, দুটো কোম্পানি বাজেয়াপ্ত করে পোল্যান্ড জার্মানীর যে ক্ষতিসাধন করেছে সেজন্য পোল্যান্ড জার্মানীকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য। কারণ আন্তর্জাতিক আইনের একটা নীতি হচ্ছে যে কোন চুক্তি ভঙ্গের ফলে যে পক্ষের ক্ষতিসাধিত হয় সে পক্ষ ক্ষতিপূরণ পাবে।

মামলা : Barcelona Traction Light and Power Co. Ltd.; বার্সেলোনা ট্রাক্শন লাইট্ এণ্ড পাওয়ার কোং লি:; (Belgium Vs. Spain, ICJ, 1970)

এই মামলায় Barcelona Traction, Light & Power Co. Ltd. কোম্পানিটি কানাডায় প্রতিষ্ঠিত হয়। কোম্পানিটি স্পেনের বিদ্যুৎ ব্যবস্থা চালনা (Operate) ও নিয়ন্ত্রণ করতো। কিন্তু কোম্পানির বেশির ভাগ শেয়ার হোল্ডার (majority Shareholder) ছিল

বেলজিয়ামের। ১৯৪৮ সালে স্পেনের আদালত কর্তৃক কোম্পানিটি দেউলিয়া ঘোষিত হয় এবং ইহার মালামাল ক্রোক করা হয়। অধিকাংশ শেয়ার হোল্ডার বেলজিয়ামের ছিল বিধায় বেলজিয়াম স্পেনের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের মামলা করে। স্পেন তখন যুক্তি প্রদর্শন করে যে, মামলা করার জন্য বেলজিয়ামের Locus standi নেই, যেহেতু ক্ষতি হলে কোম্পানির হয়েছে, শেয়ার হোল্ডারদের নয়। এই মামলার বিচার্য বিষয় হলো-

১. কোম্পানির কি শেয়ার হোল্ডারদের থেকে পৃথক অস্তিত্ব বা সত্তা রয়েছে; এবং

২. বেলজিয়ামের মামলা করার Locus Standi আছে কি না?

এই মামলায় আদালত বেলজিয়ামের দাবি প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন, বেলজিয়ামের মামলা করার অধিকার নেই। আন্তর্জাতিক আদালত তার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন যে, কোম্পানি তার শেয়ার হোল্ডারদের থেকে আলাদা সত্তার অধিকারী। তাই ক্ষতি হলে কানাডার হয়েছে, বেলজিয়ামের নয়। কারণ কোম্পানিটি ছিল কানাডার, যদিও অধিকাংশ শেয়ার হোল্ডার ছিল বেলজিয়ামের। কোম্পানি ও শেয়ার হোল্ডার পৃথক ব্যক্তি। তাই মামলা করতে হলে কানাডাকে করতে হবে এবং এখানে বেলজিয়ামের দাবি গ্রহণযোগ্য নয়।

উল্লেখ্য যে, এটা সকল রাষ্ট্রীয় আইনের সাধারণ নীতি যে, Company is a separate legal entity from its shareholders সুতরাং রাষ্ট্রীয় আইনের কিছু নীতিমালা আন্তর্জাতিক আইনের উৎস হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

৪. বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্ত

আন্তর্জাতিক আদালত সংবিধির ৩৮(১) (ঘ) অনুচ্ছেদে বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্ত ও বিভিন্ন দেশের আন্তর্জাতিক আইনবিদদের লেখনীকে আইনের সঠিক বিধান নির্ণয়ের সহায়ক মাধ্যম হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্ত সরাসরি আন্তর্জাতিক আইনের উৎস হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না। তবে আইনের প্রকৃত বিধান নির্ধারণে অবশ্যই এর যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

বর্তমান আন্তর্জাতিক আদালত ১৯২১ সালে গঠিত স্থায়ী আন্তর্জাতিক আদালতের উত্তরসূরী। বর্তমান আদালত ও এর পূর্বসূরী গত প্রায় আশি বছরে বেশ কিছু সংখ্যক আন্তর্জাতিক মামলার নিষ্পত্তি করেছেন। এ সমস্ত মামলায় প্রদত্ত সিদ্ধান্তসমূহ আন্তর্জাতিক আইনের জন্য যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে। যদিও আন্তর্জাতিক আদালত সংবিধির ৫৯ নং অনুচ্ছেদে বলা আছে যে, আদালতের সিদ্ধান্ত শুধু সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের জন্য এবং সেই নির্দিষ্ট বিরোধ মীমাংসার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে এবং তা কোন অবস্থাতেই নজীর হিসেবে ব্যবহৃত হবে না; তবুও আদালত বাস্তবে তার রেফারেন্স টেনেছেন এবং নির্দিষ্ট কোন আইনের বিধান প্রমাণে তা ব্যবহার করেছেন। শুধু আদালত নয় বিভিন্ন রাষ্ট্র, সংস্থা ও পণ্ডিত ব্যক্তিগণ বিভিন্ন বিষয়ে আইনের প্রকৃত অবস্থা বর্ণনায় আদালত কর্তৃক মীমাংসাকৃত বিখ্যাত মামলা, যেমন-

নটেবাম (১৯৫৫), লোটাস (১৯২৭), করফু চ্যানেল (১৯৫০), মৎস শিকার (১৯৫১), উত্তর সাগর মহীসোপান (১৯৬৯) ইত্যাদি রেফারেন্স দেন। প্রখ্যাত আন্তর্জাতিক আইন বিশারদ লটারপ্যাক্টের মতে, আন্তর্জাতিক আদালতের সিদ্ধান্ত প্রকৃত আন্তর্জাতিক আইনের প্রতিফলন এবং কোন বিষয়ে আইনের বিধানটি কি- সিদ্ধান্ত তারই সাক্ষ্য বহন করে। আদালতসমূহে গৃহীত বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্তসমূহকে দুই ভাগে করা যেতে পারে–

১. রাষ্ট্রীয় আদালতের রায় বা সিদ্ধান্ত

২. আন্তর্জাতিক বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্ত

আন্তর্জাতিক আদালত সংবিধির ৩৮ (১/ঘ) অনুচ্ছেদে শুধু আন্তর্জাতিক বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্তের কথাই বলা হয় নি। রাষ্ট্রীয় বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্তসমূহও আন্তর্জাতিক আইনের বিধান নির্ধারণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। রাষ্ট্রীয় আদালতের রায় আন্তর্জাতিক প্রথা সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম। কোন বিষয়ের উপর যদি বিভিন্ন রাষ্ট্রের আদালতসমূহ একই ধরনের রায় প্রদান করে তবে তা আন্তর্জাতিক প্রথা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করতে পারে। বহিঃসমর্পণ ও রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি সংক্রান্ত অনেক আন্তর্জাতিক প্রথার বিকাশেও এধরনের রায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। কাজেই রাষ্ট্রীয় আদালতের সিদ্ধান্ত হতে পারে আন্তর্জাতিক আদালতের উৎস।

আন্তর্জাতিক আদালত আন্তর্জাতিক আইনের বিচারযোগ্যতা যাচাই করতে পারে। তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে–

মামলা : Anglo-Norwegian Fisheries Jurisdiction Case; এ্যাংলো- নরওয়েজিয়ান মৎস্য মামলা; (England Vs. Norway, ICJ, 1951)

উক্ত মামলায় দেখা যায় যে, নরওয়ে নিজ মৎস্য চারণক্ষেত্রের সৃষ্টির জন্য তার মূল ভূ-খণ্ড থেকে যথেষ্ট দূরে অবস্থিত দ্বীপসমূহ ও পর্বত রাজির ৪৮টি বিন্দুকে কেন্দ্র করে নিজস্ব জলসীমা চিহ্নিত করে। এর এক বিশাল সামুদ্রিক এলাকা নরওয়ের সীমানাভুক্ত হয়ে যায়। যুক্তরাজ্য, নরওয়ের এই সীমানা চিহ্নিত আদেশনামা আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী বলে দাবি করে। পরিশেষে বিরোধটি আন্তর্জাতিক আদালতে নিষ্পত্তির নিমিত্তে পেশ করা হয়।

এই মামলার রায়ে আন্তর্জাতিক আদালত বলেন, নরওয়ে কর্তৃক ঘোষিত আদেশের সীমানা নির্ধারণ পদ্ধতি এবং প্রকৃত সীমানা নির্ণয়ের ফলে আন্তর্জাতিক আইনের কোন বিধান বা নীতিমালা লঙ্ঘন করা হয় নি। ১৯৫৮ সালে রাষ্ট্রীয় সমুদ্র বিষয়ক জেনেভা কনভেনশন প্রণয়নকালে এই মামলাটি প্রাধান্য পায়।

এছাড়া আন্তর্জাতিক আদালতের মতামত অনুসারে, আন্তর্জাতিক ব্যক্তি সত্তা আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আইনে গৃহীত ও প্রদত্ত অধিকার ভোগ করতে পারে। আন্তর্জাতিক আইনের বিধান অনুযায়ী জাতিসংঘ একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন হিসেবে আন্তর্জাতিক সত্তার মর্যাদা লাভ করেছে। তার এই পরিচয় Reparation Case (1949) দ্বারা বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

মামলা : Reparation Case; ক্ষতিপূরণ মামলা; (ICJ, 1949)

১৯৪৮ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর Count Bernadotte নামক একজন সুইডিশ নাগরিক ইসরাইল অধিকৃত একটি নতুন শহরে কতিপয় সন্ত্রাসী দ্বারা নিহত হন। Count Bernadotte জাতিসংঘ মধ্যস্থতাকারী প্রধান হিসেবে সেখানে গিয়েছিলেন এবং দূত হিসেবে কার্যরত থাকা অবস্থায় নিহত হন। তার হত্যার পর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ তাদের কি করণীয় আছে, তারা আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা করতে পারবে কি না তা জানতে চেয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের মতামত প্রার্থনা করে।

আন্তর্জাতিক আদালত তার মত প্রদানের সময় বলেন, জাতিসংঘ অধিকাংশ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে। এর রয়েছে International personality. তাই জাতিসংঘ একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন হিসেবে তার কোন এজেন্ট বা প্রতিনিধি তার কর্তব্য সম্পাদনের সময় কোন রাষ্ট্রের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হলে বা নিহত হলে জাতিসংঘ দায়ী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের মামলা দায়ের করতে পারে। এই মামলায় জাতিসংঘ প্রতিনিধি Count Bernadotte সেখানে তার অফিসিয়াল দায়িত্ব পালন করছিলেন এবং সে এলাকার শান্তি প্রতিষ্ঠায় গিয়েছিলেন। তার নিরাপত্তার সার্বিক দায়িত্ব ছিল সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র অর্থাৎ ইসরাইলের। ইসরাইল তার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে। সুতরাং জাতিসংঘের ইসরাইলের বিরুদ্ধে মামলা করে ক্ষতিপূরণ দাবি করার অধিকার আছে।

এই মামলায় জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক সংগঠন হিসেবে আন্তর্জাতিক আইনের বিষয়বস্তু হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

আন্তর্জাতিক আইনের উৎস হিসেবে আন্তর্জাতিক আদালতের গুরুত্ব অপরিসীম। আন্তর্জাতিক আদালত সমীপে যেসব বিষয়াদী নিষ্পত্তির জন্য উপস্থাপন করা হয়, উক্ত বিষয়গুলির উপর আন্তর্জাতিক আদালত রায় প্রদান করেন। এছাড়াও আন্তর্জাতিক আদালত বিভিন্ন বিষয়ে উপদেশমূলক অভিমত ব্যক্ত করে এসেছে। এ অভিমত ও পরামর্শ আন্তর্জাতিক আইন বিকাশের ক্ষেত্রে এক নজীরবিহীন অবদান সৃষ্টি করছে। আন্তর্জাতিক আদালত সংবিধির ৩৮ (১) (ঘ) অনুচ্ছেদে আরো বলা হয়েছে যে, বিভিন্ন দেশের সর্বোচ্চ গুণসম্পন্ন আন্তর্জাতিক আইনের লেখকদের শিক্ষাবলীকে আইনের বিধি নির্ধারণের সহায়ক পন্থা হিসেবে প্রয়োগ করা যাবে।

কোন বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে যেখানে কোন প্রতিষ্ঠিত প্রথা বা চুক্তি নেই, সেখানে এই একমাত্র ব্যতিক্রম ক্ষেত্র হিসেবে আইনবিদদের মতামত আন্তর্জাতিক আইনের উৎস হিসেবে কাজ করে। প্রাসঙ্গিক মামলা–

মামলা : Re Piracy Jure Gentium; উন্মুক্ত সমুদ্রে জলদস্যুতা মামলা; (1934)

৪ জানুয়ারি ১৯৩১ তারিখে কিছু সংখ্যক চীনা নাগরিক সশস্ত্র অবস্থায় দু'টি চৈনিক জাহাজ (Chinese Junk) যোগে ভ্রমণ করছিল। তারা গভীর সমুদ্রে ভ্রমণকালীন সময়ে একটি পণ্যবাহী চৈনিক জাহাজকে ধাওয়া করে। পণ্যবাহী জাহাজের ক্যাপ্টেন কোন রকমে পালিয়ে আসতে সক্ষম হন, যদিও হামলাকারীরা ধাওয়া করতেই থাকে। এমনকি এক পর্যায়ে তারা গুলিও ছোঁড়ে। যাই হোক, তাদের দস্যুতার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং তাদের দস্যুতার অভিযোগে বন্দি করে হংকং নিয়ে আসা হয়।

হংকং আদালত সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে, দস্যুতার অপরাধ সংঘটিত হয় নি, এটা কেবল দস্যুতার প্রচেষ্টা ছিল এবং অভিযুক্তরা মুক্তি পায়। ১০ নভেম্বর, ১৯৩৩ বৃটিশ রাজা জুডিশিয়াল কমিটিতে বিষয়টি তাদের বিবেচনার জন্য প্রেরণ করেন।

বিবেচ্য বিষয় : কমিটির কাছে মূল বিচার্য বিষয় ছিল দস্যুতার একটি ব্যর্থ প্রচেষ্টাকে জলদস্যুতা হিসেবে আখ্যায়িত করা যাবে কি না?

সিদ্ধান্ত : এই মামলায় জুডিশিয়াল কমিটি সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে, জলদস্যুতা প্রমাণ করার জন্য প্রকৃত দস্যুতা প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই। দস্যুতার চেষ্টাই জল দস্যুতার অপরাধ প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট। এই মামলার সিদ্ধান্ত প্রদান করার জন্য জুডিশিয়াল কমিটি বিভিন্ন আইনজ্ঞের মতামত বিবেচনায় আনেন। সেই সব মতামতের ভিত্তিতেই এই রায় প্রদান করা হয়।

৫. ন্যায়পরায়ণতা

আন্তর্জাতিক আইনের উৎসের ক্রমিক উল্লেখে সবশেষে ন্যায়পরায়ণতা'র উল্লেখ হলেও গুরুত্বের দিক থেকে একে মোটেও অবহেলা করার উপায় নেই। আন্তর্জাতিক আইন একটি ক্রম-বিকাশমান আইন এবং এই কারণেই উৎস হিসেবে ন্যায়পরায়ণতার গুরুত্ব অধিক। কিছু কিছু মামলায় আন্তর্জাতিক আদালত সিদ্ধান্ত গ্রহণে যখন কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি বা প্রথার উপস্থিতি পাননি, তখন অনেক ক্ষেত্রেই ন্যায়পরায়ণতাকে ভিত্তি ধরেই মামলার সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন; আর এভাবেই 'ন্যায়পরায়ণতা' আন্তর্জাতিক আইনের উৎস হিসেবে তার অবস্থান তৈরি করে নিয়েছে। এমনই একটি মামলা হলো – **North Sea Continental Shelf Cases (1969)**, যা পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। আরও উল্লেখ করা যেতে পারে **Fisheries Jurisdiction Case (1974)**'র কথা।

মামলার ঘটনা : এই মামলায় আইসল্যাণ্ড একচেটিয়াভাবে তার ঘোষিত অর্থনৈতিক অঞ্চলের ৫০ মাইল এলাকায় বিদেশীদের মৎস্য শিকারের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। আইসল্যাণ্ডের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ব্রিটেন এবং জার্মানী আন্তর্জাতিক আদালতে যায়। তারা যুক্তি দেখায় যে, আইসল্যাণ্ড একচেটিয়া এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না এবং এই ধরনের কোন সিদ্ধান্ত অবশ্যই দ্বি-পাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে হওয়া উচিত।

সিদ্ধান্ত : এই মামলায় আদালত সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে, আইসল্যাণ্ডের এরূপ একচেটিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা নেই। এই সিদ্ধান্তের পেছনে কারণ হিসেবে আদালত বলেন, এই দু'টি দেশ দীর্ঘদিন থেকে এই অঞ্চলে মৎস্য শিকার করে আসছে এবং তাদের অর্থনীতিতে এর বিশাল ভূমিকা আছে। কাজেই আইসল্যাণ্ডের এমন সিদ্ধান্ত এই দুই দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর উপর কু-প্রভাব বিস্তার করবে। একই সঙ্গে, আদালত মত প্রকাশ করেন যে যদি কোন রাষ্ট্র সমুদ্র সম্পদের উপর অতিরিক্তভাবে নির্ভরশীল হয়ে থাকে (যেমন আইসল্যান্ড), তবে সে 'বিশেষ-অধিকার' (Preferential Right) ভোগ করতে পারবে। এভাবেই এই মামলায় 'ন্যায় পরায়ণতা' ও 'বিশেষ-অধিকার' নীতির প্রতিষ্ঠা হয়।

এছাড়াও ১৯৮২ সালের সমুদ্র আইন সংক্রান্ত কনভেনশনে অর্থনৈতিক অঞ্চল ও মহীসোপানের সীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতার নীতিমালা মেনে চলার বিধান করা হয়েছে (অনুচ্ছেদ ৭৪ ও ৮৩)।

আন্তর্জাতিক আইন ও রাষ্ট্রীয় আইন : আন্তঃসম্পর্ক
International Law and Municipal Law : Interrelation

স্টার্ক (Starke) এর মতানুসারে আর্ন্তজাতিক আইন অনুধাবনের জন্য আন্তর্জাতিক ও রাষ্ট্রীয় আইনের মধ্যকার সম্পর্ক সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন। অথাৎ আর্ন্তজাতিক আইনের প্রকৃতি ও প্রয়োগ ভালভাবে অনুধাবন করার জন্য রাষ্ট্রীয় আইনের সাথে-এর সঠিক সম্পর্ক নিরূপণ করা জরুরি। রাষ্ট্রীয় এলাকায় আর্ন্তজাতিক আইনের বিধান কিভাবে প্রয়োগ লাভ করবে, রাষ্ট্রীয় আদালতে আন্তর্জাতিক আইন প্রয়োগ হবে কি না? হলে কিভাবে? আন্তর্জাতিক আদালতে রাষ্ট্রীয় আইনের মূল্য কতটুকু এ সব প্রশ্নের সমাধানের জন্য আন্তর্জাতিক আইন ও রাষ্ট্রীয় আইনের সম্পর্কের প্রকৃতি জানা প্রয়োজন।

আন্তর্জাতিক আইন ও রাষ্ট্রীয় আইন সম্পর্কে আইনবিদগণ দু'টি ভিন্ন মতবাদে বিভক্ত, এ মতবাদ দুটি হচ্ছে–

১. **একাত্ববাদ (Monism) :** একাত্ববাদী আইনবিদগণ মনে করেন আন্তর্জাতিক আইন ও রাষ্ট্রীয় আইন দুটোর প্রকৃতিই এক, তাঁদের মতে রাষ্ট্রীয় আইন ও আন্তর্জাতিক আইনের মূল ভিত্তি এক এবং পরস্পর পরিপূরক।

২. **দ্বৈতবাদ (Dualism) :** দ্বৈতবাদ অনুসারে আন্তর্জাতিক আইন ও রাষ্ট্রীয় আইন আইনের দুটি ভিন্ন ধারা। দ্বৈতবাদ অনুসারে আন্তর্জাতিক আইন ও রাষ্ট্রীয় আইন স্বতন্ত্র এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ। দ্বৈতবাদী আইনবিদগণ মূলত প্রত্যক্ষবাদী।

সপ্তদশ– অষ্টাদশ শতাব্দীতে আইন বিজ্ঞানে প্রত্যক্ষবাদীদের প্রভাব বৃদ্ধির ফলে দ্বৈতবাদী মতবাদের প্রসার ঘটতে আরম্ভ করে। প্রত্যক্ষবাদীদের মতে রাষ্ট্রীয় ইচ্ছাই হচ্ছে আইন, তা যেভাবেই প্রকাশিত হোক না কেন। রাষ্ট্রীয় আইন কোন নির্দিষ্ট রাষ্ট্রীয় ইচ্ছার প্রতিফলন।

অন্যদিকে আন্তর্জাতিক আইন কোন একক সার্বভৌম রাষ্ট্রীয় ইচ্ছার প্রতিফলন নয়। আন্তর্জাতিক আইন বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ইচ্ছাসমূহের আপোসকৃত সমষ্টি। আধুনিক কালের দুই প্রত্যক্ষবাদী পণ্ডিত ট্রাইপল ও আনজিলতি দ্বৈতবাদের প্রধান প্রবক্তা।

দ্বৈতবাদের পক্ষে তাঁদের যুক্তিসমূহ নিম্নরূপ–

ক. **উৎস :** রাষ্ট্রীয় আইনের মূল উৎস হচ্ছে রাষ্ট্রীয় আইন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত আইন, উচ্চতর আদালতের সিদ্ধান্ত এবং স্থানীয় বা রাষ্ট্রীয় প্রথা, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক আইনের মূল উৎস হচ্ছে আর্ন্তজাতিক চুক্তি ও আন্তর্জাতিক প্রথা।

খ. **পক্ষ :** রাষ্ট্রীয় আইনের মূল পক্ষ হচ্ছে ব্যক্তি, রাষ্ট্র ও প্রতিষ্ঠান, অন্যদিকে আর্ন্তজাতিক আইনের মূলপক্ষ হচ্ছে বিভিন্ন সার্বভৌম রাষ্ট্র।

গ. আর্ন্তজাতিক আইনের মূল বা অন্তর্নিহিত নীতি হচ্ছে, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পাদিত সন্ধি বা অন্যান্য চুক্তির বিধানসমূহ সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলির পালন করা উচিত (Pacta Sunt Servanda)। অন্যদিকে, রাষ্ট্রীয় আইনের মূল বা অন্তর্নিহিত নীতি হচ্ছে,

রাষ্ট্রীয় আইন সভায় প্রণীত বা বিধিবদ্ধ আইন যা রাষ্ট্রের নাগরিকরা প্রতিপালনে বাধ্য থাকবে।

দ্বৈতবাদীদের মতে আন্তর্জাতিক আইন ও রাষ্ট্রীয় আইনের মধ্যে চরিত্রগত কোন মিল নেই, এদের প্রকৃতি ও প্রয়োগ ক্ষেত্র সম্পূর্ণ আলাদা, কাজেই এদের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটারও কোন সুযোগ নেই।

সুতরাং কোনটি অধিক মর্যাদা পাবে তা নির্ধারণেরও প্রশ্ন আসে না। দু'টোই দু'টোর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে পারে। বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক আইন রাষ্ট্রীয় আইনের প্রতি দিকনির্দেশ করতে পারে, আবার কখনো কখনো রাষ্ট্রীয় আইন আন্তর্জাতিক আইনের সাহায্য প্রত্যাশী হতে পারে। অর্থাৎ প্রকৃত অর্থে আন্তর্জাতিক আইন ও রাষ্ট্রীয় আইন পারস্পরিক নির্ভরশীলতার বন্ধনে আবদ্ধ যাকে Renvoi বলা যেতে পারে।

একাত্ববাদ : একাত্ববাদীদের মতে, রাষ্ট্রীয় আইন ও আন্তর্জাতিক আইনের প্রকৃতিতে কোন ভিন্নতা নেই। একাত্ববাদীরা আন্তর্জাতিক আইন ও রাষ্ট্রীয় আইনের মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য আছে বলে মনে করেন না। তারা মনে করেন পার্থক্যগুলো নিতান্তই বাহ্যিক, তাদের মতে প্রয়োগগত দিক থেকে রাষ্ট্রীয় আইন ও আন্তর্জাতিক আইনের মধ্যে কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হলেও উভয়ের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এক ও অভিন্ন, তাদের মতে–

প্রথমত : আন্তর্জাতিক আইন ও রাষ্ট্রীয় আইন একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ, আইন হচ্ছে বাধ্যতামূলক কিছু নীতি পদ্ধতির সমষ্টি, সুতরাং আইনের বিধান, তা আন্তর্জাতিক হোক বা রাষ্ট্রীয় হোক, মেনে চলতেই হবে, এ মেনে চলার পথ হয়তো ভিন্ন হতে পারে। কোথাও রাষ্ট্র আবার কোথাও ব্যক্তি মুখ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, কিন্তু তাতে আইনের বাধ্যকর প্রকৃতির কোন ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় না।

দ্বিতীয়ত : দু'আইনেরই উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তুতে কোন তফাৎ নেই। রাষ্ট্রীয় আইন মানব কল্যাণের জন্য সরাসরি রাষ্ট্র ও ব্যক্তির উপর প্রযোজ্য, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক আইন একই উদ্দেশে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, রাষ্ট্র ও তার মাধ্যমে চূড়ান্ত বিশ্লেষণে ব্যক্তির উপরই প্রযোজ্য।

একাত্ববাদী মতবাদের মূলতত্ত্ব বিশ্লেষণ করলে আন্তর্জাতিক আইন ও রাষ্ট্রীয় আইনের মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই বলেই মনে হয়। তবে সামান্য একটা পার্থক্য একাত্ববাদী আইনবিদগণ স্বীকার করেন এবং পার্থক্যটি সূচিত হয় অগ্রাধিকারের ধারণার ভিত্তিতে।

অধ্যাপক কেলসেন এর মতে, আন্তর্জাতিক আইন ও রাষ্ট্রীয় আইন উভয়ই মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং মানব সমাজের উপর শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্ব অর্পণ করে। কিন্তু অগ্রাধিকার বিবেচনা করলে আন্তর্জাতিক আইন রাষ্ট্রীয় আইনের উপর প্রাধান্য পাবে।

ফিটসমরিস-এর মতে, আন্তর্জাতিক আইন ও রাষ্ট্রীয় আইনের প্রয়োগ ক্ষেত্র মূলত আলাদা এবং এই দুই আইন স্ব স্ব ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ।

অধ্যাপক ওপেনহেইমের মতে, দু'আইনেরই যৌক্তিকতা মানব সমাজের রক্ষার্থে ও কল্যাণার্থে, সুতরাং সমগ্র মানব সভ্যতার বিবেচনায় আন্তর্জাতিক আইন রাষ্ট্রীয় আইনের উপর প্রাধান্য পাবে।

আন্তর্জাতিক আইন ও রাষ্ট্রীয় আইনের প্রাধান্য সংকট

দ্বৈতবাদী আইনবিদগণ বিশ্বাস করেন রাষ্ট্রীয় আইনের প্রাধান্য আন্তর্জাতিক আইনের উপর। অন্যদিকে যেহেতু একাত্ববাদীগণ মনে করে আন্তর্জাতিক আইন ও রাষ্ট্রীয় আইন অভিন্ন, তাই তাদের মতে কোনটি অধিক প্রাধান্য পাবে তা নির্ণয় করা কঠিন, তবে এরা সাধারণ আন্তর্জাতিক আইনের প্রাধান্যই মেনে নেয়।

এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক কেলসেন-এর অধীনস্ততার ক্রমের নীতি বা (Hierarchical Doctrine) এর উল্লেখ করা যায়, এ তত্ত্ব অনুযায়ী আইন শাস্ত্রে নিজস্ব ঐক্য বিদ্যমান এবং তা স্বয়ংসম্পূর্ণ। আইনের নিম্নতর বিধি উচ্চতর বিধি হতে বৈধতা লাভ করে। এভাবে কেলসন তাঁর আইনের বিধানের অধীনস্ততার ক্রমের মডেল তৈরি করেছেন। সে হিসেবে সংবিধান হচ্ছে রাষ্ট্রীয় ভূ-খণ্ডে সর্বোচ্চ আইন, যা থেকে পর্যায়ক্রমে ভারার্পিত আইন প্রণয়নের মাধ্যমে দেশের অন্যান্য আইন তার বৈধতা লাভ করে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় সংবিধান কোথা হতে তার বৈধতা লাভ করে? এখানেই আরো উচ্চতর বিধির প্রশ্ন চলে আসে। কেলসনের মতবাদ ব্যাখ্যা করে আমরা বলতে পারি যে, বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সম্মিলিত ও অলিখিত স্বীকৃতি থেকেই রাষ্ট্রীয় সংবিধান তার বৈধতা লাভ করে। এ স্বীকৃতি আন্তর্জাতিক আইনের বিষয়। তাই আইন মেনে চলা সংক্রান্ত মৌলিক বিধি আন্তর্জাতিক আইনেরই অন্তর্গত, যা লিখিত বা অলিখিত দুই-ই হতে পারে। কেলসন অবশ্য তাঁর মৌলিক বিধির অবস্থান নির্ণয়ে শুধু আন্তর্জাতিক আইনের কথাই উল্লেখ করেন নি; তাঁর মতে মৌলিক বিধি রাষ্ট্রীয় ইচ্ছা, সার্বভৌমত্ব বা রাষ্ট্রীয় আইনের মধ্যেও নিহিত থাকতে পারে। তবে কেলসনের মতে যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে সমস্ত আন্তর্জাতিক ও রাষ্ট্রীয় আইনের বিধান একটি মৌলিক বিধির অন্তর্গত যা থেকে তারা বৈধতা লাভ করে। আইনের প্রকৃতি এক ও অভিন্ন, শুধু তার প্রকাশ বহুরূপী। সুতরাং এভাবে বিবেচনা করলে আন্তর্জাতিক আইনের অবস্থান রাষ্ট্রীয় আইনের উর্ধ্বে। বিষয়টি নিম্নোক্ত উদাহরণের মাধ্যমে স্পষ্ট করা যায়–
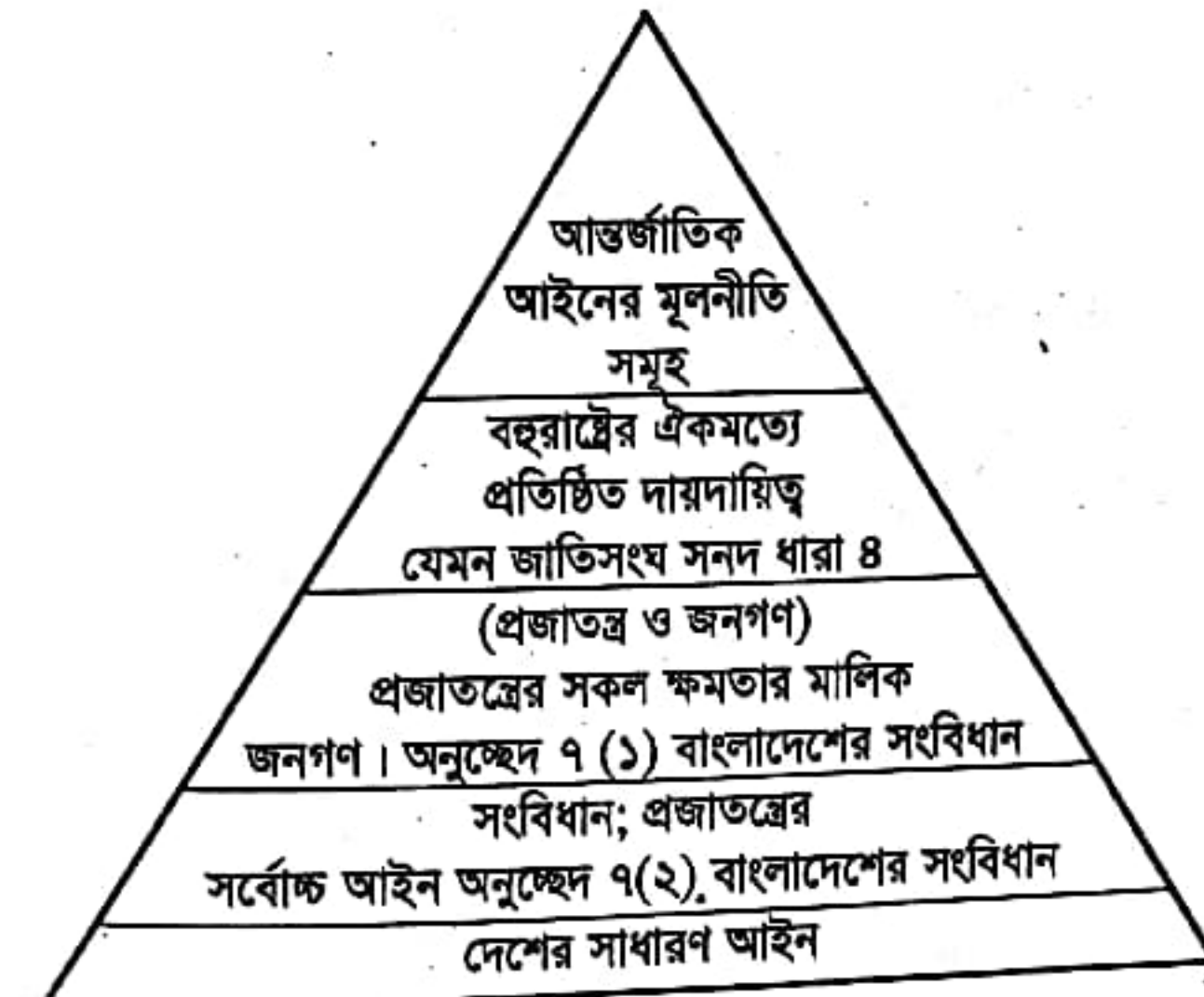
সুতরাং উপরোক্ত চিত্রটি ব্যাখ্যা করতে গেলে বলা যায়, যে কোন দেশের সাধারণ আইনগুলো সংবিধানের অধীন, অর্থাৎ সংবিধান হতে বৈধতা লাভ করে, আবার সংবিধান স্বয়ং এর বৈধতা লাভ করে প্রজাতন্ত্র বা রাষ্ট্রের জনগণের অভিপ্রায় থেকে। এভাবে বহু রাষ্ট্রের অভিপ্রায়ে প্রতিষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক আইন-এর মূলনীতিসমূহ। সে মূলনীতিগুলো আবার সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহ স্বেচ্ছায় মেনে নেয়। সুতরাং এভাবে ব্যাখ্যা করলে আন্তর্জাতিক আইন ও রাষ্ট্রীয় আইন অভিন্ন হলেও আইন যন্ত্রের সর্বোচ্চ বিন্দুতে অবস্থান আন্তর্জাতিক আইনের।

রাষ্ট্রীয় ভূ-খণ্ডে আন্তর্জাতিক আইনের প্রয়োগ

আন্তর্জাতিক আইন রাষ্ট্রীয় ভূ-খণ্ডে কিভাবে কার্যকর হবে সে প্রশ্নে স্বাভাবিক কারণেই একাত্ববাদী ও দ্বৈতবাদীদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। একাত্ববাদীগণ মনে করেন আন্তর্জাতিক আইন রাষ্ট্রীয় আইনের অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়ে সরাসরি রাষ্ট্রীয় ভূ-খণ্ডে প্রয়োগ লাভ করতে পারে। এ জন্য রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কোন বিশেষ আইন প্রণয়নের প্রয়োজন নেই। তাদের মতে আন্তর্জাতিক আইন, আন্তর্জাতিক চুক্তির শর্তাবলী কখন কিভাবে রাষ্ট্রীয় ভূ-খণ্ডে বলবৎ হবে বা রাষ্ট্রীয় আইনে একীভূত হবে তার পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া নির্ধারণের ক্ষমতা রাষ্ট্রীয় সংবিধানকে প্রদান করা হয়েছে (delegation)। এই উদ্দেশে রাষ্ট্র কর্তৃক অনুসৃত পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া যা চুক্তি সম্পাদন কাল হতে আরম্ভ হয়েছে, তারই অব্যাহতকরণ বলে বিবেচিত হবে। এখানে কোন প্রকার রূপান্তর নেই, নতুন আইন সৃষ্টির প্রশ্ন নেই, আছে একই সৃষ্টির ভিন্নরূপ। আন্তর্জাতিক আইন রাষ্ট্রীয় ভূ-খণ্ডে প্রয়োগ করার সাংবিধানিক বিধি আইন সৃষ্টির একক প্রক্রিয়ার অংশ।

দ্বৈতবাদীগণের মতে আন্তর্জাতিক আইন যদি রাষ্ট্রীয় আইনের উপর প্রাধান্যও পেয়ে থাকে তবুও আন্তর্জাতিক আইন তো আর সরাসরি রাষ্ট্রীয় আইনের মত রাষ্ট্রীয় আদালতে প্রয়োগ করা যায় না। আন্তর্জাতিক আইন রাষ্ট্রীয় আদালতে প্রয়োগ করতে হলে কিছু পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। দ্বৈতবাদীদের মতে আন্তর্জাতিক আইন রাষ্ট্রীয় ভূ-খণ্ডে প্রয়োগ করতে হলে হয় একে রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারা সুনির্দিষ্টভাবে গৃহীত হতে হবে, নয় রূপান্তরিত হতে হবে।

আইন প্রণয়ন (Specific adoption)

আন্তর্জাতিক আইন কার্যকর করতে হলে তার জন্য রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে অবশ্যই প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করতে হবে। তাঁদের মতে আন্তর্জাতিক আইনের বিধান রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারা সুনির্দিষ্টভাবে গৃহীত হতে হবে। যেহেতু আন্তর্জাতিক আইন ও রাষ্ট্রীয় আইন দু'টি সম্পূর্ণ আলাদা ব্যবস্থা, সেহেতু আন্তর্জাতিক আইনকে রাষ্ট্রীয় আইনের এলাকায় কার্যকর করতে হলে অবশ্যই রাষ্ট্রীয় সাংবিধানিক যন্ত্র ব্যবহার করতে হবে।

রূপান্তরকরণ (Transformation)

আন্তর্জাতিক চুক্তির ক্ষেত্রে দ্বৈতবাদীরা মনে করেন, চুক্তির শর্তাবলীকে অবশ্যই রাষ্ট্রীয়

আইনের বিধানে রূপান্তরিত করতে হবে। এই প্রকার রূপান্তরকরণ নিছক কোন পদ্ধতিগত বা আনুষ্ঠানিক বিষয় নয়, বরং একটি মৌলিক শর্ত।

এখন আন্তর্জাতিক আইনকে কোন পদ্ধতির মাধ্যমে যেতে হবে সে বিষয়ে বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন নীতি অথবা বহুক্ষেত্রে মিশ্রনীতি অনুসরণ করে। কোন দেশ কোন পদ্ধতি অনুসরণ করবে সে বিষয়ে কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। বরং প্রচলিত নিয়মগুলো সম্পর্কে আমরা ধারণা পেতে পারি বিভিন্ন দেশের অনুসৃত নীতির দিকে বা রাষ্ট্রীয় আচরণের দিকে তাকালে।

যুক্তরাজ্যে আন্তর্জাতিক আইনের প্রয়োগ

ক. **প্রথাভিত্তিক আইনের প্রয়োগ :** প্রথাভিত্তিক আইনের ক্ষেত্রে যুক্তরাজ্যের নীতি অনেকটা একাত্ববাদী মতবাদের কাছাকাছি, অর্থাৎ সার্বজনীন প্রথা আইন সরাসরি যুক্তরাজ্যে প্রযোজ্য। সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত আন্তর্জাতিক প্রথা আইনের বিধানসমূহ যুক্তরাজ্যে দীর্ঘকাল হতেই দেশীয় আইনের অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। তবে এ ব্যাপারে দুটো শর্ত থাকে।

প্রথমত: নির্দিষ্ট আন্তর্জাতিক প্রথা আইনটি পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রণীত আইনের পরিপন্থী হতে পারবে না, পার্লামেন্টে সে আইনটি প্রথা আইনের আগে বা পরে যখনই প্রণীত হোক না কেন।

দ্বিতীয়ত: উচ্চতর আদালত কর্তৃক কোন প্রথা আইনের মর্যাদা ও পরিধি নির্ধারিত হওয়ার পর তদ্দ্বারা সব ব্রিটিশ আদালত বাধ্য থাকবে, এমনকি যদি সে বিষয়ে পরে ভিন্নতর প্রথা ভিত্তিক আইনও সৃষ্টি হয়।

ব্রিটিশ আদালতসমূহ কর্তৃক সরাসরি আন্তর্জাতিক প্রথা আইনের বিধান প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে উপরোক্ত ব্যতিক্রমদ্বয় ছাড়াও আরো দু'টি গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রম আছে,

এক. কোন ব্রিটিশ আদালত নির্বাহী কর্তৃপক্ষের কোন রাষ্ট্রীয় কর্ম (Acts of State) যেমন–যুদ্ধ ঘোষণা বা অন্য রাষ্ট্রের ভূ-খণ্ড জয় করাকে চ্যালেঞ্জ বা প্রশ্ন করতে পারে না, যদিও এধরনের কর্ম দ্বারা আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘিতও হয়।

দুই. রাজা ও রাণীর কিছু বিশেষ বা পরম ক্ষমতা (Prerogative Powers) ব্যবহার করে কৃত কোন কার্য –

মামলা: The Franconia Case; ফ্রান্‌কোনিয়া মামলা; (R. V. Keyn, 1876)

ফ্রান্‌কোনিয়া নামে একটি জার্মান জাহাজের সাথে যুক্তরাজ্যের স্ট্রাথক্লাইড নামক জাহাজের ইংলিশ চ্যানেলের মধ্যে অর্থাৎ সমুদ্র উপকূলের তিন মাইলের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে। ফ্রান্‌কোনিয়া জাহাজের ক্যাপ্টেন-এর অবহেলার কারণেই মূলত দুর্ঘটনাটি ঘটে। দুর্ঘটনায়

যুক্তরাজ্যের জাহাজটি ডুবে যায় এবং যাত্রীরা প্রাণ হারায়। কেন্দ্রীয় ফৌজদারি আদালতে জার্মান নাবিক মি: কেইনকে নরহত্যার দায়ে অভিযুক্ত করা হয়। যদিও মি:কেইন উক্ত আদালতে দোষী প্রমাণিত হয় তবুও ব্রিটিশ আদালত এ বিষয়ে সন্দিহান ছিল যে আদৌ তাদের মামলাটি আমলে নেবার এখতিয়ার আছে কি না? অতঃপর মামলাটি কোর্ট অব ক্রাউনে মতামতের জন্য প্রেরণ করা হয়। বিচার্য বিষয় ছিল যে, উপকূল হতে তিন মাইলের মধ্য সংঘটিত অপরাধের উপর ব্রিটিশ আদালতের এখতিয়ার আছে কি না? মামলাটির দু'বার শুনানি হয়। প্রথম বার ছয় জন বিচারক সমবিভক্ত হয়ে বিরুদ্ধ মতামত দেন। অতঃপর দ্বিতীয়বার সাত জনের মধ্যে ছয় জন এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে এ ধরনের অপরাধ আমলে নেবার এখতিয়ার ব্রিটিশ আদালতের নেই। সিদ্ধান্তের পশ্চাতে বিচারকগণ যুক্তি উত্থাপন করে যে, বিদেশী জাহাজে অবস্থানরত কোন বিদেশী নাগরিক যদি কোন অপরাধ করে তা উপকূল হতে তিন মাইলের মধ্যেই হোক বা বাইরেই হোক না কেন তার বিচার সংঘঠিত করার এখতিয়ার ব্রিটিশ আদালতকে প্রদান করে এমন কোন বিধিবদ্ধ আইন যুক্তরাজ্যে নেই। এবং প্রকাশ্য এরূপ কোন বিধিবদ্ধ আইন না থাকলে ব্রিটিশ আদালত আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত প্রথাকেই দেশের আইন বলে মেনে নিতে বাধ্য। আন্তর্জাতিক প্রথা অনুসারে কেবল পতাকাবাহী রাষ্ট্রই এ ধরনের অপরাধ আমলে আনতে পারে। অতএব ব্রিটিশ আদালত উক্ত অপরাধ আমলে নেবার এখতিয়ারসম্পন্ন নয়।

উক্ত মোকদ্দমায় মূলত প্রথাগত আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি যুক্তরাজ্যের আদালতের প্রদত্ত গুরুত্ব ও সম্মানেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

খ. **চুক্তি আইনের প্রয়োগ :** আন্তর্জাতিক চুক্তি আইনের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ প্র্যাকটিস ভিন্নতর। যুক্তরাজ্য কর্তৃক স্বাক্ষরকৃত আন্তর্জাতিক চুক্তির বিধান সরাসরি দেশীয় আইনের অংশ হিসেবে বিবেচিত নয় এবং যুক্তরাজ্যের আদালত তা প্রয়োগ করতে বাধ্য নয়। বৃটিশ ভূ-খণ্ডে চুক্তির বিধান প্রয়োগ করতে হলে পার্লামেন্টে-এর উপর আইন পাস করতে হবে। উপরোক্ত আলোচনার আলোকে এটা স্পষ্ট যে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিভিন্ন চুক্তিসমূহকে অভ্যন্তরীণ কার্যকারিতা অর্জন করতে হলে কোন না কোনভাবে পার্লামেন্ট-এর অনুমোদন লাভ করতে হবে। আন্তর্জাতিক আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে যুক্তরাজ্যের আদালত সাধারণভাবে দু'টো নীতি অনুসরণ করে।

১. **আইন ব্যাখ্যার নীতি:** (Rule of construction) আইনের ক্ষেত্রে যখন কোন অস্পষ্টতা দেখা দেবে তখন রাষ্ট্রীয় আইন কিংবা আইন সভার কার্যাবলীকে এমনভাবে ব্যাখ্যার চেষ্টা করা হয় যেন আইনের ব্যাখ্যা আন্তর্জাতিক আইনের বিরুদ্ধ না হয়।

২. **সাক্ষ্য সম্পর্কিত নীতি :** (Rule of evidence) বিদেশী আইনের অস্তিত্ব যুক্তরাজ্যের আদালতে প্রমাণ করতে হয় কিন্তু আন্তর্জাতিক আইনের ক্ষেত্রে এ বাধ্যকতা প্রযোজ্য নয়। আন্তর্জাতিক আইনের অস্তিত্ব সম্পর্কে যুক্তরাজ্যের আদালত অবগত বলে পূর্বানুমান করে নেয়া হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের আদালতে আন্তর্জাতিক আইন

প্রথাভিত্তিক আইনের প্রয়োগ : প্রথাভিত্তিক আইনের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের অনুসৃত পদ্ধতি যুক্তরাজ্যের অনুরূপ অর্থাৎ যুক্তরাজ্যের মত যুক্তরাষ্ট্রেও আন্তর্জাতিক প্রথাভিত্তিক আইন রাষ্ট্রীয় আইনের অংশ হিসেবে বিবেচিত।

মামলা : Charming Betsy ; চার্মিং বেটসি; (Murry Vs. Schooner, U.S.S.C. 1804)

মামলায় প্রধান বিচারপতি মার্শাল অভিমত ব্যক্ত করেন যে, 'মার্কিন কংগ্রেসের কার্যাবলীকে আন্তর্জাতিক প্রথা আইনের সাথে বিরোধপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা উচিৎ হবে না', কারণ আন্তর্জাতিক প্রথাগত আইনগুলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় আইনের মতই মর্যাদা লাভ করে।

অবশ্য যদি প্রথা ভিত্তিক আন্তর্জাতিক আইন থাকা সত্ত্বেও পরবর্তীতে তার বিপরীত স্পষ্ট বিধিবদ্ধ আইন প্রণীত হয় তবে বিধিবদ্ধ আইনটিকেই বিবেচনায় আনা হবে। অর্থাৎ কংগ্রেসের আইন যথেষ্ট স্পষ্ট হলে এবং তা সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক আইনের বিধানের পর প্রণীত হয়ে থাকলে সে আইন অবশ্যই আন্তর্জাতিক আইনের উপরে স্থান পাবে।

চুক্তি আইনের প্রয়োগ (Treaties)

আন্তর্জাতিক চুক্তির ক্ষেত্রে যুক্তরাজ্যে প্রচলিত নিয়মের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের অনেকখানি পার্থক্য আছে। যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের অনুচ্ছেদ VI (২) মতে– বৈধভাবে সম্পাদিত সকল আন্তর্জাতিক চুক্তি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইনের মর্যাদা পাবে। অর্থাৎ যুক্তরাজ্যে চুক্তি আইন কেবল দেশের আইন হিসেবে মর্যাদা পায়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে চুক্তি আইন দেশের সর্বোচ্চ আইন হিসেবে বিবেচিত হয় অর্থাৎ সাংবিধানিক আইনের মর্যাদা ভোগ করে।

তবে যুক্তরাষ্ট্রের আদালতসমূহের বিবেচনানুসারে আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ দু'ধরনের শ্রেণীতে গণ্য হতে পারে এবং শ্রেণী ভেদে এদের প্রয়োগবিধি নির্ধারিত হয়।

প্রথমত: স্বয়ং বলবৎযোগ্য চুক্তি

যুক্তরাষ্ট্রের আদালতসমূহের মতানুসারে স্বয়ং বলবৎযোগ্য চুক্তিসমূহ বিশেষ আইন প্রণয়ন ছাড়াই রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে সরাসরি প্রয়োগ করা যাবে। স্বয়ং বলবৎযোগ্য চুক্তিসমূহ সরাসরি যুক্তরাষ্ট্রের আইনের অংশ হিসেবে বিবেচিত।

দ্বিতীয়ত: স্বয়ং বলবৎযোগ্য নয় যে চুক্তি

এমন চুক্তিসমূহ প্রয়োগ করার জন্য বিশেষভাবে রাষ্ট্রীয় আইন প্রণীত না হলে আদালতে তা বলবৎ করা যায় না। অর্থাৎ এ চুক্তিসমূহ আদালতের মাধ্যমে বলবৎ করার জন্য রাষ্ট্রকর্তৃক

বিশেষভাবে আইন প্রণয়ন করতে হয়। অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণভাবে স্বীকৃত আন্তর্জাতিক প্রথা আইন ও স্বয়ং বলবৎযোগ্য চুক্তিসমূহ অতীতে প্রণীত মার্কিন আইনের পরিপন্থী হলেও তা বৈধ হিসেবে বিবেচিত হবে, তবে শর্ত থাকে যে এসব আইন বা চুক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের পরিপন্থী হবে না।

বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক প্রথা আইন ও চুক্তিসমূহ

প্রথা আইন রাষ্ট্রীয় সীমানায় প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্রিটিশ প্র্যাকটিস অনুসরণ করে। সংসদের আইনের পরিপন্থী না হলে বাংলাদেশের আদালত সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত আন্তর্জাতিক প্রথা আইন দেশীয় আইনের অংশ হিসেবে বিবেচনা করবে এবং সেভাবে তা প্রয়োগ করবে। এ বিষয়ে বাংলাদেশে সংবিধানের ২৫ অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে; ২৫ (১) এ বলা আছে 'জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও সমতার প্রতি শ্রদ্ধা, অন্যান্য রাষ্ট্রীয় অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান এবং আন্তর্জাতিক আইনের ও জাতিসংঘ সনদে বর্ণিত নীতিসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা–এই সকল নীতি হইবে রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি...'

তবে আন্তর্জাতিক চুক্তির শর্তাবলী প্রয়োগ করার জন্য অভ্যন্তরীণ আইন প্রণয়ন প্রয়োজন হতে পারে। চুক্তি আইন কার্যকর করার বিষয়ে বাংলাদেশে সংবিধানের ১৪৫ (ক) অনুচ্ছেদে বলা আছে 'বিদেশের সহিত সম্পাদিত সকল চুক্তি রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হইবে এবং রাষ্ট্রপতি তাহা সংসদে পেশ করিবার ব্যবস্থা করিবেন : তবে শর্ত থাকে যে, জাতীয় নিরাপত্তার সহিত সংশ্লিষ্ট অনুরূপ কোন চুক্তি কেবলমাত্র সংসদের গোপন বৈঠকে পেশ করা হইবে।' তবে এরূপ পেশের উদ্দেশ্য কি তা আইনে বলা হয় নি। তবে বাংলাদেশের প্রাকটিস্ অনুসারে রাষ্ট্রীয় আদালত কর্তৃক প্রয়োগ করতে হলে আন্তর্জাতিক চুক্তির অনুমোদন (Ratification) আবশ্যক। অর্থাৎ অনুমোদনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক আইন বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় আইনে রূপান্তরিত হয়।

বাংলাদেশের সংবিধানে আন্তর্জাতিক দায়-দায়িত্বের সাথে রাষ্ট্রীয় আইনের সমন্বয় সাধনের বিধান থাকলেও বাস্তবত এ বিধানের সুষ্ঠু প্রয়োগ তেমন একটা লক্ষ্য করা যায় না।

আন্তর্জাতিক আইনের বিষয়বস্তু

Subjects of International Law

আইনানুযায়ী যাদের কিছু অধিকার রয়েছে এবং যাদের উপর দায়িত্ব বর্তায় এবং এই দায়িত্ব পালনের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, তারাই হচ্ছে আইনের Subject বা বিষয়বস্তু। কেবল দায়িত্ব অর্পিত হলেই সেটা Subject হবে না, সেটা Object হিসেবে গণ্য হবে। যেমন- Property বা সম্পত্তি, আইনের সাবজেক্ট নয়, অবজেক্ট।

আন্তর্জাতিক আইনানুসারে যারা কিছু কিছু অধিকার ভোগ করার ক্ষমতা সম্পন্ন হয় এবং আইন যাদের উপর কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য আরোপ করে তারাই আন্তর্জাতিক আইনের বিষয় বা Subject। অর্থাৎ যে কোন স্বত্ব যা কোন শক্তির অধীন নয়, এর কিছু অধিকার রয়েছে এবং আন্তর্জাতিক দায়িত্ব পালনে সক্ষম তাই আন্তর্জাতিক আইনের বিষয়।

সাধারণ রাষ্ট্র সম্পর্কে চিন্তা করলে রাষ্ট্রই আন্তর্জাতিক আইনের প্রাথমিক উৎস। রাষ্ট্রই সার্বভৌমত্বের প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করে এবং ইহা আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদন করতে পারে। চুক্তির সাথে সাথে ইহা রাষ্ট্রের অধিকার ও কর্তব্যের রূপরেখা প্রণয়ন করতে পারে।

আন্তর্জাতিক আদালত সংবিধির (Statute of the International Court of Justice) ৩৪ (১) নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে– কেবলমাত্র রাষ্ট্রই আন্তর্জাতিক আদালতের কোন মামলার পক্ষ হতে পারে। অর্থাৎ শুধুমাত্র রাষ্ট্রই আন্তর্জাতিক আইনের প্রাথমিক, মৌলিক এবং একমাত্র বিষয়।

আবার আন্তর্জাতিক আদালত সংবিধির ৬৫ (১) নং অনুচ্ছেদ অনুসারে কোন কোন আন্তর্জাতিক সরকারি সংস্থার অনুরোধে আন্তর্জাতিক আদালত উপদেশমূলক মতামত দিতে পারে। অর্থাৎ ৬৫ অনুচ্ছেদ অনুসারে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহকেও আন্তর্জাতিক আইনের বিষয় হিসেবে গণ্য করা হয় যা ৩৪ অনুচ্ছেদের ক্ষমতাকে বর্ধিত করে।

যদিও রাষ্ট্রই হচ্ছে আন্তর্জাতিক আইনের প্রাথমিক বিষয়বস্তু তবুও ব্যক্তিকেও ক্ষেত্র বিশেষে আন্তর্জাতিক আইনের বিষয় হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। আন্তর্জাতিক আইনের বিষয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে আইনবিদদের মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে। তাদের মধ্যে একদল মনে করে (i) শুধু রাষ্ট্রই হবে আন্তর্জাতিক আইনের বিষয়, অন্য দল মনে করে (ii) শুধু ব্যক্তিই হবে আন্তর্জাতিক আইনের বিষয়।

যারা কেবলমাত্র রাষ্ট্রকে আন্তর্জাতিক আইনের বিষয়বস্তু মনে করেন তারা আন্তর্জাতিক আদালত সংবিধির (International Court of Justice) ৩৪ ও ৬৫ নং অনুচ্ছেদ তুলে ধরেন। তাদের মতে রাষ্ট্র ব্যতীত অন্য কোন সত্তা (entity) আন্তর্জাতিক আইনের বিষয় হতে পারে না।

একমাত্র রাষ্ট্রই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। রাষ্ট্র তার সার্বভৌমত্বের মধ্যে ব্যাপক অধিকার ভোগ করে। এই অধিকার আর কোন সংস্থার পক্ষে ভোগ করা সম্ভব নয়। এই জন্য এই মতবাদের অনুসারীরা রাষ্ট্রকেই আন্তর্জাতিক আইনের একমাত্র বিষয়বস্তু বলে আখ্যায়িত করতে আগ্রহী। তাদের এই মতামতের পিছনে কারণগুলো নিম্নরূপ :

১. সার্বভৌম রাষ্ট্রই হচ্ছে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের মূল চরিত্র এবং এর ফলে রাষ্ট্রই হচ্ছে আন্তর্জাতিক আইনের মূল বিষয়;

২. আন্তর্জাতিক আইনের প্রধান উৎস হচ্ছে আন্তর্জাতিক চুক্তি। আর চুক্তিগুলো সম্পাদন করে রাষ্ট্র। তাই রাষ্ট্রই আন্তর্জাতিক আইনের প্রধান বিষয়;

৩. আন্তর্জাতিক আদালতের সংবিধি অনুসারে একমাত্র রাষ্ট্রই কারো বিরুদ্ধে মামলা করতে পারে বা কেউ তার বিরুদ্ধে মামলা করতে পারে;

৪. আন্তর্জাতিক আইন দ্বারা সৃষ্ট অধিকার ও বিশেষ সুবিধা রাষ্ট্রই বহন, ভোগ ও রক্ষণ করে।

দ্বিতীয় গোষ্ঠী বা দল বিশ্বাস করে যে শুধু রাষ্ট্র নয় ব্যক্তিগণও আন্তর্জাতিক আইনের বিষয় হতে পারে।

কেলসনের মতে, সকল আইনের ন্যায় আন্তর্জাতিক আইনের বিধান দ্বারাও মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। শুধুমাত্র ব্যক্তিই হতে পারে আন্তর্জাতিক আইনের বিষয়বস্তু। তার মতে রাষ্ট্র হচ্ছে একটি বিমূর্ত ধারণা। ব্যক্তি ছাড়া রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নেই। ব্যক্তির সমষ্টিই হচ্ছে রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের অধিকার ও দায়িত্ববোধ বলতে সে রাষ্ট্রের নাগরিকদের ব্যক্তিগত অধিকার ও দায়িত্ববোধ বুঝায়। রাষ্ট্রের নিজস্ব কোন অধিকার ও দায়িত্ব নেই। তাই ব্যক্তিকেই শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক আইনের বিষয় হিসেবে গণ্য করা উচিত।

আইনবিদ কেলসন ছাড়াও অধ্যাপক ওপেনহেইম আন্তর্জাতিক আইনের বিষয়বস্তু হিসেবে ব্যক্তিকে গুরুত্বের সাথে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁরা উভয়েই ব্যক্তিকে আন্তর্জাতিক আইনের বিষয়বস্তু হিসেবে গুরুত্বারোপ করেছেন। ব্যক্তিকে আন্তর্জাতিক আইনের বিষয়বস্তু করার পিছনে যুক্তিগুলো নিম্নরূপ :

১. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য নুরেমবার্গ ট্রাইবুনাল প্রতিষ্ঠিত হয়। নুরেমবার্গ ট্রাইবুনালে বলা হয়– 'অপরাধ সংঘটন করে কোন বিমূর্ত সত্তা নয়, ব্যক্তিগণ এবং শুধুমাত্র সেসব ব্যক্তিবর্গের শাস্তিবিধানের মাধ্যমেই আন্তর্জাতিক আইনের বিধানাবলীর বাস্তবায়ন সম্ভব।' মিত্রশক্তি এই সংবিধিতে স্বাক্ষর করে। এই অঙ্গীকার অনুযায়ী জার্মান নাৎসী বাহিনীর বিচার করা হয়। এ বিচারে সমগ্র জার্মানবাসীকে শাস্তি দেয়া হয় নি। শাস্তি দেয়া হয়েছিল কতিপয় নাৎসীদের। অর্থাৎ এখানে ব্যক্তিকে আন্তর্জাতিক আইনে অপরাধী বলে নির্ধারণ করা হয় এবং শাস্তি দেয়া হয়। তাই ব্যক্তিই আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনের একমাত্র ও মৌলিক বিষয়।

২. মানবাধিকার সংক্রান্ত যে সকল চুক্তি হয়েছে তাতেও আইনবিদরা মনে করেন ব্যক্তিকে আন্তর্জাতিক আইনের বিষয়বস্তু করা দরকার।

১৯৪৮ সালের সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণায় সর্বপ্রথম ব্যক্তি অধিকার বিকাশের জন্য কতিপয় মৌলিক অধিকার ঘোষণা করা হয়। ১৯৬৫ সালে দু'টি মানবাধিকার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়–

i. Covenant on Economic Social and Cultural Rights এবং

ii. Covenant on Civil and Political Rights.

মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাকে, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বিলের প্রথম পদক্ষেপ ধরা হলে মানবাধিকার সম্পর্কিত এই আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলোকে দ্বিতীয় পদক্ষেপ বলা যায়। নিঃসন্দেহে এই চুক্তিগুলো মানবিক ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি। কারণ এই চুক্তিগুলো আইনত বাধ্যতামূলক। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এ সার্বজনীন ঘোষণার ফলে ব্যক্তির জন্য আন্তর্জাতিক আইন সজাগ হয়ে উঠে।

৩. ১৯৬৫ সালে International Convention for Settlement of Investment Disputes (ICSID) অনুষ্ঠিত হয়। বিনিয়োগ সংক্রান্ত এ চুক্তির ক্ষমতা বলে International Centre for the Settlement of Investment Disputes কেন্দ্র স্থাপিত হয়। এই কনভেনশন অনুসারে বৈদেশিক বিনিয়োগ সংক্রান্ত কোন বিরোধের উৎপত্তি হলে বিরোধের যে কোন পক্ষ ICSID-এ মামলা করতে পারবে। এটি ব্যক্তির মূল্যায়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেমন– কোন বৈদেশিক আইনগত বা স্বাভাবিক ব্যক্তির সাথে যদি বাংলাদেশের কোন চুক্তি হয় এবং তা নিয়ে দ্বন্দ্ব বা সমস্যার সৃষ্টি হলে বাংলাদেশ শরণাপন্ন হবে International Centre for Settlement of Investment Dispute-এ। এতে করে অনেকে বলেন যে, রাষ্ট্রকে ব্যক্তির সমপর্যায়ে বিবেচনা করা হয়েছে এবং তাই বর্তমানে ব্যক্তিকেও আন্তর্জাতিক আইনের বিষয়ে মর্যাদা দেয়া আবশ্যক।

৪. পূর্বে শুধুমাত্র যুদ্ধাপরাধীদের ক্ষেত্রেই ব্যক্তি বিশেষকে শাস্তি দিবার বিধান ছিল। বর্তমানে আন্তর্জাতিক আইনের ক্রমবিকাশ ঘটছে এবং এ সম্পর্কে বিভিন্ন চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। যেমন–

(i) ১৯৪৫ সালে Convention on Genocide এ বলা হয় যারা গণহত্যার মত জঘন্য অপরাধ করে তারা আন্তর্জাতিক মানবতার চোখে অপরাধী এবং আইনে শাস্তি পাবে।

(ii) ১৯৭১ সালে Convention on Suppression of Unlawful Acts Against Civilian Aircrafts নামে একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তি অনুযায়ী 'ছিনতাই' করা আন্তর্জাতিক আইনে অপরাধ হিসেবে ধরা হয়। যদি কোন ব্যক্তি এরূপ অন্যায় করে তাহলে তাকে

আন্তর্জাতিক আইনে শাস্তি প্রদান করা যাবে। অর্থাৎ এসব চুক্তি অনুযায়ী যদি কোন ব্যক্তি আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করে তাহলে সেই ব্যক্তির দেশটিকে নয় বরং ব্যক্তিটিকে চিহ্নিত করে তার বিচার করা হয়। যেমন Lockerbie/ লকারবি মামলায় (পরে দ্রষ্টব্য) শুধু দেশটিকে নয় বরং ব্যক্তি বিশেষকে চিহ্নিত করে তাদেরকে শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এভাবে আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গকারী ব্যক্তিদেরকে চিহ্নিত করে তাদের শাস্তি দেবার বিধান হচ্ছে এবং এই উদ্দেশ্যে International Criminal Court স্থাপিত হয়েছে যারা ব্যক্তির বিচার করবে। অর্থাৎ এখন আন্তর্জাতিক আইন ব্যক্তির প্রতি বেশি মনোযোগী হচ্ছে।

সার্বিক আলোচনায় দেখা যাচ্ছে যেক্ষেত্রে পূর্ব সার্বভৌমত্বের ক্ষমতা পাওয়া যায় তাই মৌলিক বিষয় এবং অন্যগুলো মাধ্যমিক বিষয়। এভাবে আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনের বিষয় হলো –

প্রাথমিক – ১. রাষ্ট্র
২. স্বাধীনতা ও আত্মনির্ভরতার জন্য সংগ্রামরত জনগণ; এবং

মাধ্যমিক – ১. ব্যক্তি (আইনগত ব্যক্তিসহ)
২. আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সংস্থা।

অর্থাৎ রাষ্ট্রই হলো আন্তর্জাতিক আইনের মূল বিষয় এবং ব্যক্তি হলো উদ্দেশ্য। তাই এই বিতর্ক বর্তমান ধারায় চলছে। কিছু আইনবিদ বলেন, রাষ্ট্র হলো আন্তর্জাতিক আইনের বিষয় এবং ব্যক্তি হলো এর উদ্দেশ্য। কেননা রাষ্ট্র ব্যক্তি অধিকার ও কর্তব্য নিয়ন্ত্রণ করে এবং তাদের মতে রাষ্ট্রই আন্তর্জাতিক আইনের বিষয় হওয়া উচিত।

আন্তর্জাতিক আইনের বিষয়বস্তুকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়।

১. **সার্বভৌম বিষয়বস্তুর ব্যক্তিসত্তা (Sovereign Subjects of International Law) :** সার্বভৌম রাষ্ট্র ও এমন জাতি বা রাষ্ট্র বা জনগণ যারা জাতীয় স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামরত তাদের সার্বভৌমত্ব।

২. **অ-সার্বভৌম বিষয়বস্তুর ব্যক্তিসত্তা (Non Sovereign Subjects of International Law) :** আন্তর্জাতিক সরকারি সংস্থাসমূহ। তাদের রক্ষায় আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রয়োজন। সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলো এদের সৃষ্টি করে এবং স্বীকৃতির মাধ্যমে এদের মর্যাদা নিশ্চিত করে।

ব্যক্তিসত্তা হিসেবে রাষ্ট্র : রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আইনের প্রাথমিক বিষয়বস্তু। রাষ্ট্রের একক কোন সংজ্ঞা নেই। তাই আন্তর্জাতিক আইন কখনো রাষ্ট্রকে সংজ্ঞায়িত করার প্রয়াস চালায় নি।

কিন্তু ১৯৩৩ সালের Montevideo Convention এর Article-1- এ রাষ্ট্রের কিছু

অধিকার ও দায়িত্ব সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় উপাদান উল্লেখ করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক আইনে ব্যক্তি হিসেবে রাষ্ট্রের নিম্নলিখিত উপাদানসমূহ থাকতে হবে –

১. একটি স্থায়ী জনসমষ্টি;
২. একটি নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ড;
৩. একটি সরকার
৪. অন্য রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষমতা

অনেক আইনবিদ এর মতে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি হচ্ছে রাষ্ট্রের অন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

স্থায়ী জনগোষ্ঠী

প্রত্যেক রাষ্ট্রের জন্য যৌক্তিক সংখ্যার জনগোষ্ঠী প্রয়োজন যারা ঐ দেশের প্রতি পূর্ণ অনুগত থাকবে। এখানে কখনো ভাসমান জনসংখ্যা থাকতে পারবে না। অভিবাসী থাকতে পারবে তবে তাদের এ দেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে হবে। জনসংখ্যা যা ছাড়া একটা রাষ্ট্র হয় না, তা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। তবে ইহা রাষ্ট্র এবং জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিশেষ এবং স্থায়ী সম্পর্কের নির্দেশ করে। যেমন– ইসরাইলের স্থায়ী জনসংখ্যা যেকোন জীবিত ইহুদীকে বুঝায় সে পৃথিবীর যেখানেই বাস করুক না কেন।

নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ড

প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ড থাকা বাঞ্জনীয়। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কর্তৃক গ্রহণযোগ্য ভূ-খণ্ড বা সীমানা হলো নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ড। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কর্তৃক স্বীকৃতি অবশ্যই দরকার। কারণ এই স্বীকৃতি ছাড়া বিভিন্ন রাষ্ট্রের সীমানা নিয়ে নানা রকম বিরোধ দেখা দিতে পারে।

সরকার

রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ হচ্ছে সরকার, যা সর্বময় ক্ষমতা পরিচালনা করে থাকে এবং রাষ্ট্রের উপর কার্যকরী ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে। সরকার এর যে অপরিহার্য উপাদান তা পূরণকল্পে একটি সরকারকে অবশ্যই কার্যকরী বা effective সরকার হতে হবে। অর্থাৎ সরকারের কার্যকারিতা রয়েছে কিনা সেটাই মূল বিষয়।

মামলা : Tinoco Arbitration Case; টিনোকো সালিশ মামলা; (UK Vs. Costa Rica,1923)

১৯১৭ সালের জানুয়ারি মাসে ফ্রেডেরিকো টিনোকো (Frederico Tinoco) কোষ্টারিকার আলফ্রেড গঞ্জালেজকে (Alfredo Gonzalez) বল প্রয়োগের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত করে। নিজে সরকারের দায়িত্বভার নিয়েই নতুন সংবিধান তৈরি করে নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। নির্বাচনে বিজয়ী হবার পর Tinoco দুই বছর শাসন ক্ষমতা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন। ১৯১৯ সালে Tinoco ক্ষমতাচ্যুত হন। নতুন সরকার রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে।

এদিকে Tinoco সরকার ক্ষমতাচ্যুত হবার পূর্বে ইংল্যান্ডের কিছু নাগরিকের সাথে চুক্তি করে। নতুন সরকার ঘোষণা করে যে Tinoco'র সম্পাদিত চুক্তি পালনে সে বাধ্য নয়। কারণ Tinoco সরকার ছিল অবৈধ। ইংল্যান্ড তার নাগরিকদের স্বার্থ রক্ষার্থে আন্তর্জাতিক সালিশ আদালতে মামলা দায়ের করে।

নিষ্পত্তির জন্য শালিসী আহ্বান করা হলে মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি Taft বলেন, সরকার গণতান্ত্রিক বা সংবিধান সম্মতভাবে ক্ষমতায় এসেছে কিনা তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তার কার্যকারিতা রয়েছে কিনা সেটা দেখা। যদি তা থেকে থাকে তবে এই সরকার কর্তৃক সম্পাদিত কার্য পরের সরকারের উপরও বর্তায়। এখানে কার্যকারিতাই মূখ্যভাবে বিচার্য। Tinoco সরকার অসাংবিধানিক হলেও কার্যকর সরকার ছিল। কাজেই Tinoco সরকার কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তি পালন করতে পরবর্তী সরকার বাধ্য থাকবে।

সার্বভৌমত্ব

কোন রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব থাকলেই তারা চুক্তি করতে পারে, অধিকার সৃষ্টি হয় এবং আন্তর্জাতিক দায় বহন করতে সক্ষম হয়। এরূপ রাষ্ট্রের উপর অন্য কোন রাষ্ট্র কোন ব্যাপারেই কোন ধরনের কর্তৃত্ব করতে পারে না। আন্তর্জাতিক আইনের বিষয় হিসেবে ইহা নিরাপত্তা ভোগ করবে। কেননা রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আইনের সার্বভৌম আত্মাস্বরূপ। আন্তর্জাতিক আইনে মামলা শুরু করার পূর্বে উভয় রাষ্ট্রের সম্মতি আবশ্যক। ইহা Par Un Parem non-habet imperium বা equal over equals don't have any authority. এই নীতির মাধ্যমে প্রত্যেক রাষ্ট্রকে সমান হিসেবে দেখানো হয়েছে।

মামলা : **Russia Ship Case; রাশিয়া জাহাজ মামলা; (USSR Vs. USA,US Federal Court, 1948)**

এটি রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন যাত্রীবাহী জাহাজ। জাহাজটিতে যাত্রীদের মধ্যে দু'জন মার্কিন নাগরিক ছিল। জাহাজটি আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে নিউইয়র্ক বন্দরে নোঙর করার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলে খারাপ আবহাওয়ার কারণে ঝড়ো বাতাসে প্রচণ্ড ঝাঁকুনী লাগলে দু'জন মার্কিন মহিলা পড়ে গিয়ে আঘাতপ্রাপ্ত হন। জাহাজটি নিউইয়র্ক বন্দরে পৌছলে তখন আমেরিকান মহিলা দু'জন ফেডারেল কোর্ট-এ ক্ষতিপূরণের মামলা করেন এবং জাহাজটিকে গ্রেফতার করতে আবেদন করে যাতে বিচার সমাপ্ত হবার পূর্বে জাহাজটি বন্দর ত্যাগ করতে না পারে।

এমতাবস্থায় নিউইয়র্কস্থ সোভিয়েত কনস্যুলেট মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের সাথে যোগাযোগ করে জানায় যে 'রাশিয়া জাহাজটি' রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বিধায় রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি এবং জাহাজটি আটক করা আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী।

আমেরিকান ফেডারেল কোর্ট বলল, জাহাজটি যেহেতু সোভিয়েত সম্পত্তি এবং ইহা তার সার্বভৌম ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত, তাই জাহাজটিকে আটক করার কর্তৃত্ব আমেরিকার নেই এবং আদালত তৎক্ষণাৎ জাহাজটিকে মুক্ত করে।

রাষ্ট্রীয় ভূ-খণ্ড
State Territory

রাষ্ট্র-ধারণার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে আন্তর্জাতিক আইন। রাষ্ট্র-ধারণা আবার অন্যদিকে সার্বভৌমত্বের ধারণারও ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। কিন্তু সার্বভৌমত্ব, রাষ্ট্রীয় অধিকার, কর্তব্য ইত্যাদি সকল ধারণাই ভূ-খণ্ড নামক 'বাস্তবতা'র উপর ভিত্তি করে টিকে থাকে। মন্টিভিডিও কনভেনশন ১৯৩৩-এর অনুচ্ছেদ ১ অনুসারে ভূ-খণ্ড ব্যতীত কোন আইনগত সত্তাই রাষ্ট্র নয়। [Article-1 of the Motevideo Convention 1933. A defined territory is one of the most important components of a state to be the subject of International law]

'সম্ভবত ভূ-খণ্ডের ধারণা আন্তর্জাতিক আইনের একটি মৌলিক ধারণা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত।' প্রফেসর কেলসেন এর মতে "The territory of the state is a space within which acts of the state and specially its coercive acts are allowed by general International law" অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ভূ-খণ্ড বলতে সেই আঞ্চলিক সীমানাকে বোঝায় যে অঞ্চলের মধ্যে রাষ্ট্রের কার্যক্রম বিশেষত: শাসন কার্যক্রম আন্তর্জাতিক আইনানুসারে অনুমোদিত।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে চার ধরনের ভূ-খণ্ডের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়–

ক. রাষ্ট্রীয় ভূ-খণ্ড (State territories)

খ. ম্যান্ডেট এবং ট্রাষ্ট ভূ-খণ্ড (Mandate and Trust territories)

গ. রেস নুলিয়াস কিংবা আন্তর্জাতিক ভূ-খণ্ড (Res nullius)

ঘ. রেস কমিউনিস (Res Comunis or territory under mixed regime) যেমন-উন্মুক্ত সমুদ্র ইত্যাদি।

এখানে 'ভূ-খণ্ড' শব্দটি ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। ভূ-খণ্ড কেবল ভূ-পৃষ্ঠ (Terra Ferma) বোঝায়, তা নয় বরং এক কথায় ভূ-খণ্ড বলতে বোঝায়–

ক. রাষ্ট্রীয় সীমানা মধ্যবর্তী স্থলভাগ,

খ. অভ্যন্তরীণ জলভূমি, যেমন- খাল, বিল, নদী, বন্দর, এবং পোতাশ্রয়

গ. রাষ্ট্রীয় জলভাগ ও Maritime belt (সমুদ্র সীমা)

ঘ). রাষ্ট্রীয় ভূ ও জলভাগের উপর স্থিত আকাশ ভাগ (airspace)

ঙ. ভূ-অভ্যন্তর, রাষ্ট্রীয় ভূ ও জলভাগের নিম্ন স্থিত ভূ-ভাগ।

মূলত: ভূ-খণ্ডের উপস্থিতি রাষ্ট্রগঠনের অপরিহার্য উপাদান, এখানেই রাষ্ট্রীয় আইন কার্যকারী হয়। রাষ্ট্রীয় ভূ-খণ্ডের উপর থাকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব। এ অঞ্চলের মধ্যেই রাষ্ট্র পূর্ণ সার্বভৌম ক্ষমতার চর্চা করতে পারে। এই অর্থে আবার বলা যায় রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের ধারণার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে রাষ্ট্রীয় ভূ-খণ্ডের অপরিহার্যতা। ভূ-খণ্ডের সার্বভৌমত্বের ধারণা ব্যক্ত হয়েছে জাতিসংঘ সনদের অনুচ্ছেদ ২ (৪) ও ২ (৭) এ। এ ধারণা আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনে ব্যাপক স্বীকৃত। ভূ-খণ্ডগত রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের দু'টো দিক বর্তমান-

ক. ইম্পেরিয়াম-(Imperium) সুনির্দিষ্টকৃত ভূ-খণ্ডের উপর রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সার্বভৌমত্ব

খ. ডমিনিয়াম- (Dominium) সুনির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে অবস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, ঘটনার উপর রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব।

ভূ-খণ্ডগত সার্বভৌমত্বের আবার ইতিবাচক ও নেতিবাচক দু'টো বৈশিষ্ট্য আছে।

ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য (Positive aspect of territorial Sovereignty) নিজস্ব ভূ-খণ্ডগত ব্যাপারে অলঙ্ঘণীয় সার্বভৌমত্ব ও একক কর্তৃত্বের অধিকার।

নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য (Negative aspect of terrtorial Sovereignty) অন্য রাষ্ট্রের একইরূপ অধিকারগুলো মান্য করার দায়দায়িত্ব। জাতিসংঘ সনদের অনুচ্ছেদ ২ (৪) এ বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটেছে। এতে বলা আছে 'আন্তর্জাতিক সর্ম্পকের ক্ষেত্রে সকল সদস্য আঞ্চলিক অখণ্ডতার বিরুদ্ধে কিংবা অন্য কোন রাষ্ট্রের রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বল প্রয়োগের ভীতি প্রদর্শন থেকে ... নিবৃত্ত থাকবে।'

রাষ্ট্রের ধরন সতত পরিবর্তনশীল। সুনির্দিষ্ট রাষ্ট্রীয় ভূ-খণ্ডও যে সব সময় একই থাকবে এমনও নয়, রাষ্ট্রীয় ভূ-খণ্ডের সংকোচন, সম্প্রসারণ ঘটতে পারে। আন্তর্জাতিক আইনে নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডের উপর কর্তৃত্বের পরিবর্তন, সার্বভৌমত্বের পরিবর্তন ঘটাতে পারে; পরিবর্তন ঘটাতে পারে ভূ-খণ্ডে বসবাসকারী জনগণের জাতীয়তার। আন্তর্জাতিক আইন ভূ-খণ্ড অর্জন কিংবা বিলোপ এর ফলে সার্বভৌমত্বের পরিবর্তন ও এ সম্পর্কিত বিভিন্ন ফলাফল নিয়ে আলোচনা করে। এদের জটিল পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝার জন্য প্রথমত ভূ-খণ্ড অর্জন ও বিলোপের প্রচলিত/ঐতিহ্যক পন্থাগুলো সম্পর্কে একটা ধারণা থাকা দরকার।

রাষ্ট্রীয় সীমানা অর্জনের পদ্ধতি

সাধারণত ঐতিহ্যগতভাবে পাঁচটি ভিন্ন পন্থায় রাষ্ট্রীয় ভূ-খণ্ড অর্জিত হত –

১. দখল (Occupation)
২. বিজিত ভূমি বা সংযোজিত ভূমি (conquest / annexation)
৩. প্রেসক্রিপলন বা দীর্ঘ দখলের ভিত্তিতে সৃষ্ট অধিকার (Prescription)
৪. পরিবৃদ্ধি (Accretion)
৫. সমর্পণ বা বিনিময় (Cession or exchange) এবং

দখল : (Occupation)

রাষ্ট্রীয় ভূ-খণ্ড অর্জনের ক্ষেত্রে দখল একটি মৌলিক পন্থা, দখল পন্থায় রাষ্ট্র অধিকারবিহীন ভূ-খণ্ডে (terra nullius) সার্বভৌমত্ব অর্জন করে, অর্থাৎ যে ভূ-খণ্ডে অন্য কোন রাষ্ট্র সার্বভৌমত্বের দাবিদার নয়, তেমন ভূ-খণ্ড দখলের মাধ্যমে সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করে। এমন ভূ-খণ্ড হতে পারে উন্মুক্ত সমুদ্রে নবগঠিত কোন দ্বীপ, কিংবা এমন ভূমি যা পূর্বে কোন রাষ্ট্রের অধীন ছিল না, কিংবা থাকলেও পূর্ব রাষ্ট্র কর্তৃক সে অধিকার ত্যাগ করা হয়েছে।

বিগত শতাব্দীতে এই পন্থাটি স্বীকৃত ছিল। দখলের মাধ্যমে ভূ-খণ্ড অর্জন ছিল গত শতাব্দীতেও বৈধ। কিন্তু একটি সাধারণ নীতি সব সময়ই ছিল যে দখলকৃত ভূমিটি যেন অন্য কোন রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের অধীন না হয়। অন্য রাষ্ট্রের ভূমি দখল পূর্ব হতেই অবৈধ বলে বিবেচনা করা হত। এ সাধারণ নীতিটি ছাড়াও দখল বৈধ বলে বিবেচিত হবার জন্য আরো কিছু শর্ত পূরণ করতে হত। যেমন-

১. স্বত্ব অর্জনের উদ্দেশ্যে দখল সাধিত হতে হবে

২. উদ্দেশ্যের ঘোষণা কিংবা প্রকাশ দখলাধিকার অর্জনের জন্য অপরিহার্য।

কেবল ভূ-খণ্ড দখল করলেই চলবে না বরং দখল এমন হতে হবে যেন দখলকৃত ভূমিতে দখলকারী রাষ্ট্র পূর্ণ কতৃর্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং দাবিকৃত সার্বভৌমত্বের প্রতিষ্ঠার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সার্মভৌমত্ব প্রদর্শনমূলক কোন না কোন কার্য করতে হবে। কেবল দখলই যে যথেষ্ট নয় এ নীতিটিই ধার্য হয়েছিল আইল্যান্ড অব পালমাস সালিশি মামলায় (১৯২৮)।

মামলা : Island of Palmas Case; আইল্যান্ড অব পালমাস সালিশি মামলা; (Netherlands Vs. U.S., 1928)

প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত পালমাস ফিলিপাইনের উপকূলবর্তী একটি ছোট্ট দ্বীপ। দ্বীপটি সর্বপ্রথম আবিষ্কার করে স্পেন। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে ডেনমার্ক-পালমাস দ্বীপাঞ্চলের রাজকুমারদের সাথে সমঝোতায় উপনীত হয়ে ১৬৭৭ সাল পর্যন্ত ডাচ সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই ডাচ সাবভৌমত্ব ও কর্তৃত্ব দ্বীপটির উপর বজায় ছিল। ১৮৯৮ সালে স্পেন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে দ্বীপটি চুক্তি মারফত হস্তান্তর করে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র কখনই এর উপর কার্যকরভাবে সার্বভৌমত্ব চর্চা করে নি। ১৯০৬ সালে যখন আমেরিকান জেনারেল দ্বীপটিতে যান তখন তিনি দেখেন দ্বীপটিতে নেদারল্যাণ্ডের পতাকা উড়ছে এমনকি সেখানে ডাচ অফিসও প্রতিষ্ঠিত আছে।

বিষয়টি নিয়ে নেদারল্যাণ্ড ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে দীর্ঘ কূটনৈতিক বিবাদের সৃষ্টি হয়। অতঃপর উভয় দেশ বিষয়টি বিবেচনার জন্য ১৯২৫ সালে সালিশিতে উপস্থাপনে সম্মত হয়। যেখানে মি. ম্যাক্স হুবার আরবিট্রেটর নিযুক্ত হন।

ম্যাক্স হুবার-এর সিদ্ধান্ত মতে দ্বীপটি নেদারল্যাণ্ড এর বলে ধার্য হয়। তিনি তাঁর সিদ্ধান্তের পেছনে যুক্তি দেন যে যদিও দ্বীপটির উপর মূলত স্পেন-এর স্বত্ব ছিল কিন্তু ডাচ সরকার-এর দীর্ঘ দু'শত বৎসর-এর অধিককাল যাবত দ্বীপটির উপর সার্বভৌমত্ব চর্চার ফলে দ্বীপটির উপর ডাচ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হয় এবং স্পেন-এর স্বত্ব বিলোপ হয়। অতঃপর যে স্বত্ব স্পেন-এর নেই তা সে যুক্তরাষ্ট্রেরও কাছে হস্তান্তরে অক্ষম। এমনকি চুক্তির আট বৎসর পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রও কোন সাবভৌমত্ব প্রদর্শনও করে নি। অন্যদিকে নেদারল্যাণ্ড-এর দখল সুস্পষ্ট ও সর্বজনবিদিত ছিল, তাই দ্বীপটিতে নেদারল্যাণ্ড-এর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নেয়া হয়।

অতএব দখল কার্যকারী দখল হতে হলে তা হতে হবে নিরবিছন্ন, সুস্পষ্ট ও সর্বজনবিদিত এবং দখলকৃত অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে শান্তিপূর্ণ রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব বহালের প্রামাণিক তথ্যাদি থাকাও জরুরি।

দখল সংক্রান্ত মামলাসমূহ তাই দখল স্বত্ব সংক্রান্ত মামলায় রূপ লাভ করতে পারে এবং উল্টোটাও হতে পারে। অতএব বিভিন্ন দাবি ও পাল্টা দাবির মীমাংসা করতে গিয়ে আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনালসমূহ প্রায়শ কোন নির্দিষ্ট অর্জনী পন্থার কথা না বলে সে রাষ্ট্রের পক্ষেই সিদ্ধান্ত দেন যে রাষ্ট্র বিরোধপূর্ণ অঞ্চলের উপর বেশি কার্যকর দখল প্রমাণ করতে সক্ষম। এ প্রসঙ্গে *ইস্টার্ণ গ্রীনল্যান্ড মামলায় নরওয়ের* বিপক্ষে এবং ডেনমার্কের পক্ষে প্রদত্ত রায়টি উল্লেখযোগ্য।

মামলা : Eastern Greenland Case; ইস্টার্ণ গ্রীনল্যান্ড মামলা; (Denmark Vs. Norway, PCIJ, 1933)

১৭২১ সাল থেকে গ্রীনল্যান্ড-এ ডেনমার্ক-এর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। বিরোধ এর সূচনা হয় মূলত ১৯৩১ সালে ১০ জুলাই থেকে যখন নরওয়ে রয়াল প্রক্লেমেশন-এর মাধ্যমে গ্রীনল্যান্ডের পূর্ব অংশকে terra nullius ঘোষণা করে নিজেদের সার্বভৌমত্বের অধীন বলে দাবি করে তখন। তারা এ অংশে নরওয়ের পতাকা উত্তোলন করে। কিন্তু ডেনমার্ক এ ভূ-খণ্ডে নিজের দাবি বজায় রাখে কেননা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মিত্রশক্তিভূক্ত রাষ্ট্রসমূহ সমগ্র গ্রীনল্যান্ড ডেনমার্ক-এর বলে সম্মত হয়েছিল এবং নরওয়ের পররাষ্ট্র মন্ত্রীও এ দাবির প্রতি মৌখিক সম্মতি প্রদান করেছিলেন। ডেনমার্ক আরো দাবি করে যে বহু বৎসর যাবত সমগ্র গ্রীনল্যান্ডে ডেনমার্ক-এর বৈধস্বত্ব বিরাজমান এবং ডেনমার্ক এ স্বত্বের সুস্পষ্ট বহিঃপ্রকাশও ঘটিয়েছে। অতঃপর ডেনমার্ক বিরোধটি PCIJ তে নিয়ে যায়।

এ মামলায় কোর্ট-এর বিচার্য বিষয়ছিল দু'টি–

১. কোন দেশ বাস্তব দখলে আছে ? এবং

২. কোন দেশের বৈধ স্বত্ব বিরাজমান?

গ্রীনল্যান্ডে ডেনমার্কের স্বত্ব বিদ্যমান-এর পক্ষে ১২ ভোটের মধ্যে ১০ ভোট এবং বিপক্ষে ২ ভোট প্রদত্ত হয়। অর্থাৎ সমগ্র গ্রীনল্যান্ডের উপর ডেনমার্ক-এর সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত হয়।

বিচার্য বিষয় ছিল যে, যখন ডেনমার্ক সমগ্র গ্রীনল্যান্ড, অন্যদিকে নরওয়ে, গ্রীনল্যান্ডের পূর্ব অংশ নিজের সার্বভৌমত্বের অধীন বলে দাবি করছে তখন এটা প্রতিষ্ঠিত ছিল যে ডেনমার্ক গ্রীনল্যান্ডের দখলে আছে ঠিকই কিন্তু এ দখল সমগ্র গ্রীনল্যান্ড ব্যাপী কার্যকর কি না? সুতরাং এর পক্ষে বিপক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ প্রয়োজনীয় ছিল। ডেনমার্ক সাক্ষ্য হিসাবে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ উপস্থাপন করে:

১. ১৯৩১ সাল পর্যন্ত অন্য কোন রাষ্ট্র কোন বিরুদ্ধ স্বত্ব দাবি করে নি।

২. গ্রীনল্যান্ডের ভূমির প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের কারণে যদিও সকল সময় নিরবিচ্ছিন্নভাবে দখল-এর বাস্তব চর্চা করা সম্ভব ছিল না তবুও ডেনমার্ক বহু আইনি ও প্রশাসনিক কার্যক্রম গ্রহণ করেছিল যেগুলো সমগ্র গ্রীনল্যান্ডের উপরই কার্যকর বলে ধরে নেয়া হয়েছিল।

৩. অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে অনেক চুক্তিতেও গ্রীনল্যান্ডের উপর ডেনমার্ক-এর স্বত্ব স্বীকার করে নেয়া হয়েছিল।

৪. নরওয়ের পতাকা উত্তোলনের সাথে সাথে ডেনমার্ক আপত্তি উত্থাপন করেছে।

সুতরাং, ১৭২১ থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত কার্যকর দখল ও প্রাসঙ্গিক সাক্ষ্য প্রমাণাদি গ্রীনল্যান্ড-এ ডেনমার্ক-এর সার্বভৌমত্ব ও বৈধ স্বত্ব প্রমাণ-এর জন্য যথেষ্ট।

সুতরাং এ মামলার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হল যে কার্যকারী দখল প্রতিষ্ঠা করতে হলে কিংবা দখলের মাধ্যমে কোন ভূ-খণ্ডে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হলে দু'টো উপাদান অবশ্যই বর্তমান থাকতে হবে–

১. সার্বভৌমত্ব চর্চার অভিপ্রায়ে ভূমি দখল; ও

২. অভিপ্রায়-এর কার্যকর বহিঃপ্রকাশ।

ভৌগলিক নৈকট্য দখল বৈধ করার পক্ষে কোন যুক্তি নয়, বরং উপরোক্ত উপাদান দু'টি দখলের বৈধতার জন্য বেশি জরুরি, এমনি নীতি ধার্য হয় **ক্লিপারটন আইল্যান্ড আরবিট্রেশন-এ**, (ফ্রান্স বনাম মেক্সিকো, ১৯৩৩)। মামলায় যে মূলনীতিটি ধার্য হয় তাহল দখল হতে হবে কার্যকারী দখল; নাম মাত্র দখল ভূ-খণ্ড অর্জনের জন্য যথেষ্ট নয়। ঘটনাটি ছিল নিম্নরূপ:

ক্লিপারটন, মেক্সিকোর উপকূলে ছোট্ট একটি দ্বীপ। দ্বীপটিতে মূল্যবান খনিজ পদার্থ ছিল। সে দ্বীপে কোন জনবসতি ছিল না, কিন্তু মেক্সিকোর জেলেরা সময় সময় এ দ্বীপে মাছ শিকার করতে আসতো। এক ফরাসি নাবিক দ্বীপটি আবিষ্কার করে বলে দাবি করে এবং জাহাজ থেকে দ্বীপে নেমে ফ্রান্সের পতাকা উত্তোলন করে ও উপকূলে ছোট্ট একটা পার্টির আয়োজন করে হাওয়াই চলে আসে এবং সেখানে ফরাসি কনস্যুলেটের এর মাধ্যমে বিষয়টি হনুলুলু

সরকারকে অবগত করে এবং হনুলুলু জার্নালে ১৮৫৮ সালে ফরাসি সরকার-এর পক্ষ থেকে দ্বীপটিতে ফরাসি সার্বভৌমত্বের ঘোষণা দেয় এবং সর্বশেষে লন্ডন চলে এসে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দ্বীপটির আবিষ্কার ও তার উপর ফরাসি সার্বভৌমত্বের ঘোষণা করে। কিন্তু ১৮৯৭ সালে মেক্সিকো ফরাসি দাবি অস্বীকার করে এবং যুক্তি দেখায় যে দ্বীপটি মেক্সিকো থেকে এত নিকটে যে কেবল মেক্সিকোই-এর মালিকানা দাবি করতে পারে। বিরোধটি আর্বিট্রেশন-এ পাঠানো হয়।

আর্বিট্রেশন-এ ধার্য হয় যে ক্লিপারটন দ্বীপ ফরাসি সার্বভৌমত্বের অধীন এবং ১৭ নভেম্বর ১৮৫৮ সালে যখন ফ্রান্স এ দ্বীপে সার্বভৌমত্বের ঘোষণা দেয় তখন থেকেই এটা ফ্রান্সের। এ রায়ের কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয় যে ফ্রান্স যথোপযুক্তভাবে এ দ্বীপে নিজের সার্বভৌমত্ব চর্চার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছে। প্রথমত দ্বীপে পতাকা উত্তোলন করে। দ্বিতীয়ত হাওয়াই অফিসিয়াল বুলেটিনে নিজের অভিপ্রায় প্রকাশ করে। তৃতীয়ত লন্ডনে এসে অফিসিয়াল ঘোষণা দেবার মধ্য দিয়ে ফ্রান্স সুস্পষ্ট ও কার্যকর দখল প্রতিষ্ঠা করেছে। তাই যদিও দ্বীপটি মেক্সিকোর খুব নিকটবর্তী তবুও কেবল প্রাকৃতিক নৈকট্যই দখল প্রতিষ্ঠা করে না, ফ্রান্স দখল প্রতিষ্ঠার শর্ত পূরণ করেছে বলে দ্বীপটি ফরাসি সার্বভৌমের অধীন।

বিভিন্ন মামলায় কার্যকর দখলের উপাদান হিসেবে আরো কিছু শর্ত উল্লেখ করা হয়। যেমন-

১. দখলকৃত ভূ-খণ্ডে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সার্বভৌমত্বের ঘোষণা দিতে হবে, ব্যক্তিগত ঘোষণা যথেষ্ট নয়

২. দখল শান্তিপূর্ণ হতে হবে

৩. অন্য রাষ্ট্রের সম্মতি নিয়ে দখল চর্চা করলে সে দখল কার্যকর হবে না।

তবে দখল সংক্রান্ত শর্তাবলীতে বিংশ শতাব্দীতে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। যেমন- পূর্বে সামাজিক কিংবা রাজনৈতিকভাবে সংঘবদ্ধ জনবসতি না থাকলে কোন অঞ্চলের জনবসতিকে উপেক্ষা করে অঞ্চলগুলোকে terra nullius ঘোষণা করা হতো। যেমন অষ্ট্রেলিয়াতে যখন যুক্তরাজ্য সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করে তখন এ অঞ্চলের অধিবাসী জনগণকে উপেক্ষা করে অষ্ট্রেলিয়ার ভূ-খণ্ডকে terra nullius গণ্য করা হয়।

বর্তমানে কিন্তু এমন মামলাও দেখা যাচ্ছে যেখানে ব্যক্তিগত মালিকানাকে সাক্ষ্য হিসেবে নিয়েও দখল স্বত্ব মীমাংসা করা হয়েছে। এর একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ **রান অব কাচ আর্বিট্রেশন**, (ইন্ডিয়া বনাম পাকিস্তান, ১৯৬৮) এ সালিশিতে ট্রাইবুনাল প্রয়োজনীয় তথ্য, ভৌগোলিক অবস্থান ও ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তিতে কাচের রান এলাকায় পাক-ভারত সীমান্তে নগর পাকার নামে ৩২০ বর্গমাইল এলাকা পাকিস্তানকে প্রদান করে। এ মামলায় স্বীকার করা হয় যে পশুচারণও এরকম সাধারণ ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক কার্যকাণ্ডকেও ক্ষেত্র বিশেষে রাষ্ট্রের স্বত্বের সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করা যায়। এ সালিশিতে আরো ধার্য হয় যে সার্বভৌমত্বের প্রকাশের ধরন প্রথা, ঐতিহ্য, সময়, স্থান ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের পার্থক্যের কারণে ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিতে পারে।

এতক্ষণ যাবৎ ভূ-খণ্ড অর্জনের অন্যতম পন্থা দখল সম্পর্কে যে আলোচনা করা হল সে প্রসঙ্গেই বলা যায় যে যদিও পন্থাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তবুও বর্তমান শতাব্দীতে এর গুরুত্ব অনেক কমে এসেছে। কেননা এখন সম্ভবত terra nuillius বলে আর কোন ভূমি নেই। অন্যদিকে জোড়পূর্বক দখল পূর্বেও যেমনি অবৈধ ছিল তেমন বর্তমানেও। ১৯২৮ সালে 'ব্রায়ান কেলগ' এ্যাক্ট এবং জাতিসংঘ সনদের ২ (৪) অনুচ্ছেদ বলে জবর দখল প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অবৈধ ঘোষিত।

রাজ্যজয় (Conquest or annexation)

সংযোজন ভূ-খণ্ড অর্জনের আরেকটি অন্যতম পন্থা এবং এ পন্থাটি কেবল যুদ্ধের পরই গ্রহণ করা সম্ভব ছিল। সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে বিদেশী ভূমি বিজয় ও নিজ ভূমির অন্তর্ভুক্ত করে নেয়াকে সংযোজন বলা যায়। মূল কথা হচ্ছে, শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে অন্যের ভূ-খণ্ড দখল করা এবং সেখানে সার্বভৌমত্ব কায়েম বা নিজ ভূ-খণ্ড ভুক্ত করাই রাজ্যজয় বা সংযোজন।

রাজ্যজয় বা সংযোজন পন্থায় ভূ-খণ্ড অর্জন সাধারণত দু'ধরনের কার্যাবলীর মাধ্যমে করা হয়ে থাকে-

ক. কোন ভূ-খণ্ড বিজয় করে তা নিজ ভূ-খণ্ডের অধীনে সংযোজন করে নেয়া, বা

খ. কোন এলাকার উপর হয়তো মোটামুটিভাবে কর্তৃত্ব বজায়ই আছে এমন এলাকাকে সংযোজিত এলাকা বলে ঘোষণা দেয়া।

প্রথমোক্ত ঘটনা পারশপর্যই বেশি স্বাভাবিক, তবে দ্বিতীয়টিরও নজীর আছে যেমন কয়েক বৎসর জাপানের কর্তৃত্বাধীনে থাকার পর ১৯১০ সালে জাপান কর্তৃক কোরিয়া সংযোজন।

কেবল মাত্র কোন রাজ্যজয় করে নেয়াই যথেষ্ট নয়, উপরন্তু সংযোজিত করবার অভিপ্রায়ের ঘোষণাও দেয়া আবশ্যক। সাধারণত সংযোজিত করতে ইচ্ছুক এমন অন্যান্য বিরুদ্ধ শক্তির নিকট নোট (Notes) পাঠানোর মাধ্যমে এ রকম ঘোষণা দেয়া হয়।

পূর্বে বৈধ- অবৈধ সব রকম শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমেই সংযোজন করা হত, কিন্তু ১৯২৮ সালে ব্রায়ান কেলগ এ্যাক্ট এ জাতীয় নীতি হিসাবে যুদ্ধকে বে-আইনি ঘোষণা করার ফলে সংযোজনের মাধ্যমে ভূ-খণ্ড অর্জন সম্ভব নয় বললেই চলে।

জাতিসংঘ সনদের ২ (৪) নং অনুচ্ছেদেও বলা হয়েছে যে, জাতিসংঘের সকল সদস্য আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোন রাষ্ট্রের আঞ্চলিক অখণ্ডতা অথবা জাতিসংঘের উদ্দেশাবলীর পরিপন্থী সকল প্রকার বল প্রয়োগের হুমকি প্রদান কিংবা বল প্রয়োগ করা হতে বিরত থাকবে।

নিরাপত্তা পরিষদের রেজ্যুলেশান ২৯২ যুদ্ধের মাধ্যমে ভূ-খণ্ড দখলের পন্থাকে অস্বীকার করেছে।

১৯৭০ সালের আন্তর্জাতিক আইনের নীতিমালা সংক্রান্ত ঘোষণার ১০ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে-'শক্তির প্রয়োগ বা হুমকির দ্বারা কোন রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের ভূ-খণ্ড অর্জন করতে পারবে না। শক্তির প্রয়োগ বা হুমকির দ্বারা অর্জিত কোন ভূ-খণ্ডই বৈধ বলে স্বীকৃত হবে না।'

নিরাপত্তা পরিষদের রেজ্যুলেশান ৬৬২ (১৯৯০) সর্বসম্মত ও দ্ব্যর্থহীনভাবে গৃহীত হয়। এতে নিরাপত্তা পরিষদ সিদ্ধান্ত নেয় যে ইরাক কর্তৃক যে অজুহাতেই কুয়েত সংযোজন করা হোক না কেন তা অবৈধ এবং সকল রাষ্ট্র ও সংস্থাকে এ সংযোজনকে স্বীকৃতি দিতে বা স্বীকৃতিতে পর্যবশিত হয় এরূপ কার্য করা হতে বিরত থাকতে আহবান করা হয়।

পরিবৃদ্ধি (Accretion)

এটি ভূ-খণ্ড অর্জিত হবার একটি প্রাকৃতিক পন্থা। যখন প্রাকৃতিক কারণে (যেমন পলি জমা কিংবা বাহিত বালু জমা হওয়া) কোন সার্বভৌম ভূ-খণ্ডের পরিবৃদ্ধি ঘটে, তখন এ পন্থায় ভূ-খণ্ড অর্জিত হতে পারে। এক্ষেত্রে স্বত্ব ঘোষণার প্রয়োজন হয় না। বিভিন্ন উপায়ে এরূপ পরিবৃদ্ধি ঘটতে পারে যেমন– নদীর মোহনায়, সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে নতুন ভূ-খণ্ড বা রাষ্ট্রীয় সমুদ্রে নতুন দ্বীপ সৃষ্টি হতে পারে। নদী যদি আন্তর্জাতিক সীমানা হয় তবে তার গতিপথ পরিবর্তনের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সীমানা বাড়তে পারে। ভূমিকম্পে সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে নতুন ভূ-খণ্ড বা রাষ্ট্রীয় সমুদ্রে নতুন দ্বীপ সৃষ্টি হতে পারে।

পরিবৃদ্ধির একটি উদাহরণ হচ্ছে দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ। সত্তরের দশকের প্রথম দিকে বাংলাদেশের উপকূলবর্তী সমুদ্রাঞ্চল হাড়িয়াভাঙ্গা ও রায়মঙ্গল নদীর মোহনায় একটি ভূ-খণ্ড গোচরিভূত হয়। বাংলাদেশ-এর নাম দেয় দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ। ভারতও দক্ষিণ মুরল্যান্ড নাম দিয়ে দ্বীপটি দাবি করে। ভৌগলিক অবস্থান বিশ্লেষণ এবং আন্তর্জাতিক আইন ও ন্যায়পরায়ণতার বিচারে দ্বীপটি বাংলাদেশের বলেই প্রতীয়মান হয়। যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকোর মধ্যে রিওগ্রানদে নদীও এরূপ পরিবৃদ্ধির এক নমুনা।

দীর্ঘ দখলজনিত স্বত্বাধিকার (Prescription)

সাধারণভাবে দীর্ঘ দখলজনিত স্বত্বাধিকার বা প্রেসক্রিপশন বলতে বোঝায়, দীর্ঘদিন যাবত বিরুদ্ধ দখলাধিকার চর্চার মাধ্যমে কোন স্বত্বের অধিকারী হওয়া। আন্তর্জাতিক আইনেও দীর্ঘ ও কার্যকর কর্তৃত্ব বজায় রাখার মাধ্যমে স্বত্ব অর্জন করা সম্ভব। বস্তুত দীর্ঘ দিন যাবত শান্তিপূর্ণ উপায়ে অন্য সার্বভৌমের অধীন কোন ভূমিতে সার্বভৌমত্ব চর্চার মাধ্যমে দীর্ঘ দখলজনিত স্বত্বাধিকার জন্মায়।

আইল্যান্ড অব পালমাস মামলা

এ পন্থার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তবে আন্তর্জাতিক আইনে কোন প্রতিষ্ঠিত নীতি নেই যার মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে বলা যাবে ঠিক কত বৎসর অধিকার চর্চা করলে এরূপ স্বত্বাধিকার বৈধ বলে বিবেচিত হবে।

দখল এর ন্যায় এ পন্থাও কার্যকর কর্তৃত্ব বজায় রাখার উপর নির্ভরশীল। তবে দখলের সাথে এ পন্থার পার্থক্য পূর্বক্তোটিতে Terra nullius দখল করা হয়, অন্য দিকে এ পন্থায় অন্য সার্বভৌমত্বের অধীন ভূমিতে দখল চর্চা করা হয়, তবে অবশ্যই শান্তিপূর্ণ উপায়ে।

দীর্ঘ দখলজনিত দখলি স্বত্ব পন্থার উল্লেখযোগ্য **মামলা টেম্পল অব প্রিয়াহ্ বিহিয়ার।**

মামলা : The Temple of Preah Vihear Case; প্রিয়াহ্ বিহিয়ার বৌদ্ধ মন্দির মামলা; (Combodia Vs. Thailand, ICJ, 1967)

থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়ার মধ্যে সীমানা সংক্রান্ত বিরোধ হতে এ মামলার উদ্ভব হয়। প্রিয়াহ্ বিহিয়ার মন্দিরটি ছিল অত্যন্ত প্রাচীন ও ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যগত বিচারে মূল্যবান নিদর্শন। থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়ার সীমান্ত অঞ্চলে এ বৌদ্ধ মন্দিরটি অবস্থিত ছিল। মূলত থাইল্যান্ডের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলেই এর অবস্থান ছিল। ১৯০৪ সালে কম্বোডিয়া (তৎকালীন ফরাসি উপনিবেশ) ও থাইল্যান্ডের সীমান্ত ফ্রান্স ও থাইল্যান্ডের মধ্যকার এক চুক্তি দ্বারা নির্ধারিত হয়। চুক্তিতে নির্ধারিত জলভূমির রেখা বরাবর সীমান্ত ভাগ করা হয় এবং পরবর্তীতে ফ্রান্স ও সিয়ামিজ কমিশন-এর জরিপ ও কৌশলী জনবলের সহায়তায় বিস্তারিত মানচিত্র তৈরি করা হয়। মানচিত্রে যদিও ভুলক্রমে তবুও অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে মন্দিরটি কম্বোডিয়ার অংশে দেখানো হয়। মানচিত্রের কপি থাই সরকারকে দেয়া হয় এবং তারা কোন প্রতিবাদ উত্থাপন করে নি বরং মানচিত্র গ্রহণ করে ও আরো কিছু কপির জন্য অনুরোধ করে।

কয়েক বৎসর পর থাই যুবরাজ মন্দির ভ্রমণে যান এবং মন্দিরের চূড়ায় ফরাসি পতাকা উড়তে দেখেন, কিন্তু কোন প্রতিবাদ করেন নি।

বিরোধের সূচনা হয় মূলত যখন ইউনেস্কো মন্দিরটির প্রাচীনত্ব ও ঐতিহ্যগত মূল্য বিবেচনা করে একে ঐতিহাসিক নিদর্শন বলে ঘোষণা দেয় এবং মন্দিরটি রক্ষণাবেক্ষণে বহু মিলিয়ন ডলারের কার্যক্রম হাতে নেয়। থাইল্যান্ড তখন মন্দিরটি নিজেদের দেশে অবস্থিত বলে দাবি করতে থাকে এবং বলে যে, মন্দিরটি কম্বোডিয়ার মানচিত্রে ভুলক্রমে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

কিন্তু কম্বোডিয়া মন্দিরের উপর নিজেদের দাবি-বজায় রাখে। পরে মোকদ্দমাটি নিষ্পত্তির জন্য আন্তর্জাতিক আদালতে যায়। আদালতের সিদ্ধান্তে বলা হয়, যেহেতু দীর্ঘকাল মন্দিরটি থাইল্যান্ড দাবি করে নি এবং শান্তিপূর্ণভাবে কম্বোডিয়ার সার্বভৌমত্ব বজায় ছিল তাই মন্দিরটি কম্বোডিয়ার রাষ্ট্রীয় সীমানার অন্তর্ভুক্ত হবে। কোন অঞ্চলের উপর স্বত্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হলে অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে যে, সুদীর্ঘকাল ব্যাপী নির্বিঘ্নে ও নির্বিবাদে তার উপর কর্তৃত্ব প্রয়োগ করা হয়েছে।

অর্পণ বা বিনিময় (Cession or Exchange)

ভূ-খণ্ড অর্জনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য পন্থা হচ্ছে বিনিময় বা অর্পণ। রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের নীতির উপরই ভূ-খণ্ড হস্তান্তরের অধিকার প্রতিষ্ঠিত।

যদি দু'টি রাষ্ট্র পারস্পরিক চুক্তির মাধ্যমে নিজ রাষ্ট্রের ভূ-খণ্ডের অংশবিশেষের কর্তৃত্ব অন্য রাষ্ট্রের কাছে হস্তান্তর করে তবে তা সমর্পণ বা বিনিময় বলে। সমর্পণ শান্তিপূর্ণ উপায়ে যেমন ক্রয়, বিক্রয়, কিংবা বিনিময় অথবা যুদ্ধের ফলস্বরূপ, সন্ধি চুক্তির মাধ্যমে অথবা অন্য কোনরূপ আত্মসমর্পণের মাধ্যমেও সম্পন্ন হতে পারে। বিনিময়ের সবচেয়ে বোধগম্য উদাহরণ বেরুবারির সাথে তিন বিঘা করিডোর-এর বিনিময়।

বিখ্যাত ভেনিস বন্দর প্রথমে ছিল অস্ট্রিয়ার, অস্ট্রিয়া বন্দরটি ফ্রান্স-এর কাছে অর্পণ করে। ফ্রান্স আবার তা ইটালির কাছে হস্তান্তর করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ভার্সাই চুক্তির দ্বারা ১৯১৯ সালে জার্মানী এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সান ফ্রান্সিসকো চুক্তির দ্বারা (১৯৫১) জাপান মিত্রশক্তির নিকট অনেক ভূ-খণ্ড অর্পণ করে। বিক্রি, দান ও বিনিময়ের মাধ্যমেও অর্পণ সাধিত হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র ফ্রান্স থেকে লুইসিয়ানা ও রাশিয়া থেকে আলাসকা ক্রয় করে (১৯৬৭)। ১৮৭৫ সালে রাশিয়া দক্ষিণ সাখালিনের বিনিময়ে কুরিল দ্বীপপুঞ্জ জাপানের কাছে অর্পণ করে।

তবে অর্পণ-এর ক্ষেত্রে সবসময় একটা বিষয় মনে রাখতে হবে যে, হস্তান্তরকৃত ভূ-খণ্ডের উপর অর্পণকারী রাষ্ট্রের যে অধিকার ছিল, ভূ-খণ্ড অর্জনকারী রাষ্ট্র তার থেকে বেশি অধিকার অর্জন করে না। উদাহরণ স্বরূপ পালমাস দ্বীপ (১৯২৮) সালিশী মামলার উল্লেখ করা যেতে পারে। স্পেন ১৮৯৮ সালে প্যারিস চুক্তি অনুযায়ী ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ যুক্তরাষ্ট্রকে অর্পণ করে। চুক্তিতে পালমাস দ্বীপকে ফিলিপাইনের অংশ হিসেবে দেখানো হয়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র যখন দ্বীপটির দখল নিতে যায়, তখন দেখা গেল ঐটি ওলন্দাজদের নিয়ন্ত্রণাধীন। সালিশীতে যুক্তরাষ্ট্র দাবি করে যে, পালমাস দ্বীপ ১৮৯৮ সালের আগে স্পেনের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ছিল এবং যুক্তরাষ্ট্র দ্বীপটি স্পেনের নিকট হতে অর্পণের মাধ্যমে অর্জন করেছে।

সালিশ নিষ্পত্তিকারী ম্যাক্স হুবার তাঁর অভিমতে বলেন, যদি স্পেন কখনো আগে দ্বীপটির উপর তার সার্বভৌমত্ব কায়েম করেও থাকে, (এ প্রশ্নটির মীমাংসা অবশ্য তিনি করেন নি) তবুও নেদারল্যান্ড অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই দ্বীপটি শাসন করে আসছে এবং সার্বভৌম শক্তি স্পেনের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। যেহেতু ১৮৯৮ সালে দ্বীপটির উপর স্পেনের কোন স্বত্ব ছিল না, যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক স্পেনের কাছ থেকে স্বত্ব অর্জনের প্রশ্নই আসে না।

রাষ্ট্রীয় ভূ-খণ্ড অর্জনের উল্লিখিত পন্থাগুলো বর্তমানে খুব একটা কার্যকর বা বাস্তবসম্মত নয়। তবুও, পূর্বে অর্জিত স্বত্বের ব্যাপারে কোন সন্দেহ বা প্রশ্ন উত্থাপিত হলে তা নিরসনে এই পন্থাগুলো বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়।

স্বীকৃতি
Recognition

আন্তর্জাতিক আইনে কোন সদ্য প্রতিষ্ঠিত নতুন রাষ্ট্রকে, রাষ্ট্রের অস্তিত্বকে বিশ্বের অন্যান্য স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে মেনে নেওয়াকেই স্বীকৃতি বলে। স্বীকৃতির ফলে কোন দেশ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করে। যদিও আন্তর্জাতিক আইনে এমন কোন বিধান নেই যার উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, একটি নতুন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেয়া অন্যান্য রাষ্ট্রের কর্তব্য। আবার নতুন রাষ্ট্রের অধিকারও নেই ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য রাষ্ট্রের স্বীকৃতি পাবার। তাই এটি Soft International Law-এর অন্তর্ভুক্ত। স্বীকৃতি আন্তর্জাতিক আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা একটি নব্য প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রকে আন্তর্জাতিক আইনের বিষয়বস্তুতে পরিণত হতে সাহায্য করে। স্বীকৃতিপ্রাপ্তির ফলে একটি নব্য প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র কতিপয় অধিকার ভোগ করে থাকে। যেমন– অন্য রাষ্ট্রের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন, চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার যোগ্যতা, স্বীকৃতিদাতা দেশের আদালতে মামলা দায়ের করার অধিকার প্রভৃতি।

আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন বা প্রদান একটি সমস্যাও বটে। যখন নতুন রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে তখন ঐ রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেয়া যাবে কি না এ নিয়ে নানাবিধ বিতর্কের সৃষ্টি হয়। অনেক সময় দেখা যায় যে, কিছু সংখ্যক রাষ্ট্র স্বীকৃতি প্রদান করলেও কতিপয় রাষ্ট্র উক্ত স্বীকৃতির বিরোধিতা করে। যেমন– ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল বাংলাদেশের মুজিবনগর অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠা করলেও বাংলাদেশ প্রথম স্বীকৃতি পায় ৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ ভারতের কাছ হতে; অপরপক্ষে, যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও সৌদি আরব অনেক পরে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করেছিল।

স্বীকৃতির প্রশ্ন যতই রাজনৈতিক হোক না কেন, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাধারণভাবে প্রচলিত কিছু রীতি-নীতি রয়েছে যা রাষ্ট্রসমূহ স্বীকৃতির প্রশ্নে সচরাচর মেনে চলে। স্বীকৃতির শর্তাবলী পূরণ হলে বিলম্বে হলেও রাষ্ট্রসমূহ স্বীকৃতি প্রদান করে, কারণ স্বীকৃতির মাধ্যমেই কেবল স্বীকৃত রাষ্ট্রের সঙ্গে পুরোপুরিভাবে পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আদান-প্রদান চলে যা দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থ রক্ষার জন্য অপরিহার্য। স্বীকৃতির প্রশ্নটি মূলত রাজনৈতিকভাবে মীমাংসিত হলেও স্বীকৃতি প্রদান অনিবার্যভাবে কিছু আইনগত ফলাফল সৃষ্টি করে, আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনাল ও রাষ্ট্রীয় আদালতে যার ব্যবহারিক গুরুত্ব অপরিসীম।

একটি নতুন রাষ্ট্রের জন্য স্বীকৃতি আদৌ প্রয়োজনীয় কিনা এ সম্পর্কে দুইটি উল্লেখযোগ মতামত রয়েছে। যেমন –

১. **Richard Baxter** (প্রখ্যাত আন্তর্জাতিক আইনবিদ ও আন্তর্জাতিক আদালতের প্রাক্তন বিচারক) এর মতানুসারে স্বীকৃতি কোন রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে যতখা... সমস্যার সমাধান করে, তার চেয়ে বেশি সমস্যার সৃষ্টি করে। তাই এই স্বীকৃ... প্রথাটি আন্তর্জাতিক আইনে কম গুরুত্ব দেয়া উচিত। আন্তর্জাতিক আইন থেকে এ... ব্যবহার এবং উপযোগিতা হ্রাস করা উচিত।

২. **Estrada** (আর্জেন্টিনার প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী, আন্তর্জাতিক আইনবিদ) এর মতানুসারে সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত আত্মস্বীকৃত রাষ্ট্রের জন্য অন্য রাষ্ট্রের স্বীকৃতির বিধান হচ্ছে অপমানজনক। সুতরাং এই ব্যবস্থাটি মানা উচিত নয়। তার মতে, কোন জনগোষ্ঠী যদি সার্বভৌম (Sovereign) হয় তবে তার জন্য স্বীকৃতির কোন প্রয়োজন নেই।

জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভের জন্য অন্যান্য রাষ্ট্রের স্বীকৃতি বাধ্যতামূলক নয়। এ প্রসঙ্গে UN Charter-এর ৪ নং অনুচ্ছেদ এর বিষয়সমূহ উল্লেখ করা যায়। যথা : 'বর্তমান সনদে উল্লেখিত সমূদয় দায়দায়িত্ব যারা গ্রহণ করবে এবং সংগঠনটির বিচারে যারা এসব দায়দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম ও ইচ্ছুক সেরূপ অন্য সকল শান্তিপ্রিয় রাষ্ট্রের জন্য জাতিসংঘের সদস্যপদ উন্মুক্ত থাকবে'। এদিক থেকে বিচার করলে জাতিসংঘের সদস্যপদ প্রাপ্তির মাধ্যমে একটি রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে Collective recognition পেতে পারে।

স্বীকৃতির তত্ত্ব : স্বীকৃতির প্রকৃতি সম্পর্কে দুইটি তত্ত্ব রয়েছে। যথা –

১. গঠনমূলক তত্ত্ব (Constitutive theory)
২. ঘোষণামূলক তত্ত্ব (Declaratory theory)

গঠনমূলক তত্ত্ব

এই তত্ত্ব অনুযায়ী স্বীকৃতির মাধ্যমেই শুধু কোন রাষ্ট্র রাষ্ট্রীয় সত্তা হিসেবে তার বৈধতা অর্জন করতে পারে অর্থাৎ স্বীকৃতিই রাষ্ট্র গঠন করে। স্বীকৃতি ছাড়া রাষ্ট্রের কোন অস্তিত্ব নেই এবং তা আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীর সদস্যও হতে পারে না। অনুরূপভাবে শুধু স্বীকৃতির মাধ্যমেই কোন সরকার বৈধতা লাভ করে এবং নির্দিষ্ট রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতা অর্জন করে।

ঘোষণামূলক তত্ত্ব

এই তত্ত্ব অনুযায়ী স্বীকৃতির উপর রাষ্ট্রীয় সত্তা অর্জন নির্ভর করে না। রাষ্ট্রীয় সত্তার উপাদান অর্জন সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়, যা আন্তর্জাতিক আইনের তুলনায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানেরই বেশি অন্তর্গত। রাষ্ট্রীয় সত্তার শর্তাবলীপূরণ হলে তা অবশ্যই রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচিত হবে। তার জন্য স্বীকৃতির প্রয়োজন নেই। এখানে অন্যান্য রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃতির গুরুত্ব শুধু ঘোষণামূলক অর্থাৎ যা অস্তিত্ব রয়েছে তাকেই আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করে নেয়া। স্বীকৃতি গঠন করে না, ঘোষণার মাধ্যমে শুধু স্বীকার করে নেয়। স্বীকৃতি বড় জোর রাষ্ট্রের অস্তিত্বের একটি প্রমাণ বহন করে। তেমনি এই তত্ত্ব অনুযায়ী কোন সরকারের কর্তৃত্ব স্বীকৃতির উপর নির্ভরশীল নয়। কর্তৃত্ব আগে থেকেই থাকে যা অন্যান্য রাষ্ট্র আনুষ্ঠানিক ঘোষণার মাধ্যমে স্বীকার করে নেয়।

প্রকারভেদ : উদ্দেশ্য অনুযায়ী স্বীকৃতি বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। যথা :

ক. রাষ্ট্রের স্বীকৃতি (Recognition of a state)
খ. সরকারের স্বীকৃতি (Recognition of a Government)
গ. আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় সংগ্রামরত জনগণকে স্বীকৃতি (Recognition of liberation movement)

ঘ. প্রবাসী সরকারের স্বীকৃতি (Recognation of a Government in exile)

রাষ্ট্রের স্বীকৃতি (Recognition of a state)

আন্তর্জাতিক আইনে 'রাষ্ট্রের স্বীকৃতি' বলতে বিশ্বের বিভিন্ন সার্বভৌম ও প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক একটি নব্য প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রকে আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকার করাকে বুঝায়। তবে নব্য ঘোষিত রাষ্ট্রকে স্বীকৃতিদানের পূর্বে যে বিষয়টির উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয় তাহলো নব্য ঘোষিত রাষ্ট্রটি স্থায়ীভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে কি না?

রাষ্ট্রসমূহের অধিকার ও দায় দায়িত্ব সংক্রান্ত ১৯৩৩ সালের মন্টিভিডিও কনভেনশনের ১ ধারা অনুযায়ী একটি রাষ্ট্রের জন্য নিম্নলিখিত বৈশিষ্টগুলো অপরিহার্য। যথা–

ক. রাষ্ট্রের একটি যুক্তিসংগত জনসমষ্টি বিদ্যমান থাকতে হবে
খ. এর একটি সুনির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডের অস্তিত্ব থাকতে হবে
গ. এর জনগোষ্ঠীকে পরিচালনার জন্য একটি সরকারের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকতে হবে
ঘ. বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনের যোগ্যতা এবং ক্ষমতা থাকতে হবে।

সরকারের স্বীকৃতি (Recognition of a Government)

সরকার রাষ্ট্রেরই একটি অংশ, তবু স্বীকৃতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ও সরকারকে পৃথকভাবে দেখা হয়। অনেক রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেয়া হলেও সরকারকে স্বীকৃতি দেয়া হয় না। কোন একটি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেয়া হলে সেটা স্থায়ী স্বীকৃতি হয় এবং যতদিন পর্যন্ত ঐ রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে, ততদিন পর্যন্ত স্বীকৃতিও বহাল ও বলবৎ থাকে। কিন্তু কোন রাষ্ট্রের এক সরকারের পতন হলে বা পরিবর্তন হলে নতুন সরকারকে অন্যান্য রাষ্ট্রের সরকার স্বীকৃতি নাও দিতে পারে। মূলত আন্তর্জাতিকভাবে মর্যাদাপূর্ণ একটি সরকার হিসেবে দেশ পরিচালনা করতে হলে তা অবশ্যই অন্যান্য রাষ্ট্রের সরকার কর্তৃক স্বীকৃত হওয়া প্রয়োজন।

আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় সংগ্রামরত জনগণকে স্বীকৃতি

যখন একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের জনগণ রাষ্ট্রের সকল উপাদানসহ সার্বভৌমত্ব লাভের প্রত্যাশায় ন্যায়সঙ্গত সংগ্রাম পরিচালনা করে তখন উহাকে স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে উক্ত এলাকার জনগণের দাবির প্রতি সমর্থন জানানো হয়।

আন্তর্জাতিক আইনে স্বীকৃতি প্রধানত দুই ধরনের। যেমন –

ক. ব্যক্ত স্বীকৃতি (Express recognition)
খ. অব্যক্ত স্বীকৃতি (Implied recognition)

ক. **ব্যক্ত স্বীকৃতি (Express recognition) :** ব্যক্ত স্বীকৃতির সমন্বয় ঘটে কতিপয় আনুষ্ঠানিক ঘোষণার ভিত্তিতে। নিম্নলিখিতভাবে ব্যক্ত বা প্রকাশ্য স্বীকৃতি জ্ঞাপন করা যায়। যথা –

(i) পুরাতন রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃতি সূচক কূটনৈতিক পত্র (Diplomatic note) দিয়ে;

(ii) ঘোষণা (Note verbal) দ্বারাও প্রকাশ্যভাবে নতুন রাষ্ট্রের প্রতি স্বীকৃতি প্রকাশ করা যায়;

(iii) রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রে স্বীকৃতির সংবাদ বহনকারী দূত প্রেরণ করেও প্রকাশ্য স্বীকৃতি জ্ঞাপন করা যায়;

(iv) নতুন রাষ্ট্রের সাথে কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদন দ্বারাও পুরাতন রাষ্ট্রসমূহ স্বীকৃতি জ্ঞাপন করতে পারে;

(v) সংসদীয় ঘোষণা (Parliamentary Declaration) দ্বারাও একটি পুরাতন রাষ্ট্র নতুন রাষ্ট্রের প্রতি স্বীকৃতি প্রকাশ করতে পারে।

খ. **অব্যক্ত স্বীকৃতি (Implied recognition) :** অব্যক্ত স্বীকৃতি বা অনুমিত স্বীকৃতি রাষ্ট্রের মনোভাব, অভ্যাস, আচার-আচরণ দ্বারাই প্রকাশ পায়। এই প্রকার স্বীকৃতি মূলত রাষ্ট্রের ইচ্ছা বা অনুমোদনের দ্বারাই কার্যকরী হয়। নিম্নলিখিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্বীকৃতিকে অনুমোদন করা হয়। যথা –

(i) যেক্ষেত্রে কোন রাষ্ট্র স্বাধীনতা অর্জন করেছে সেক্ষেত্রে অভিনন্দন বার্তা প্রেরণের মাধ্যমে;

(ii) আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে, বিশেষ করে কূটনৈতিক প্রতিনিধিবৃন্দ বিনিময়ের ভিত্তিতে;

(iii) ব্যবসা বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে;

(iv) কোন বিশেষ আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণের ভিত্তিতে।

প্রকৃতি অনুযায়ী স্বীকৃতি দুই প্রকার। যথা –

ক. আইনগত স্বীকৃতি (De-jure recognition);

খ. কার্যত স্বীকৃতি (De-facto recognition).

ক. **আইনগত স্বীকৃতি (De-jure recognition) :** আইনগত স্বীকৃতি হচ্ছে ব্যক্ত স্বীকৃতির অন্তর্ভুক্ত। আইনগত স্বীকৃতি হচ্ছে কোন রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি। এটি বলতে বুঝায় কোন রাষ্ট্রের সরকারের স্বীকৃতিকে। কোন প্রতিষ্ঠিত সার্বভৌম রাষ্ট্র কর্তৃক অন্য কোন সরকারকে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী স্বীকার করে নিয়ে সে সরকারের সঙ্গে কূটনৈতিক এবং অন্যান্য সম্পর্ক স্থাপন করাকেই আইনগত স্বীকৃতি বলা হয়। অর্থাৎ আইনগত স্বীকৃতি হচ্ছে কোন রাষ্ট্র বা সরকারকে পুরোপুরি স্বীকার করে নেয়া যার ফলে স্বীকৃতি প্রদানকারী রাষ্ট্র এবং স্বীকৃত রাষ্ট্রের মধ্যে আন্তর্জাতিক আইনের সাবজেক্ট হিসেবে পূর্ণাঙ্গ সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে।

খ. **কার্যত স্বীকৃতি (Defacto recognition) :** 'কার্যত স্বীকৃতি' অস্থায়ী প্রকৃতির স্বীকৃতি। জরুরি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কার্যত স্বীকৃতি বা De-facto recognition দেওয়া হয়। কোন রাষ্ট্র বা সরকারকে পুরোপুরি স্বীকার না করলেও তার বাস্তবতাকে অস্বীকার না করা। কার্যত স্বীকৃতি সাধারণত সীমিতভাবে দেয়া হয়।

আইনগত স্বীকৃতি এবং কার্যত স্বীকৃতির মধ্যে পার্থক্য

১. আইনগত স্বীকৃতি হচ্ছে স্থায়ী স্বীকৃতি। আইনগত স্বীকৃতি হচ্ছে পূর্ণ প্রশাসনিক স্বীকৃতি (Full official recognition)। কিন্তু কার্যত স্বীকৃতি যদিও প্রশাসনিক কিন্তু অসম্পূর্ণ (incomplete) স্বীকৃতি। এটাকে প্রায় স্বীকৃতি (semi-recognition) বলা হয়।

২. আইনগত স্বীকৃতি এবং কার্যত স্বীকৃতির মধ্যে আইনগত ফলাফলের ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে। আইনগত স্বীকৃতিপ্রাপ্ত একটি সরকার সমস্ত আইনগত সুবিধা (Legal consequences) ভোগ করে। কিন্তু কার্যত স্বীকৃতি অসম্পূর্ণ প্রকৃতির হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে সীমিত অধিকার ভোগ করে।

৩. আইনগত স্বীকৃতির সরকার অন্যান্য সরকারের সাথে পূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্ক (Diplomatic Relation) স্থাপন করতে পারে। প্রশাসনিক চুক্তি করতে হলে আইনগত স্বীকৃতি দরকার। কিন্তু কার্যত স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সরকার অন্য সরকারের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে না। তবে শুধু কনস্যুলার (Consular Relation) সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। যেমন– নাগরিকদের ভিসা (VISA) প্রদান ও ব্যবসা সংক্রান্ত কাজ করতে পারে।

৪. আইনগত স্বীকৃতি প্রত্যাহার (non-withdrawable) করা যায় না। কিন্তু কার্যত স্বীকৃতি যেহেতু অস্থায়ী সেজন্যে তা প্রত্যাহার করে নেওয়া যায়।

৫. স্বীকৃতি প্রদানকারী রাষ্ট্র আইনগত স্বীকৃত রাষ্ট্রের সঙ্গে রাজনৈতিক চুক্তিসহ সকল প্রকার চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারে। পক্ষান্তরে, কার্যত স্বীকৃত রাষ্ট্র রাজনৈতিক চুক্তি সম্পাদনে অক্ষম।

৬. আইনগত স্বীকৃতিদাতা দেশের আদালতে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত রাষ্ট্র মামলা দায়ের এবং পরিচালনা করতে পারে। পক্ষান্তরে, কার্যত স্বীকৃতিদাতা দেশের আদালতে কোন প্রকার মামলা মোকদ্দমার অধিকার জন্মায় না।

৭. আইনগত স্বীকৃতিদাতা রাষ্ট্রের এখতিয়ারভুক্ত কোন এলাকায় স্বীকৃতপ্রাপ্ত রাষ্ট্রের সম্পত্তি থাকলে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত রাষ্ট্র বা সরকার তা পুনরুদ্ধারের দাবি করতে পারে। পক্ষান্তরে, কার্যত স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সরকার পূর্ববর্তী সরকারের হাতে ন্যস্ত ছিল এমন সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের দাবি করতে পারে না।

বাস্তবে, আইনগত স্বীকৃতি ও কার্যত স্বীকৃতির মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য লক্ষ্য করা হয় না। তবে এদের মধ্যে কোন বিরোধ দেখা দিলে কার্যত স্বীকৃতি retrospective ক্ষমতার বলে প্রাধান্য লাভ করে থাকে। নিম্নে কতিপয় বিখ্যাত মামলার আলোকে পার্থক্য তুলে ধরা হলো –

মামলা : Haile Selassie Vs. Cable & Wireless Co. Ltd.; হাইলে সেলাসী বনাম ক্যাবল এন্ড ওয়্যারলেস কোং লি.; (Abyssinia Vs. U.K, 1939)

এই মামলায় Haile Selassie ইথিওপিয়ার একজন সম্রাট ছিলেন। Cable & Wirelerss Co. ইথিওপিয়ার রাজকোষ হতে ঋণ গ্রহণ করে। ১৯৩৬ সালে ইতালি ইথিওপিয়া আক্রমণ করে এবং এর উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু Haile Selassie ইথিওপিয়ার সম্রাট থেকে গেলেন। উল্লেখ্য, কোম্পানিটি ছিল ব্রিটিশ কোম্পানি। অতঃপর ঋণের টাকা আদায়ের জন্য Haile Selassie উক্ত কোম্পানির বিরুদ্ধে ব্রিটিশ আদালতে মামলা দায়ের করে। বৃটেন ইতিমধ্যে ইথিওপিয়ার উপর ইতালির কর্তৃত্বকে কার্যত স্বীকৃতি প্রদান করে। একই সময়ে Haile Selassie-এর উপর আইনগত স্বীকৃতি কার্যত ছিল। কোম্পানি যুক্তি প্রদর্শন করে যে, যেহেতু ইতালি ইথিওপিয়ার উপর কতৃত্ব স্থাপন করেছে সেহেতু ঋণের টাকা পেলে ইতালি পাবে Haile Selassie নয়।

এই মামলার বিচার্য বিষয় ছিল দুইটি –

(i) দুটি স্বীকৃত সরকারের মধ্যে কোন সরকার অগ্রাধিকার পাবে?

(ii) একই সময়ে আইনগত ও কার্যত স্বীকৃতি প্রদানের ফলাফল কি হবে?

এই মামলায় নিম্ন আদালত রায় প্রদান করেন যে, Haile Selassie-ই উক্ত ঋণের টাকা পাবে কারণ সেই এখন পর্যন্ত আইনগত স্বীকৃত শাসক। কোম্পানি আপীল করে। ইতোমধ্যে বৃটেন রাজনৈতিক কারণে ইতালিকে আইনগত স্বীকৃতি প্রদান করে। এর ফলে ইংল্যান্ডের উচ্চ আদালত বলেন যে, এখন আর Haile Selassie উক্ত ঋণের টাকা দাবি করতে পারবে না।

উচ্চ আদালত বলেন যে, ইতালি নিম্ন আদালত কর্তৃক মামলার রায়ের পর ইংল্যান্ড এর নিকট থেকে আইনগত স্বীকৃতি পায় এবং Haile Selassie তার সকল প্রকার বৈধতা হারায় আপীলকারী কোম্পানির নিকট হতে ঋণের টাকা আদায়ের কারণ যেহেতু আইনগত স্বীকৃতির retrospective effect বিদ্যমান।

এই মামলা হতে একটি মূলনীতি পাওয়া যায় যে, বিরোধীয় কোন সম্পত্তি যদি বিদেশের এখতিয়ারে অবস্থিত হয় তাহলে আইনত স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সরকার উহার উপর অধিকার দাবি করতে পারে এবং স্বীকৃতি সকল সময়ই রাষ্ট্র বা সরকারের প্রতিষ্ঠালগ্নের সময় থেকেই কার্যকর হয়।

মামলা : Arantzazu Mendi Case; আরান্তজাজু মেন্ডি মামলা; (House of Lords, 1939)

এই মামলায় Arantzazu Mendi স্পেনের একটি জাহাজ ছিল যা উক্ত দেশের Bilbao নামক এলাকায় রেজিস্ট্রিভুক্ত ছিল। ১৯৩৬ সালে Spain এ গৃহযুদ্ধ শুরু হলে একদিকে Republican-রা ছিল এবং অন্যদিকে Nationalist-রা ছিল। Nationalist-রা ছিল General Franco এর অধীনে। ইংল্যান্ড প্রবাসী Republican সরকারকে Dejure বা আইনগত স্বীকৃতি প্রদান করে যেহেতু ইহা ছিল স্পেনের বৈধ সরকার। অন্যদিকে ইংল্যান্ড General Franco সরকারকে কার্যত স্বীকৃতি দেয়। সুতরাং ইংল্যান্ড এক্ষেত্রে দ্বৈত স্বীকৃতি প্রদান করেছে। General Franco ধীরে ধীরে বহু এলাকা দখল করে নেয়। তখন স্পেনের Republican সরকার এক ডিক্রির মাধ্যমে Bilbao প্রদেশের সকল রেজিস্ট্রিকৃত জাহাজকে জাতীয়করণ করে নেয়। Arantzazu Mendi জাহাজটিও ঐ প্রদেশের রেজিস্ট্রিকৃত ছিল। অনুরূপভাবে জেনারেল ফ্রাঙ্কো Bilbao প্রদেশে নির্মিত সকল প্রকার জাহাজকে তার অধীনে রাষ্ট্রায়াত্ব করার জন্য আইন পাস করল। Arantzazu Mendi জাহাজটি যখন বৃটেনে পৌছল তখন Republican সরকার বৃটেনের আদালতের নিকট গিয়ে বলল যে, বৃটেন তাদেরকে আইনগত স্বীকৃতি দিয়েছে। Arantzazu Mendi জাহাজটি তাদের সম্পত্তি। তাই জাহাজটিকে আটক করা হোক এবং তাদের হাতে হস্তান্তর করার জন্য আদেশ জারি করা হোক।

এই মামলার বিচার্য বিষয় ছিল Republican সরকার Arantzazu Mendi জাহাজটির দখলের অধিকারী হবে কি না?

ইংল্যান্ডের House of Lords, Nationalist সরকারের পক্ষে রায় প্রদান করেন। এই সিদ্ধান্তের যুক্তিতে House of Lords বলেন যে, England কর্তৃক কার্যত স্বীকৃতিপ্রাপ্ত Nationalist সরকার Spain এর একটি বিশাল এলাকা নিজ দখলে রেখেছে এবং তারা অন্য কোন সরকারের অধীনস্থ নয়। তাছাড়া বৃটিশ সরকার Spain-কে একটি বিদেশী সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে।

আলোচ্য মামলায় আইনগত ও কার্যত স্বীকৃতির মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য করা হয়নাই।

মামলা : Gdynia Ameryka Linie Vs. Boguslawski; জিনিয়া আমেরিকা লিনী বনাম বোগাজলোস্কি মামলা; (1953)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানী পোল্যান্ডকে দখল করে নেয়। পোল্যান্ডের প্রবাসী সরকার ইংল্যান্ডে আশ্রয় নিলে ইংল্যান্ড পোলিশ সরকারকে আইনগত স্বীকৃতি প্রদান করে।

১৯৪৫ সালের ৩ জুলাই যুদ্ধ শেষ হলে Polish প্রবাসী সরকার একটি আইন জারি করেন যে, যারা (নাবিক) Communist সরকারের অধীনে চাকরি করতে চাইবে না, তারা অব্যাহতি নিলে মালিক কর্তৃক ক্ষতিপূরণ লাভ করবে। এখানে উল্লেখ্য যে, ২৮ জুন ১৯৪৫ সালে পোল্যান্ডে Communist সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় যা ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক কার্যত স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৪৫ সালের ৫–৬ জুলাই মধ্যরাতে এই Communist কার্যত

স্বীকৃত সরকারকে ইংল্যান্ড আইনগত স্বীকৃতি প্রদান করে।

পরবর্তী সময়ে এই Communist সরকার পোল্যান্ড এর সকল জাহাজকে জাতীয়করণ করে। তখন Gdynia Ameryka Linie জাহাজের নাবিক Mr. Boguslawski এবং অন্যান্য নাবিকরা Communist সরকারের অধীনে চাকরি করতে অস্বীকৃতি জানায় এবং ক্ষতিপূরণ দাবি করে তাদের নিয়োগকর্তার নিকট। রাষ্ট্রীয় সরকার তখন ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে অস্বীকার করলে মামলা দায়ের করা হয়। নাবিকেরা জিতে যায় এবং নিয়োগকর্তারা আপীল দায়ের করে। এই মামলার বিচার্য বিষয় ছিল –

১. ৫ ও ৬ জুলাই তারিখের মধ্যরাতে প্রদত্ত আইনগত স্বীকৃতির ক্ষেত্রে Retrospective effect প্রযোজ্য হবে কি না? এবং উহা নাবিকদের প্রতি দায়িত্ব অস্বীকার করার বৈধতা কতটুকু?

২. জাহাজের মালিকরা নাবিকদের allowance প্রদান করতে বাধ্য কি না?

আদালত Mr. Boguslawski এর পক্ষে রায় প্রদান করেন এবং নিয়োগকর্তাকে নির্দেশ দেন তার সমস্ত ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করার জন্য। House of Lords বললেন যে, আমরা যদি স্বীকৃতির প্রথাগত পদ্ধতি অনুসরণ করি তাহলে আমরা দেখি প্রত্যেকটি স্বীকৃতির Retrospective effect বিদ্যমান। তাই ২৮ জুন হতে পোল্যান্ডের Communist সরকারের Retrospective effect রয়েছে কিন্তু যদি আমরা মানবাধিকার রক্ষা করতে চাই তাহলে অবশ্যই নাবিকদেরকে তাদের জাহাজের মালিক কর্তৃক ক্ষতিপূরণ করতে হবে। এই মামলার সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবেচনাকে আইনগত বিবেচনা অপেক্ষা বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়।

মামলা : Salimoff & Co. Vs. Standard Oil Co. of New York; সালিমফ এন্ড কোং বনাম স্ট্যান্ডার্ড তেল কোং, নিউইয়র্ক মামলা; (1933)

এই মামলায় Mr. Salimoff একজন রাশিয়ান নাগরিক। তার রাশিয়ায় একটি তেল কোম্পানি ছিল যার নাম ছিল Salimoff & Co. ১৯১৭ সালের অক্টোবরে রুশ বিপ্লবের পর রাশিয়ান সরকার সকল সম্পত্তি জাতীয়করণ করেন এবং একই সময়ে Salimoff & Co.ও জাতীয়করণ করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, বিপ্লবের পর থেকে Salimoff আমেরিকায় আশ্রয় গ্রহণ করে। পরবর্তী সময়ে নিউইয়র্কের Standard Oil Co. of NY রাশিয়ার সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে অনেক বেশি তেল কেনার জন্য। চুক্তি অনুযায়ী তেল নিউইয়র্কে পৌছলে Salimoff উক্ত তেলের মালিকানা দাবি করে মামলা দায়ের করে। তার যুক্তি হলো রাশিয়ান সরকার একটি বেআইনী ঘোষণার মাধ্যমে তার Company-কে জাতীয়করণ করেছিল। তাছাড়া আমেরিকা তখনো রাশিয়াকে কোন প্রকার স্বীকৃতি প্রদান করে নি। এই মামলার বিচার্য বিষয় ছিল–

i. Mr. Salimoff তার কোম্পানির তেল ফেরত পাবে কি না?

ii. এ মামলায় স্বীকৃতি আবশ্যকীয় কি না?

আদালত Mr. Salimoff এর দাবি অগ্রাহ্য করেন এবং বলেন যে, Standard Oil Co. রাশিয়ার নিকট থেকে তেল ক্রয় করতে পারে যদিও আমেরিকা রাশিয়াকে কোন প্রকার স্বীকৃতি প্রদান করে নি। এক্ষেত্রে আমেরিকা কর্তৃক রাশিয়াকে স্বীকৃতি প্রদান আবশ্যকীয় নয়।

আদালত তার সিদ্ধান্তের যুক্তিতে বলেন যে, যদিও আমেরিকা তখনও পর্যন্ত রাশিয়াকে স্বীকৃতি দান করে নি তথাপি রাশিয়ার অস্তিত্ব বাস্তবে বিদ্যমান ছিল যা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। তাছাড়া রাশিয়া দীর্ঘদিন যাবৎ তার রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে এতে করে উহার রাষ্ট্রত্বের শক্তি অর্জিত হয়েছে। এই কারণে আদালতের কোন এখতিয়ার নেই রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ কার্যকলাপের বৈধতা বিবেচনা করার।

স্বীকৃতির আইনগত ফলাফল ও গুরুত্ব

স্বীকৃতি হল রাষ্ট্রীয় সত্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ স্বীকৃতির মাধ্যমেই একটি নতুন রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বের মর্যাদা লাভ করে। একমাত্র স্বীকৃতির মাধ্যমেই একটি সদ্য প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র কোন পুরাতন সুপ্রতিষ্ঠিত সার্বভৌম রাষ্ট্র কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রীয় সত্তার মর্যাদা অর্জন করতে পারে। রাষ্ট্রীয় সত্তা অর্জনের ক্ষেত্রে পুরাতন সার্বভৌম রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃতি দানের বিষয়টি আন্তর্জাতিক আইনে যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে। স্বীকৃতি বলতে প্রধানত আইনগত স্বীকৃতি বুঝায়। স্বীকৃতির ফলাফল তথা যে সব কারণে কোন নব্য প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের স্বীকৃতিকে আন্তর্জাতিক আইনে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে চিহ্নিত করা হয় তা নিম্নরূপ :

১. স্বীকৃতিপ্রাপ্ত রাষ্ট্র স্বীকৃতিদানকারী রাষ্ট্রের আদালতে মামলা দায়ের করতে পারে। অর্থাৎ যে রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেয়া হয় নি, অপর রাষ্ট্রের আদালতে তার কোন মর্যাদা নেই বলে ধরে নেয়া হয়।

২. আন্তর্জাতিক আইনে Act of State Doctrine নামে একটি মতবাদের বহুল প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। Act of State Doctrine-এর অর্থ হচ্ছে সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে একটি রাষ্ট্র যে পদক্ষেপ গ্রহণ করে, অপর কোন রাষ্ট্র তার কার্যকারীতা ও বৈধতার প্রশ্ন করতে পারে না, করার ক্ষমতা রাখে না। অপর কোন রাষ্ট্র তার প্রণীত আইন বা কৃত কাজের বৈধতার প্রশ্ন তুলতে পারে না। একটি রাষ্ট্র স্বীকৃতি না পেলে Act of State Doctrine এর অধীনে কোন প্রকার immunities and privilege ভোগ করতে পারে না।

৩. স্বীকৃতি লাভের ফলে একটি নতুন রাষ্ট্র বিশ্বের অন্যান্য সার্বভৌম রাষ্ট্রের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে এবং তাদের সাথে যে কোন প্রকার সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারে।

৪. স্বীকৃতির ফলে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত রাষ্ট্রের যে সকল সম্পত্তি স্বীকৃতিদাতা রাষ্ট্রের এখতিয়ারভুক্ত এলাকায় অবস্থিত এবং যার মালিকানা স্বীকৃতিপ্রাপ্ত রাষ্ট্রের পূর্ববর্তী সরকারের হাতে ন্যস্ত ছিল, স্বীকৃতিপ্রাপ্ত রাষ্ট্র অতঃপর সেই সম্পত্তিগুলো দাবি করতে বা পুনরুদ্ধার করতে পারে।

৫. স্বীকৃতিদানের পূর্বে স্বীকৃতিদাতা রাষ্ট্র স্বীকৃতিপ্রাপ্ত রাষ্ট্রের যে সকল সম্পত্তি হস্তান্তর বা অন্যান্য লেনদেন অবৈধ বলে মনে করত, স্বীকৃতি দানের ফলে স্বীকৃতিদাতা রাষ্ট্রের আদালতের দৃষ্টিতে সেগুলো বৈধতা লাভ করে। আন্তর্জাতিক আইনে স্বীকৃতি যে কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ তা প্রখ্যাত মামলার আলোকে আলোচনা করা হলো :

মামলা : Luther Vs. Sagor; লুথার বনাম সাগর মামলা; (King's Bench Division, Court of Appeal, 1921)

এই মামলায় বাদি Luther একজন ব্রিটিশ নাগরিক। সোভিয়েত রাশিয়াতে তার ব্যক্তি মালিকানাধীন একটি যন্ত্র চালিত Timber industry ছিল। ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের পর সোভিয়েত সরকার একটি সরকারি ঘোষণা দ্বারা Luther এর কারখানাটি জাতীয়করণ করে নেয়। Luther তখন বৃটেনে চলে যান।

১৯২০ সালে সোভিয়েত রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য সংস্থা ব্রিটিশ কাঠ ব্যবসায়ী Sagor-এর সাথে কাঠ বিক্রয়ের চুক্তি করে। চুক্তি অনুযায়ী বাণিজ্য সংস্থা-এর কাঠ বৃটেনে পাঠিয়ে দেয়। কাঠগুলো বৃটেনে পৌছলে বাদি Luther আদালতে গিয়ে দাবি করল যে কাঠগুলো বৃটেনে রাশিয়া হতে এসেছে এগুলো তারই কোম্পানির কাঠ। রুশ সরকার অবৈধভাবে তার কোম্পানিকে রাষ্ট্রয়াত্ব করেছে। অতএব, তার ব্যক্তিগত মালিকানার সম্পত্তি তাকে ফেরত দেয়া হোক। তিনি আরো যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, সোভিয়েত রাশিয়াকে বৃটেন এখনো স্বীকৃতি দেয় নি। এর ফলে রাশিয়ার ঘোষণাকৃত জাতীয়করণ আইন বৃটেনে প্রযোজ্য হবে না।

এই মামলায় বৃটেনের নিম্ন আদালত উপরোক্ত যুক্তি বিবেচনা করে বাদি Luther-এর পক্ষে রায় প্রদান করেন। মামলায় বিবাদী Sagor এই রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপীল করেন। আপীল করার পর দেখা যায় যে, বৃটেন ১৯২১ সালে রাশিয়াকে কার্যত স্বীকৃতি প্রদান করেছিল। ফলে Kings Bench Division, Court of Appeal বিবাদী Sagor এর পক্ষে রায় প্রদান করে। কারণ রাশিয়াকে কার্যত স্বীকৃতি প্রদান করার পর উক্ত রাষ্ট্রের জাতীয়করণের বিপক্ষে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করার অধিকার ইংল্যান্ডের নেই। এখানেও স্বীকৃতির retrospective effect কার্যকর করা হয়েছিল।

যে সকল বিষয়ের উপর ভিত্তি করে বৃটেনের আপীল আদালত এই মামলাটির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তা নিম্নরূপ :

ক. ব্রিটিশ সরকার সোভিয়েত সরকারকে কার্যত সরকার বলে স্বীকার করে নিয়েছে;

খ. স্বীকৃতি প্রদানকারী রাষ্ট্র যে তারিখেই স্বীকৃতি প্রদান করুক না কেন তা স্বীকৃত রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে প্রদান করা হয়েছে বলে গণ্য হবে। কারণ এখানে retrospective effect প্রযোজ্য হবে।

গ. বাস্তবে কার্যত এবং আইনগত স্বীকৃতির মধ্যে কোন পার্থক্য সৃষ্টি করা হয় না।

ফলে রাশিয়ার যে আইনের মাধ্যমে Luther এর Timber Company জাতীয়করণ করা হয়েছিল সে আইনটি বৈধ ছিল। সুতরাং এখানে Luther কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ পাবে না। যেদিন থেকে সোভিয়েত রাশিয়ার অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় ধরে নেয়া হবে সেদিন থেকেই retrospective effect-এর কারণে সেখানে বৈধ আইন বলবৎ ছিল।

রাষ্ট্রীয় এখতিয়ার
State Jurisdiction

রাষ্ট্রীয় এখতিয়ার বলতে রাষ্ট্রে অবস্থিত জনগণ, সম্পদ ও ঘটনাবলীর উপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্বকে বোঝায়। রাষ্ট্রীয় এখতিয়ার রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব মূলনীতিরই এক প্রতিফলন। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক আইনে রাষ্ট্রীয় এখতিয়ার বলতে অভ্যন্তরীণ আইন বলে ব্যক্তি ও সম্পদের উপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব চর্চাকেই বোঝায়। ব্যক্তি ও সম্পত্তির উপর যে কোন ধরনের নীতি নির্ধারণ ও তা প্রয়োগের ক্ষমতাও রাষ্ট্রীয় এখতিয়ারের অন্তর্গত (Prescriptive or Legislative Jurisdiction and enforcement or Prerogative Jurisdiction) রাষ্ট্রীয় এখতিয়ার রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। সার্বভৌমত্ব একটি রাষ্ট্রের সাধারণ এবং পূর্ণাঙ্গ আইনগত ক্ষমতা বা মর্যাদার পরিচয় বহন করে। অন্যদিকে সার্বভৌম রাষ্ট্র কর্তৃক আইন প্রণয়নের, বিচার সংগঠনের ও নির্বাহী ক্ষমতা ব্যবহারের যোগ্যতাকেই রাষ্ট্রীয় এখতিয়ার বলে।

দেওয়ানী ও ফৌজদারি এখতিয়ার : সাধারণভাবে রাষ্ট্রের এখতিয়ারকে দেওয়ানী ও ফৌজদারি এই দু'ভাগে ভাগ করা যায়।

দেওয়ানী এখতিয়ার

রাষ্ট্রের দেওয়ানী এখতিয়ার অনেক সময়ই রাষ্ট্রে অবস্থিত বিদেশীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বিষয়টি আরও সুস্পষ্টভাবে প্রযোজ্য বহুজাতিক কিংবা বৈদেশিক কোম্পানির ক্ষেত্রে; এ ধরনের কোম্পানিগুলো আবাস রাষ্ট্রের দেওয়ানী আইনের এখতিয়ার ভুক্ত।

দেওয়ানী এখতিয়ার মূলত রাষ্ট্রীয় আইনের আওতাভুক্ত হলেও বিভিন্ন রাষ্ট্রের দেওয়ানী আইনের বিধানসমূহের মাঝে সংঘাত বা দ্বন্দ্ব হলে তা আন্তর্জাতিক ব্যক্তি আইন (Private International Law) দ্বারা নিরসনযোগ্য।

ফৌজদারি এখতিয়ার

প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই তার ভূ-খণ্ডে সংঘটিত অপরাধ এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের এখতিয়ার আছে; অপরাধ ও অপরাধী ব্যক্তির উপর রাষ্ট্রের এখতিয়ার সমভাবে বিদেশীদের উপরও প্রযোজ্য অর্থাৎ কোন বিদেশী নাগরিক কর্তৃক রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে কোন অপরাধ সংঘটিত হলে রাষ্ট্র সে অপরাধী ব্যক্তির বিচার সংগঠনের অধিকারী। বস্তুত রাষ্ট্রের ফৌজদারি এখতিয়ার প্রয়োগের ক্ষেত্রেই আন্তর্জাতিক আইনের বিধান অধিকতর প্রাসঙ্গিক।

এখতিয়ারগত প্রশ্নাবলী মূলত রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারা নির্ধারিত হয়। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আইনের বিধানসমূহ এখনো সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট নয়। তবে অবশ্যই রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আইনের মূল নীতিমালা ও কাঠামোর মাঝেই তার এখতিয়ার প্রয়োগ করবে। এখতিয়ার

প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক বিধি-বিধান না মানার ফলে অন্য কোন রাষ্ট্রের ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিপূরণ বা বিচার দাবি করতে পারে। অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় এখতিয়ার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আইনের সাধারণ নীতিসমূহ বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম (Practice) দ্বারাই সৃষ্ট।

রাষ্ট্রীয় এখতিয়ার নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত নীতিসমূহ অনুসরণ করা হয় :

১. ভূ-খণ্ডনীতি (Territoral Principle)

২. জাতীয়তানীতি (Nationality Principle)

৩. সংরক্ষণনীতি (Protective or Security Principle)

৪. সার্বজনীন নীতি (Universal Principle)

কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আইন ভঙ্গ হলে সে বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রীয় এখতিয়ারের প্রশ্নে মূলত ভূ-খণ্ডনীতি অনুসৃত হলেও এর অনেক ব্যতিক্রম রয়েছে। কোন ক্ষেত্রে কোন নীতি প্রযোজ্য হবে তার কোন সুনির্দিষ্ট বিধিমালা নেই। একই ইস্যুতে একই সময় একাধিক রাষ্ট্রের এখতিয়ার সৃষ্টি হতে পারে। কোন নীতি বা রাষ্ট্র সেক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে তারও কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম নেই। কোন অপরাধীর ক্ষেত্রে অবশ্য সেরকম অবস্থায় অপরাধী যে রাষ্ট্রে শারীরিকভাবে অবস্থান করবে সে রাষ্ট্রই তার বিচার করার অগ্রাধিকার পাবে। আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনে অপরাধীর বিচারের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে কথিত অপরাধীর সঙ্গে বিচারকারী রাষ্ট্র তথা এখতিয়ার প্রয়োগকারী রাষ্ট্রের একটি বাস্তব এবং সহজে প্রতীয়মান যোগসূত্র আছে কি না তা বিবেচনা করা।

ভূ-খণ্ড নীতি

এ নীতি অনুসারে ধরে নেয়া হয় রাষ্ট্রের এখতিয়ার, ভূ-খণ্ডের সাথে সমব্যাপী। রাষ্ট্রীয় ভূ-খণ্ডে সংঘঠিত যে কোন অপরাধ বা কার্যক্রমের উপর সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের পূর্ণ এখতিয়ার আছে। দায়মুক্তি ও বিশেষ সুবিধা সংক্রান্ত উল্লিখিত ব্যতিক্রম সাপেক্ষে নিজ ভূ-খণ্ডে দেশী-বিদেশী সব ব্যক্তি ও সম্পদের উপরই ভূ-খণ্ডের অধিকারী রাষ্ট্রের এখতিয়ার রয়েছে। এখতিয়ারের প্রশ্নে এই নীতিটি সর্বজন স্বীকৃত এবং এর প্রয়োগজনিত সমস্যা কম। রাষ্ট্রীয় ভূ-খণ্ড বলতে রাষ্ট্রীয় সীমানায় অবস্থিত স্থলভাগ, জলভাগ, ভূ-গর্ভ ও ভূ-খণ্ডের উপরিস্থিত বায়ুমণ্ডল। জলভাগের সম্ভাব্য অংশসমূহ হচ্ছে নদী, হ্রদ, জলাশয়, খাল, সমুদ্রের অভ্যন্তরীণ জলরাশি ও রাষ্ট্রীয় সমুদ্র। স্থলভাগ ও জলভাগের উপর নির্দিষ্ট আকাশসীমা পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলেও রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব প্রসারিত। অন্যদিকে স্থলভাগ, জলভাগের গর্ভস্থ অঞ্চলও রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের অন্তর্গত। এছাড়াও প্রথাগতভাবে আন্তর্জাতিক সীমানায় কোন রাষ্ট্রের পতাকাবাহী নৌ, আকাশ বা মহাশূন্যযান সে রাষ্ট্রের এলাকা বলে বিবেচিত। সুতরাং এসব কিছুর উপর এখতিয়ার রাষ্ট্রের।

প্রথাগতভাবে জাহাজের উপর এখতিয়ার পতাকাবাহী রাষ্ট্রের কিন্তু যদি এ জাহাজ কর্তৃক এমন কোন কাজ সংগঠিত হয়, যাতে উপকূলের শান্তি, নিরাপত্তা, আইন শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়

তবে সেক্ষেত্রে উক্ত জাহাজ বা সংগঠিত ঘটনাটির উপর বন্দর রাষ্ট্র এখতিয়ার চর্চা করতে পারে।

মামলা : Fijens Case or Wildenhus Case; ফিজেন্স মামলা অথবা ওয়াইলডেনহাস মামলা; (U.S.C., 1887)

মামলাটিতে পক্ষভুক্ত ছিল বেলজিয়াম ও যুক্তরাষ্ট্র। 'নূরল্যান্ড' নামক বেলজিয়ামের একটি জাহাজে Mr. Wildenhus ছিলেন নাবিক, তিনি Fijen নামক আরেকজন নাবিককে জাহাজের মাঝে হত্যা করেন। জাহাজটি তখন নিউজার্সি বন্দরে নোঙ্গর করা ছিল। যুক্তরাষ্ট্রের আদালত Wildenhus-কে দোষী সাব্যস্ত করলেন। নিউজার্সির পুলিশ বাহিনী Mr. Wildenhus-কে গ্রেফতার করল এবং জাহাজটি আটক করল।

Mr. Charies Mali তখন নিউইয়র্কে বেলজিয়ামের কনস্যুল নিযুক্ত ছিলেন। তিনি রীট অব হেবিয়াস কর্পাস এর আবেদন জানালেন এবং যুক্তি উপস্থাপন করলেন যে আন্তর্জাতিক আইন এবং বেলজিয়াম ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি (Belgiam-US Consular Convention of 1880, Act 11) উভয় অনুযায়ী কেবলমাত্র পতাকাবাহী রাষ্ট্রেরই অপরাধটি আমলে আনার এখতিয়ার রয়েছে। অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের অপরাধটি আমলে নেবার কোন এখতিয়ার নেই। তখন মামলার বিচার্য বিষয় নির্ধারিত হল; যুক্তরাষ্ট্রের বন্দরে নোঙর কৃত বেলজিয়ামের পতাকাবাহী জাহাজে সংঘটিত অপরাধ আমলে নেবার কোন এখতিয়ার যুক্তরাষ্ট্রের আছে কি না? মামলার সিদ্ধান্তে আদালত রায় প্রদান করল যে, যুক্তরাষ্ট্র ঘটনাটির বিচার করতে পারে। যদিও প্রথাগতভাবে জাহাজে সংঘঠিত কোন ঘটনার উপর সম্পূর্ণ এখতিয়ার পতাকাবাহী রাষ্ট্রের তথাপি যদি দেখা যায় এরূপ নোঙরকৃত জাহাজে সংঘঠিত কোন অপরাধ বন্দর রাষ্ট্রের শান্তি, নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলার বিঘ্ন ঘটাচ্ছে তবে উক্ত ঘটনার উপর বন্দর রাষ্ট্রের এখতিয়ার আছে।

সিদ্ধান্তটিতে ভাবগত ভূ-খণ্ডনীতির একটা বহিঃপ্রকাশ ঘটে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন, ভূ-খণ্ডের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের এখতিয়ার স্বীকার করে নেয়া সত্ত্বেও এ এখতিয়ার দু'ভাগে উদ্ভূত হতে পারে বলে অনেক দেশ দাবি করে এবং এর ভিত্তিতে দু'ধরনের ভূ-খণ্ড নীতির উদ্ভব হয়েছে।

প্রথমত : বস্তুগত ভূ-খণ্ডনীতি (Subjective Territorial Principle)

দ্বিতীয়ত : ভাবগত ভূ-খণ্ডনীতি (Objective Territorial Principle)

একটি উদাহরণের মাধ্যমে এ দুটো নীতি বোঝান সম্ভব, যেমন- কোন অপরাধ সংঘটন প্রক্রিয়া এক রাষ্ট্রে আরম্ভ হয়ে অন্য রাষ্ট্রে শেষ হতে পারে। ধরা যাক, কোন ব্যক্তি এক রাষ্ট্রের ভূ-খণ্ড হতে সীমানার অপরপারে গুলিবর্ষণ করে এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রের কেউ আহত বা নিহত হয়, তখন অপরাধীর বিচারের এখতিয়ার কোন রাষ্ট্রের?

ভূ-খণ্ড নীতি অনুসারে এক্ষেত্রে দুই রাষ্ট্রেরই এখতিয়ার থাকবে। তবে প্রথম রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি এখতিয়ার উদ্ভব হয়েছে ভাবগত ভূ-খণ্ড নীতি (Subjective Territorial Principle) হতে এবং দ্বিতীয় রাষ্ট্রের এখতিয়ার হচ্ছে বস্তুগত ভূ-খণ্ড নীতির (Objective Territorial Principle) ফল। দুই রাষ্ট্রই বৈধভাবে এখতিয়ার দাবি করতে পারে। তবে এ ধরনের ক্ষেত্রে অপরাধী যে রাষ্ট্রের হেফাজতে থাকে সে রাষ্ট্রই এখতিয়ার প্রয়োগ করে থাকে।

১৯২৭ সালে স্থায়ী আন্তর্জাতিক আদালত (PCIJ) কর্তৃক মীমাংসাকৃত **লোটাস মামলায়** বস্তুগত ভূ-খণ্ড নীতিটি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। মামলার বিবরণে দেখা যায়; উন্মুক্ত সমুদ্রে ফরাসি স্টীমার ও তুর্কী মালবাহী জাহাজের মধ্যে সংঘর্ষে তুর্কী জাহাজটি নিমজ্জিত হয় এবং জাহাজের ৮ জন নাবিক ও যাত্রীরা প্রাণ হারান। ফরাসি জাহাজটি তুর্কী বন্দরে ভিড়ার পর কর্তৃপক্ষ সংঘর্ষের সময় কর্তব্যরত জাহাজের সংশ্লিষ্ট ফরাসি কর্মকর্তাদের গ্রেফতার ও পরে বিচার করে শাস্তি প্রদান করে। ফরাসি কর্তৃপক্ষ তুর্কী কর্তৃপক্ষের এখতিয়ার চ্যালেঞ্জ করলে বিষয়টি স্থায়ী আন্তর্জাতিক আদালতে প্রেরণ করা হয়। আদালত সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে এ মর্মে রায় প্রদান করেন যে, উল্লিখিত ক্ষেত্রে তুর্কী এখতিয়ার আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী নয়, কারণ উন্মুক্ত সমুদ্রে তুর্কী জাহাজ তুর্কী ভূ-খণ্ডের সমতুল্য। ফরাসি জাহাজের ফরাসি কর্মকর্তাগণ দায়ি হলেও, যাদের উপর অবশ্যই ফরাসি এখতিয়ার রয়েছে, তার সরাসরি প্রভাব পড়েছে তুর্কী জাহাজ অর্থাৎ তুর্কী ভূ-খণ্ডের উপর। বস্তুগত ভূ-খণ্ড নীতি অনুসারে তুর্কী কর্তৃপক্ষের অবশ্যই ফরাসি নাবিকদের বিচার করার অধিকার রয়েছে।

এক্ষেত্রে একটা বিষয় উল্লেখ করা অত্যন্ত প্রয়োজন যে যদিও সবদেশই বিভিন্ন নীতির আশ্রয়ে রাষ্ট্রীয় এখতিয়ার বৃদ্ধির পক্ষপাতি এবং এ কারণেই Objective Territorial Principle এর সমর্থনও পাওয়া যায় কিন্তু আমাদের মত দরিদ্র রাষ্ট্রগুলোর জন্য Objective Territorial Principle টি বেশ ঝুঁকিপূর্ণ, কেননা বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর একেকটি, একাই আমাদের মত বহু দরিদ্র রাষ্ট্র হতে অনেক বেশি ক্ষমতাশালী। এমনই একেকটি কোম্পানি, দরিদ্র দেশগুলোতে ব্যবসা কেন্দ্র খুলতে পারে, আবার বিনিয়োগের ফলে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের সংকট উদ্ভব হলে বিষয়টিকে Objective Territorial Principle অনুসরণ করে উন্নত দেশের আদালতে নির্ধারণ করার সুযোগ পাচ্ছে। অর্থাৎ যুক্তি দেখাতে পারছে যে; আমাদের রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম এর ফলাফল যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসার প্রভাব ফেলছে বলে বিষয়সমূহ বিচারে বা মীমাংসার এখতিয়ার তাদের এবং এভাবে দরিদ্র রাষ্ট্রগুলোকে আরো অসহায় ও কোণঠাসা করে ফেলা সম্ভব।

অবশ্য পরবর্তীতে অর্থাৎ ১৯৫৮ সালের High Sea Convention এর অনুচ্ছেদ ১১ (১) এর মাধ্যমে লোটাস মামলার রায়টিকে অগ্রাহ্য করা হয় এবং পূর্বোক্ত নীতি অর্থাৎ উন্মুক্ত সমুদ্রে অবস্থিত জাহাজে কোন ঘটনা সংঘটিত হলে কেবল পতাকাবাহী রাষ্ট্রেরই যে ঘটনার উপর এখতিয়ার আছে এ নীতিটি পুনর্বহাল করা হয়।

জাতীয়তানীতি (Nationality Principle)

অনেক সময় ব্যক্তির সাথে রাষ্ট্রের যোগসূত্র বিবেচনা করে ব্যক্তির উপর কোন রাষ্ট্রের এখতিয়ার আছে তা নির্ধারণ করা হয়। ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মধ্যকার যোগসূত্র আন্তর্জাতিক আইনে জাতীয়তা বলে স্বীকৃত, আবার জাতীয়তা ছাড়াও কোন রাষ্ট্রে বসবাসের কারণে সে রাষ্ট্রের সাথে ব্যক্তির একটা যোগসূত্র স্থাপিত হয়। অর্থাৎ জাতীয়তানীতি অনুসরণ করলে কোন ব্যক্তির উপর সর্বদাই তার নিজ রাষ্ট্রের এখতিয়ার থাকবে, সে যে দেশেই থাকুক না কেন, আবার অনেক ক্ষেত্রে মনে করা হয় ব্যক্তি মূলত যে রাষ্ট্রে অবস্থান করছে ক্ষণকালের জন্য হলেও ব্যক্তির উপর সে রাষ্ট্রের এখতিয়ার বর্তমান।

সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের প্রতি আনুগত্য জাতীয়তা ও রাষ্ট্রীয় এখতিয়ার নির্ধারণের একটি প্রধান ভিত্তি এবং এটি সাধারণভাবে স্বীকৃত। অপরাধ যে রাষ্ট্রেই সংঘটিত হোক না কেন, অপরাধী যে রাষ্ট্রের জাতীয়তাভুক্ত এই নীতি অনুসারে সে রাষ্ট্রই অপরাধীর বিচার করবে। এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে রাষ্ট্রে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে সে রাষ্ট্র তার বিচার করতে পারবে না। ভূ-খণ্ড নীতি ও জাতীয়তানীতির সমান্তরাল প্রয়োগ এবং অনেক ক্ষেত্রে একজনের দ্বৈত বা আরো বেশি জাতীয়তার ফলে একই অপরাধের উপর একই সময় একাধিক রাষ্ট্রের এখতিয়ার সৃষ্টি হতে পারে। এর ফলে অপরাধী দ্বৈত বিপদের সম্মুখীন হতে পারে। তাই অনেক রাষ্ট্রে বিশেষ করে কমন ল'রাষ্ট্রে এই নীতিটির প্রয়োগ বড় ধরনের অপরাধ, যেমন– খুন, দেশদ্রোহীতা একাধিক বিবাহ, মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত অপরাধ ইত্যাদি ক্ষেত্রেই সীমিত রাখা হয়। এই নীতিটি সিভিল ল' ভুক্ত রাষ্ট্রে বেশি অনুসরণ করা হয়। এ পন্থায় এখতিয়ার চর্চাকে **Personal Jurisdiction** বা ব্যক্তির উপর এখতিয়ার বলা যায়।

ব্যক্তিকে মাধ্যমরূপে বিবেচনা করে রাষ্ট্রের এখতিয়ার চর্চা আবার দু'ভাবে হতে পারে। আন্তর্জাতিক আইনে এ দুটো কৌশল দুটো নীতি হিসেবে পরিচিত।

এক. **Active Nationality Principle** (সক্রিয় জাতীয়তানীতি অর্থাৎ অপরাধী যে রাষ্ট্রের জাতীয়তাভুক্ত তারাই বিষয়টির বিচার করবে। এ নীতিটি নিয়ে আন্তর্জাতিক আইনে তেমন মত পার্থক্য নেই, মত পার্থক্য দেখা যায় দ্বিতীয় নীতিটি নিয়ে, অর্থাৎ **Passive Nationality Principle** (নিষ্ক্রিয় জাতীয়তা/ নিষ্ক্রিয় ব্যক্তি নীতি) নিয়ে, এ নীতি অনুযায়ী যে ব্যক্তি অপরাধের শিকার তার জাতীয়তাই রাষ্ট্রীয় এখতিয়ার নির্ধারণ করবে, অর্থাৎ অপরাধ যেখানেই সংগঠিত হোক না কেন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি যে রাষ্ট্রের নাগরিক সেই রাষ্ট্রই অপরাধের বিচার করার অধিকারী। এই নীতির অধীন কোন রাষ্ট্র তার ভূ-খণ্ডের বাইরে বিদেশী নাগরিকের উপর এখতিয়ার প্রয়োগ করতে পারবে যদি সেই বিদেশীর কার্যক্রম তার নিজস্ব নাগরিকের স্বার্থের পরিপন্থী হয়।

এ নীতির অনুসরণের একটি বিখ্যাত মামলা হচ্ছে Cutting Case (1886). এ মামলাটির কারণে Passive Nationality Principle এর ধারণার ব্যাপক প্রসার ঘটে। ধারণাটি তুলে ধরে মেক্সিকো।

মামলা : Cutting Case; কাটিং মামলা; (1886)

Mr. Cutting নামক একজন আমেরিকান ব্যক্তি টেক্সাসে মুদ্রিত এক স্থানীয় পত্রিকায় মেক্সিকান এক নাগরিকের বিরুদ্ধে অবমাননামূলক বক্তব্য প্রচার করেন, পত্রিকাটির কিছু কপি মেক্সিকোতে চলে আসে এবং কিছু মেক্সিকান নাগরিক সেটা দেখতে পান। প্রকাশিত বক্তব্যটি মেক্সিকান দণ্ডবিধির ১৮৪ ধারা মতে অপরাধ হওয়ায়, কিছুদিন পর যখন Mr. Cutting মেক্সিকোতে ছুটি উদ্‌যাপনে যান, মেক্সিকো পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে।

যুক্তরাষ্ট্র যুক্তি প্রদর্শন করে যেহেতু Mr. Cutting তাদের নাগরিক তাই মেক্সিকোর কোন এখতিয়ার নেই তার বিচার করার। কিন্তু মেক্সিকো যুক্তি প্রদর্শন করে, যেহেতু Mr. Cutting এর প্রকাশিত বক্তব্য মেক্সিকান নাগরিককে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে তাই Passive Nationality Principle অর্থাৎ যে নীতি অনুসারে যে ব্যক্তি অপরাধের শিকার তার জাতীয়তাই রাষ্ট্রীয় এখতিয়ার নির্ধারণ করবে, সে নীতি অনুসারে মেক্সিকো অবশ্যই Mr. Cutting এর বিচার করার এখতিয়ার রাখে।

যুক্তরাষ্ট্র এ নীতির তীব্র বিরোধিতা করে। মামলাটির ফলাফল কি হয় তা জানার অবকাশ নেই, কেননা ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ পরে অভিযোগ তুলে নেওয়ায় মামলাটির কোন সফল সমাপ্তি ঘটে নি। তবে মামলাটি Passive Nationality Principle-এর প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাবের ঐতিহাসিক স্বাক্ষর। প্রায় একশত বছর পর আরেকটি মোকদ্দমার উদ্ভব ঘটে, মোকদ্দমাটি হচ্ছে *USA VS. Yunis* (1988).

মামলা : USA Vs. Yunis; আমেরিকা বনাম ইউনুছ; (1988)

মামলাটিতে লেবানন, যুক্তরাষ্ট্র ও জর্ডান তিনটি দেশই জড়িয়ে যায়। মামলাটির ঘটনা ছিল যে, Mr. Yunis নামক লেবাননের এক নাগরিক মধ্যপ্রাচ্যে জর্ডানের এক বিমান ছিনতাই করে। বহুদিন পর Mr. Yunis যখন যুক্তরাষ্ট্রে আসেন তখন যুক্তরাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ তাকে গ্রেফতার করেন এবং বিমান ছিনতাই এর জন্য তার বিচার কার্য আরম্ভ করে। Mr. Yunis যুক্তি দেখায় যে বিমানটি যেহেতু জর্ডানের ছিল সুতরাং Passive Nationality Principle বিবেচনা করলেও কেবল জর্ডানেরই তার বিরুদ্ধে বিচার কার্যক্রম গ্রহণ করার এখতিয়ার আছে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের তরফ থেকে যুক্তি উত্থাপন করা হয় যে যেহেতু বিমানের কয়েকজন যাত্রী ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক এবং বিমান ছিনতাই এর ঘটনায় তারা ভীষণভাবে মানসিক ক্ষতির শিকার হয়েছে তাই যুক্তরাষ্ট্রেরও এখতিয়ার আছে Mr. Yunis এর বিচার করার।

অতঃপর যুক্তরাষ্ট্রের আদালত Mr. Yunis-কে শাস্তি প্রদান করে। লক্ষ্যণীয় যে, মাত্র একশত বছর সময়ের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র কিভাবে পূর্বোক্ত নীতি হতে সরে পরবর্তী নীতি গ্রহণ করছে। একশ বছর আগে যে দেশটি Passive Nationality Principle-এর ব্যাপক সমালোচনা করেছে-এর একশ বছর পরে সে দেশ Passive Nationality Principle

ভিত্তিতে এখতিয়ার বৃদ্ধির জন্য যুক্তি প্রদর্শন করছে যে, 'এই নীতির সাধারণ গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও আন্তর্জাতিক আইনে এটির বৈধতা অস্বীকৃত নয়।'

মূলতঃ শক্তিশালী দেশগুলো সময় সময় সুবিধানুসারে Active Nationality Principle এবং Passive Nationality Principle যে কোনটি গ্রহণ করছে- এরই এক প্রকৃষ্ট উদাহারণ পাওয়া যাবে, *Bhopal Case*।

মামলা : Govt. of India Vs. U.C.C. (Bhopal) Corp; ভারত সরকার বনাম ইউ.সি.সি. (ভোপাল) কর্পো.; (1987)

মামলাটিকে বিবেচনা করলে দেখা যায়, Union Carbide Corporation (U.C.C.) একটি বহুজাতিক কোম্পানি এবং এর সদর দফতর ছিল যুক্তরাষ্ট্রে। ভারতের ভূপালে এদের শাখা কোম্পানি ছিল, যারাই মূলত ১৯৮৪ সালে ভূপাল গ্যাস বিস্ফোরণের জন্য দায়ী। তাদের অবহেলার কারণেই গ্যাস লিক্ করে যে বিস্ফোরণ ঘটে তাতে প্রায় সহস্র লোক মৃত্যুবরণ করে এবং বহুলোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বিস্ফোরণটি এতই ভয়ঙ্কর ছিল যে ভারত সরকার ক্ষতিগ্রস্তদের দাবি নিজের দাবি হিসেবে গণ্য করে Bhopal Gas Leak Disater (Processing of Claims) Act, 1985 নামে একটা আইন পাস করে। উক্ত আইনের অধীনে ভারত তার নাগরিকদের পক্ষ হতে ক্ষতিপূরণ দাবি করে South District Court এর বিচারক John F. Keenan এর আদালতে U.C.C-এর বিরুদ্ধে ১৯৮৫ সালের ৮ই এপ্রিল একটি মোকদ্দমা দায়ের করেন। যুক্তরাষ্ট্রের আদালতে মামলা দায়ের করার পেছনে একটা মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় মানুষগুলোর জন্য কিছুটা বেশি ক্ষতিপূরণ আদায়। কিন্তু John F. Keenan রায় দেন যে যুক্তরাষ্ট্রের আদালত মোকদ্দমা দায়েরের সঠিক স্থান নয় বরং যেহেতু ভূপালে ঘটনাটি সম্পর্কে বেশি সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত করা সম্ভব সুতরাং ভূপাল কোর্টই (ভারতীয় আদালত) মামলাটি দায়ের করার সঠিক স্থান।

অতঃপর মামলাটি ভূপাল কোর্ট-এ দায়ের করা হলো এবং কোর্ট ৩৯০০ কোটি রূপি ক্ষতিপূরণের রায় ছিল। উক্ত রায়ের ভিত্তিতে ভূপাল জেলা আদালত U.C.C কে ৩৫০ কোটি রূপি জামানত রাখার জন্য একটি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ দিল। U.C.C এ আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট এ আপীল করলো, হাইকোর্ট অর্থের পরিমাণ কমিয়ে ২৫০ কোটি রূপি ধার্য্য করলো।

U.C.C আবারো সুপ্রীম কোর্ট এ আপীল করলো, সুপ্রীম কোর্ট অতঃপর U.C.C কে মাত্র ৪৭০ মিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে সমস্ত দাবি দাওয়া সমন্বয় করার অনুমতি দিয়ে দিল।

অর্থাৎ এ মামলায় একটা ব্যাপার স্পষ্ট হলো যে যুক্তরাষ্ট্র এমন একটি রাষ্ট্র যে শুরু থেকেই Active Nationality Principle অনুসরণ করে আসছিল তারাই আবার সুবিধানুসারে রাষ্ট্রীয় এখতিয়ারের এ নীতিকে উপেক্ষা করছে।

সুতরাং সহজেই অনুমেয়, নীতি দুটির মধ্যে সুবিধানুসারে বাছাই করে নেবার স্বাধীনতা থাকায় নীতিগুলোর অপব্যবহারের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে যোগাযোগ ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বৃদ্ধির পরিস্থিতিতে এবং আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস ও অন্যান্য অপরাধ বৃদ্ধির কারণে ঐতিহ্যগতভাবে Passive Nationality Principle এর প্রতি নেতিবাচক মনোভাব পোষণকারী যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যেও নীতিটির আশ্রয়গ্রহণের প্রবণতা লক্ষণীয়। বস্তুত সাম্প্রতিককালে এ নীতিটির উদ্যোক্তা রাষ্ট্র হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রই বেশি সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। ১৯৮৬ সালে যুক্তরাষ্ট্র যে Omnibus Diplomatic Security and Anti-Terronism Act পাস করেছে তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে তার কোন নাগরিক হত্যা ও শারীরিক নির্যাতনের শিকার হলে যুক্তরাষ্ট্র এখতিয়ার প্রয়োগ করতে পারবে। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস ও বিমান হাইজ্যাকের ঘটনায় মার্কিন নাগরিক শিকারে পরিণত হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্র একাধিকবার নীতিটির আশ্রয়গ্রহণ করেছে। আন্তর্জাতিক অপরাধ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলেই নীতিটির প্রয়োগ বৃদ্ধি পাচ্ছে, যদিও এর অপপ্রয়োগের সুযোগও সৃষ্টি হচ্ছে।

সংরক্ষণ নীতি (Protective Principle)

এই নীতির ভিত্তিতে কোন রাষ্ট্র একজন বিদেশী কর্তৃক বিদেশে সংঘটিত অপরাধের ক্ষেত্রে এখতিয়ার প্রয়োগ করতে পারে, যদি অপরাধমূলক কাজটি সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর হয় বা তার নিরাপত্তার জন্য হুমকি সৃষ্টি করে **Joyce V Director of Public Prosecution (1946)** মামলা, যে মামলাটির আবার **Lord Haw-Haw Case** নামে পরিচিত, সে মামলাতে এ নীতিটি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

মামলা : Lord Haw-Haw Case; লর্ড হ-হ মামলা; (Joyce Vs. Director of Public Prosecution, 1946)

Joyce ছিলেন আইরিশ পিতামাতার সন্তান, ১৯০৬ সালে Joyce ইংল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন। তিন বছর বয়সে তারা আয়ারল্যান্ডে চলে যান এবং ১৯২১ সাল পর্যন্ত সেখানেই বসবাস করেন। ১৯৩৩ সালের ৪ জুলাই তিনি ব্রিটিশ পাসপোর্ট এর জন্য আবেদন করেন এবং সেখানে মিথ্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি জন্মসূত্রে ব্রিটিশ নাগরিক এবং Galway-তে তার জন্ম। অতঃপর তিনি ব্রিটিশ পাসপোর্ট পান এবং ১৯৩৮ ও ১৯৩৯ সালে দু'বার এ পাসপোর্ট নবায়ন করেন। এরপর তিনি জার্মানিতে চলে যান এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান রেডিওতে Lord Haw Haw নামে ইংরেজিতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালান।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে Joyce কে ব্রিটিশ বাহিনী জার্মানিতে খুঁজে পেয়ে গ্রেফতার করে। তার কাছে প্রাপ্ত কাগজপত্রে লেখা ছিল যে তিনি জার্মান রেডিওতে একজন ইংরেজি সংবাদ পাঠক। কাগজপত্রে আরো লেখা ছিল যে, তিনি ব্রিটিশ নাগরিক এবং ১৯৪০ সালে জার্মান নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করেছেন। Joyce দাবি করেন যে তিনি জার্মান

নাগরিক। কিন্তু এর স্বপক্ষে কোন প্রমাণাদি খুঁজে পাওয়া যায় নি। তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হয়।

প্রাথমিক পর্যায়ে আদালত তাকে দোষি সাব্যস্ত করে রায় প্রদান করেন। অতঃপর ফৌজদারি আপীল আদালতে তিনি আপীল করেন। সেখানেও একই রায় বহাল থাকায় মামলাটি শেষ পর্যন্ত House of Lords এ পৌছে। House of Lords এ বিচার্য বিষয় ছিল –

প্রথমত : ব্রিটিশ আইনে অপরাধ হিসেবে বিবেচ্য কোন কাজ ব্রিটিশ ভূ-খণ্ডের বাইরে কোন বিদেশী কর্তৃক সংঘটিত হলে সে অপরাধের বিচার করার কোন এখতিয়ার ব্রিটিশ আদালতের আছে কি না?

দ্বিতীয়ত : ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ থেকে ২৫ জুলাই ১৯৪০ সাল পর্যন্ত সমকালের মধ্যে Joyce ব্রিটেনের আনুগত্য স্বীকার করতো কি না?

সমস্ত বিষয় বিবেচনা করে House of Lordsও নিম্ন আদালতের সিদ্ধান্ত বহাল রাখে। Lord Jowitt L.C. তার সিদ্ধান্তের পেছনে যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, আপীলকারী বহুদিন ইংল্যান্ডে ছিলেন এবং ইংল্যান্ডের সাথে দৃশ্যতই তার বহু যোগসূত্র বিদ্যমান। আপীলকারীর ইংল্যান্ডে ফিরে আসার পরিকল্পনা আছে কি নেই সে বিষয়টা মুখ্য নয়; মুখ্য বিষয় হচ্ছে, সে বহুদিন যাবৎ এখানে ছিল এবং পাসপোর্ট এর জন্য আবেদন করে তা অর্জন করেছে এবং পরবর্তীতে দেশত্যাগ করে রাষ্ট্রের শত্রুর সাথে হাত মিলিয়েছে।

আইনে রাষ্ট্রদ্রোহিতার যে সংজ্ঞা দেয়া আছে তাতে রাষ্ট্রদ্রোহিতা রাজ্যের অভ্যন্তরে কিংবা বাইরে উভয় স্থানেই ঘটতে পারে। রাষ্ট্রদ্রোহিতা অপরাধটি দেশের আইনে সাধারণভাবেই ব্যক্ত আছে এবং কার কার দ্বারা এই অপরাধ সংগঠন সম্ভব তা উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং রাষ্ট্রের বাইরে সংঘটিত অপরাধটি রাষ্ট্রদ্রোহিতা বলে গণ্য হবে কি না, এ চিন্তা করে অপরাধের ব্যাপ্তিকে সীমিত করার কোন অবকাশ নেই। সুতরাং রাষ্ট্রের অভ্যন্তর থেকেই হোক কিংবা বাইরে থেকে, যেখান থেকেই হোক না কেন রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধ যেই করুক, অত্র আইন অনুসারে সে দোষি সাব্যস্ত হবে।

এ নীতিটি সাধারণভাবে স্বীকৃত হলেও এর প্রয়োগজনিত সমস্যা অনেক। 'নিরাপত্তা' বা 'রাষ্ট্রীয় স্বার্থ' এর ইচ্ছা মাফিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে এই নীতিটির অপব্যবহারের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। এ নীতির শিথিল ব্যাখ্যায় গোটা সরকার বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে। তবুও বলা যায়, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য অন্য রাষ্ট্রের ভূ-খণ্ড হতে পরিচালিত অন্তর্ঘাতমূলক কার্যক্রমের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার অধিকার প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই স্বাভাবিক অধিকার। সরকার উৎখাতের প্রচেষ্টা, গুপ্তচর বৃত্তি, মুদ্রা জালকরণ, অর্থনৈতিক বা পরিবেশ অন্তর্ঘাত ইত্যাদির ক্ষেত্রে রাষ্ট্র অবশ্যই এই নীতির ভিত্তিতে এখতিয়ার প্রয়োগ করতে পারবে।

সার্বজনীনতা নীতি (Universal Principle)

কিছু অপরাধ আছে যার উপর সব রাষ্ট্রই সমভাবে এখতিয়ার প্রয়োগ করতে পারে। এই অপরাধসমূহ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বিধায় এগুলোকে আন্তর্জাতিক অপরাধ বলেও আখ্যায়িত করা যায়।

অপরাধ আন্তর্জাতিক বলেই এখতিয়ার প্রয়োগের ভিত্তি সার্বজনীন অর্থাৎ যে কোন রাষ্ট্র ভূ-খণ্ড বা জাতীয়তা নিরপেক্ষভাবে এখতিয়ার প্রয়োগ করতে পারে। এ ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রেই ব্যক্তি সরাসরি আন্তর্জাতিক আইনের অন্তর্ভুক্ত বা সাবজেক্ট হতে পারে। প্রচলিত আইনে এই ধরনের সবচেয়ে স্বীকৃত অপরাধ হচ্ছে জলদস্যুতা। জলদস্যুরা মানব জাতির শত্রু (Hostis humanis generis) বলে পরিগণিত। যুদ্ধ অপরাধ ও গণহত্যা সার্বজনীন নীতির অন্তর্ভুক্ত। এ ধরনের অপরাধ সংক্রান্ত বিধি-বিধানও প্রত্যক্ষ আন্তর্জাতিক আইনের (Positive International Law) এর বিধিতে পরিণত হয়েছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জার্মান যুদ্ধ অপরাধীদের বিচারের জন্য গঠিত নুরেমবার্গ সামরিক ট্রাইবুনালের সনদ তিনটি বিশেষ অপরাধ চিহ্নিত করে। এগুলো হচ্ছে: (১) শান্তির বিরুদ্ধে অপরাধ, (২) যুদ্ধ সংক্রান্ত আইন ও প্রথা লঙ্ঘনের অপরাধ এবং (৩) মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ। এ সমস্ত অপরাধের জন্য অধিকাংশ অভিযুক্ত ব্যক্তি ট্রাইবুনাল কর্তৃক অপরাধী বলে প্রমাণিত হয় এবং উপযুক্ত দণ্ড ভোগ করে। ট্রাইবুনালের সনদ ও প্রদত্ত রায় আন্তর্জাতিক আইনের বিধান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। উল্লেখিত অপরাধের জন্য যে কোন রাষ্ট্রের আদালত অন্য রাষ্ট্রের অপরাধীকে বিচার করার অধিকারী।

গণহত্যাও সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত একটি অপরাধ। **১৯৪৮ সালের গণহত্যা প্রতিরোধ ও গণহত্যার জন্য শাস্তি সংক্রান্ত কনভেনশনে** এ বিষয়ে বিশদ উল্লেখ রয়েছে। ১৯৭১ সালে তৎকালীন পাকিস্তান সামরিক বাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশে সংঘটিত গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধের কোন বিচার করা সম্ভবপর হয় নি। তবে বিষয়টি নিষ্পত্তি হয়ে গেছে এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সঠিক নয়। উল্লেখ্য, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও শাস্তির প্রক্রিয়া এখনো চলছে। গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধের বিচারের মেয়াদ কখনো তামাদি হয় না। কোন রাষ্ট্র যদি গণহত্যার ইন্ধন যোগায়, সরাসরি অংশগ্রহণ করে অথবা গণহত্যা নিরোধ বা অপরাধীদের শাস্তি প্রদানে ব্যর্থ হয় তাহলে সে রাষ্ট্র অবশ্যই আন্তর্জাতিক আইনে দোষি সাব্যস্ত হবে এবং সে মোতাবেক দায়-দায়িত্ব বহন করতে বাধ্য। তাই বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের সময় সংঘটিত যুদ্ধাপরাধের জন্য বিশ্বের যে কোন রাষ্ট্র যে কোন সময় অভিযুক্তদের বিচারের ব্যবস্থা করতে পারে।

সার্বজনীনতা নীতি প্রয়োগ করে যুদ্ধাপরাধী বিচারে এক উল্লেখযোগ্য মামলা হচ্ছে **Attorney General of the Government of Israel Vs. Eichmann (1961).**

মামলা : Attorney General of the Government of Israel Vs. Eichmann; এটর্নী জেনারেল ইসরাইল সরকার বনাম আইখ্‌ম্যান মামলা; (1961)

Eichman জার্মানিতে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতামাতা উভয়ই জাতিতে ছিলেন জার্মান। তিনি জার্মান Gestapo অফিসের প্রধান ছিলেন। তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময় 'The Final Solution' নামক ঘৃণ্যনীতির (যা আনুমানিক ৪২,০০০০০- ৪৬,০০০০০ ইউরোপীয় ইহুদি ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ) কার্য পরিচালক ছিলেন। যুদ্ধ শেষ হলে তিনি জার্মানি ছেড়ে পালিয়ে যান এবং ছদ্মবেশে ইউরোপের বহু দেশ ঘুরে বেড়ান। শেষপর্যন্ত তিনি রিফিউজির মিথ্যা পরিচয়ে রেডক্রসের দেয়া এক পাসপোর্ট নিয়ে আর্জেন্টিনায় প্রবেশ করেন। পাসপোর্ট-এ তিনি তার পরিচয় দেয় Ricardo Klement নামে। তিনি ইতোমধ্যে প্লাস্টিক সার্জারী করে নিজের চেহারাও পরিবর্তন করে ফেলেন। স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলা আয়ত্ব করেন এবং কৃষিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। কিন্তু ১৯৬০ সালে ইসরাইলি গুপ্তচররা (Mossad এজেন্ট) তাকে খুঁজে বের করে ফেলে এবং অপহরণ করে, অর্থাৎ আর্জেন্টিনার সরকারকে না জানিয়েই বাক্সবন্দি অবস্থায় তাকে ইসরাইল নিয়ে আসে। সে সময় আর্জেন্টিনা ও ইসরাইলের মধ্যে বন্দি সমর্পণেরও কোন চুক্তি ছিল না। অন্যদিকে ইসরাইলে যুদ্ধাপরাধ ও ইহুদিদের বিরুদ্ধে অপরাধ সংগঠনের কারণে Israeli Nazi and Nazi Collaborators (Punishment) Law of 1951 এর আওতায় Eichmann এর বিচার শুরু হয়ে গেল।

বিচারে Eichmann দোষী সাব্যস্ত হলো এবং তার মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষিত হল। অতঃপর তিনি ইসরাইলি সুপ্রীম কোর্ট এ আপীল করলেন। সেখানেও একই রায় বহাল রাখা হল উপরন্তু তার দেহ ভস্ম ভূ-মধ্য সাগরে ফেলে দেয়া হল যেন তা ইসরাইলের মাটিকে অপবিত্র করতে না পারে।

Eichmann তার আত্মপক্ষ সমর্থনে বলেছিলেন যে, যেহেতু প্রথমতঃ তিনি একজন বিদেশী নাগরিক; এবং দ্বিতীয়ত ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইসরাইল বলে কোন রাষ্ট্রেরই অস্তিত্ব ছিল না, তাই ইসরাইলের বিরুদ্ধে তার অপরাধ সংগঠনের কোন প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং ইসরাইলের কোন এখতিয়ার নেই তার বিচার করার।

তৃতীয়ত ঃ তাকে বেআইনীভাবে আর্জেন্টিনা হতে নিয়ে আসার কারণে তার বিরুদ্ধে আনীত আইনি কার্যক্রম বৈধতা হারিয়েছে।

Eichmann এর যুক্তির বিরুদ্ধে কোর্ট এর মতামত ছিল যে ইসরাইল Eichmann-এর বিচারে সার্বজনীন এখতিয়ার নীতির উপর ভিত্তি করছে এবং এ নীতি অনুসারে যুদ্ধাপরাধ এমনি এক অপরাধ যা সার্বজনীন এখতিয়ার এর জন্ম দেয় অর্থাৎ যে কোন দেশের যে কোন সময় এ অপরাধের বিচার করার এখতিয়ার আছে। বেআইনীভাবে Eichmann-কে ইসরাইলে নিয়ে আসায় তার বিরুদ্ধে আনীত কার্যক্রম বৈধতা হারিয়েছে কিনা এ প্রসঙ্গে

আদালত **Kerr Vs. Illinois (1886)** মোকদ্দমাটি উল্লেখ করেন। যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীমকোর্ট ধার্য করেছিল যে, অবৈধভাবে কৃত অপহরণ সার্বজনীন নীতির অধীনে আনিত বিচার কার্যক্রমকে প্রভাবিত করবে না, অর্থাৎ কেবলমাত্র এ কারণে বিচার কার্যক্রমকে অবৈধ বলে বিবেচনা করা যাবে না।

মামলা : Kerr Vs. Illinois; কের বনাম ইলিয়নয় মামলা; (U.S. Supreme Court; (1886)

Kerr ছিল যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয়ের বাসিন্দা। সে ইলিনয়ে অপরাধ করে গ্রেফতার এড়াতে পেরুতে চলে যায়। ইলিনয় রাজ্যের এক এজেন্ট যুক্তরাষ্ট্র ও পেরুর মধ্যবর্তী বহিঃসমর্পণ চুক্তির অধীনে Kerr এর গ্রেফতারি পরওয়ানা নিয়ে পেরুতে যায়। সে সময়টায় পেরু ও চিলির মধ্যে যুদ্ধ চলছিল এবং পেরুর লিমাসহ অধিকাংশ অঞ্চল চিলির দখলে চলে গিয়েছিল। বাস্তবত পেরুতে তখন চিলির কর্তৃত্বই বজায় ছিল। এমনই এক সংকটপূর্ণ কালে ইলিনয়ের এজেন্ট চিলির সেনাবাহিনীর কাছে আবেদন করে এবং তাদের সহায়তায় Kerr-কে গ্রেফতার করে ইলিনয়ে নিয়ে আসে। Kerr-কে গ্রেফতারের ক্ষেত্রে মূলত আইনত পেরু সরকারের কাছে কোনরূপ আবেদনই করা হয় নি এবং বহিঃসমর্পণ নীতির কোন তোয়াক্কাই করা হয় নি। মামলার বিচার্য বিষয় ছিল যে, ইলিনস কোর্ট এর Kerr এর বিচার সংগঠনের এখতিয়ার আছে কি না? এবং Kerr এর অবৈধ গ্রেফতার মোকদ্দমায় কোন প্রভাব ফেলবে কি না?

যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীমকোর্ট রায় দেয় যে, পরিস্থিতি বিবেচনা করে বলা যায় যে, Kerr-কে এভাবে গ্রেফতার করা পেরুর সার্বভৌমত্বকে লঙ্ঘিত করে না এবং কেবলমাত্র অপরাধীকে আদালতে হাজিরের প্রক্রিয়া অবৈধ থাকার কারণে মামলার ফলাফল প্রভাবিত হয় না; মামলার সিদ্ধান্ত বৈধই থাকে।

উল্লেখিত অপরাধসমূহ ছাড়াও বর্তমানে আরো বেশ কিছু গুরুতর অপরাধ দ্রুত আন্তর্জাতিক ব্যাপকতা অর্জন করছে। এগুলো হচ্ছে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস, বিমান ছিনতাই, জিম্মিকরণ (taking hostage), মাদকদ্রব্যের অবৈধ ব্যবসা, নারী ও শিশু পাচার ইত্যাদি।

এই অপরাধসমূহের ক্ষেত্রে সার্বজনীন নীতি এখনো প্রয়োগ না হলেও অনুরূপ প্রয়োগের ভিত্তি রচিত হচ্ছে সন্দেহ নেই। এখানে সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে সঠিকভাবে আন্তর্জাতিক অপরাধের সীমানা নির্ধারণ করা।

তবে শুধু সার্বজনীন নীতির ভিত্তিতে এখতিয়ার প্রয়োগ করার নজির কম। আইকম্যানের বিচার করার ক্ষেত্রে ইসরাইল তার এখতিয়ারের স্বপক্ষে শুধু সার্বজনীন নীতির কথাই বলে নি, সংরক্ষণ বা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা নীতিরও উল্লেখ করেছে।

রাষ্ট্রীয় দায়

State Responsibility

সাধারণ ভাষায় যখন কোন ব্যক্তি কোন অন্যায়কার্য সংঘটন করে তখন তাকে সেই কার্যের জন্য অবশ্যই আইনগত দায় বহন করতে হয়, যার পরিণাম হচ্ছে তার সাজাপ্রাপ্তি বা তার কর্ম দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে বাধ্যতামূলক ক্ষতিপূরণ প্রদান। অর্থাৎ অন্যায়কারী ও অন্যায়ের প্রতিকারের মধ্যে যে বাধ্যবাধকতার বন্ধন তাই দায় (Responsibility)। এ দৃষ্টিকোণ থেকে যখন কোন রাষ্ট্র কোন অন্যায় কাজ সংঘটন করে অর্থাৎ আন্তর্জাতিক আইনের কোন বিধান লজ্ঘন করে তখন এর ফলাফল উক্ত রাষ্ট্রকে দায়ী হিসেবে বহন করার নীতিই হচ্ছে রাষ্ট্রীয় দায় (State Responsibility)।

আন্তর্জাতিক আইন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে অর্থাৎ রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সুসম্পর্কের নীতিসমূহ নির্দেশ করে। একটি রাষ্ট্রের উন্নতি, সমৃদ্ধি এবং অগ্রগতি এই সবকিছুর জন্যই আন্তর্জাতিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রয়োজন এবং রাষ্ট্রসমূহ আন্তর্জাতিক আইন কর্তৃক নির্দেশিত নীতিসমূহ মেনে চললেই কেবল তা সম্ভব। তাই বর্তমানে আন্তর্জাতিক নীতিমালাসমূহ মেনে চলা বিশ্বের প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রের জন্য অনেকাংশে বাধ্যতামূলক।

আর সে জন্যই যখনই কোন রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আইন ও বিধানসমূহ লজ্ঘন করে তখন কিছু ফলাফল ঐ রাষ্ট্রকে ভোগ করতে হয়– এ ফলাফলকেই আন্তর্জাতিক আইনে State Responsibility বা রাষ্ট্রীয় দায় বলা হয়ে থাকে।

মূলত একটি রাষ্ট্র যখন অপর একটি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অন্যায় আচরণ করে তখনই রাষ্ট্রীয় দায়দায়িত্বের প্রশ্ন আসে। আবার যে রাষ্ট্রটির প্রতি অন্যায় আচরণ করা হয়েছে তার প্রতি অন্যায়কারী রাষ্ট্র কোন ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য কি না এ প্রশ্নটিও দায়দায়িত্বের সাথে আসে।

একটি রাষ্ট্র কর্তৃক অন্য রাষ্ট্রের প্রতি অন্যায় আচরণের অনেক উদাহরণ আন্তর্জাতিক আইনে লক্ষ্যণীয়। যেমন– ফারাক্কা বাঁধের ফলে বাংলাদেশের প্রতি যে অন্যায় আচরণ করা হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করা হয়েছে-এর জন্য ভারতকে দায়ী করা যায়। এভাবেই যখন International Substantive Law/Rule ভঙ্গ করা হয় তখন রাষ্ট্রীয় দায়ের উদ্ভব ঘটে।

আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে রাষ্ট্রীয় দায় দেওয়ানী ও ফৌজদারি উভয় ক্ষেত্রেই হতে পারে। দেওয়ানী দায়ের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ আন্তর্জাতিক আইনানুমোদিত প্রতিকার দাবি করার অধিকারী এবং অন্যায়কারী রাষ্ট্র এই দাবি পূরণে সম্মত হওয়ার কর্তব্যে আবদ্ধ। ফৌজদারি দায়ের ক্ষেত্রে অন্যায়কারী রাষ্ট্র সংক্ষুব্ধ রাষ্ট্রের আবেদনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক আদালতের দ্বারস্থ হয়ে আন্তর্জাতিক আইনের বিধান মোতাবেক দণ্ড ভোগ করতে বাধ্য থাকে। নিম্নলিখিত উপাদানসমূহ যখন সহাবস্থান করে তখনই রাষ্ট্রীয় দায়ের সৃষ্টি হয়। যেমন-

১. দু'টি রাষ্ট্রের মধ্যে আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে কার্যকরী একটি আন্তর্জাতিক আইনগত বাধ্যবাধকতা বিদ্যমান থাকবে

২. আন্তর্জাতিক আইনগত বাধ্যবাধকতা কোন একটি বা একাধিক কাজ দ্বারা বা কাজ করা থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে লঙ্ঘিত হতে হবে

৩. যে অন্যায় কার্যটি সংঘটিত হয়েছে তার সাথে একটি নির্দিষ্ট রাষ্ট্রের কার্যকরণ সম্পর্ক থাকতে হবে

৪. আর এ অন্যায়ের ফলে বিরুদ্ধ পক্ষের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হবে।

এ প্রসঙ্গে দু'টি মামলার সিদ্ধান্তের উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কখন রাষ্ট্রীয় দায়ের উদ্ভব ঘটে প্রথমটি হচ্ছে **The Spanish Zone of Morocco Claims (1923)**। যেখানে সালিশ আদালত উল্লেখ করেছেন যে, আন্তর্জাতিক চরিত্রের সকল অধিকারের সহযাত্রী হচ্ছে রাষ্ট্রীয় দায় দ্বিতীয়টি হচ্ছে **Chorzow Factory Case (PCIJ, 1928)**। এই মামলার সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে যে, যে কোন আন্তর্জাতিক দায়দায়িত্ব লঙ্ঘন করা হলে সেখানে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে। মামলাটি পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় দায় লঙ্ঘনের নির্ধারণের উপায় : দায়দায়িত্ব লঙ্ঘিত হয়েছে কি না সেটা আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে নির্ধারিত হবে।

মামলা : Garcia and Garza Vs. USA; গার্সিয়া বনাম গারজা; (Mexico Vs. USA, 1926).

মামলাটি মেক্সিকো- যুক্তরাষ্ট্র জেনারেল ক্লেইমকমিশনে নিষ্পত্তি হয়েছিল। এক হতভাগ্য দরিদ্র পিতা-মাতার দু'সন্তান রাতের আঁধারে রিওগ্রানদে নদী সাঁতরে যুক্তরাষ্ট্রের সীমানা অতিক্রম করার সময় মার্কিন সীমান্ত রক্ষির গুলিতে সন্তান দু'টি নিহত হয়। তারা এমন এক স্থানে গুলিবিদ্ধ হয় যেখানে মেক্সিকো কিংবা যুক্তরাষ্ট্র উভয় দেশের আইনেই নদীপারাপার নিষিদ্ধ ছিল। সীমান্ত রক্ষি অফিসার চোরাচালান এর উপর নজর রাখবার জন্যই বিশেষভাবে নিযুক্ত হয়েছিল। তবে ঘটনার মাত্র দু'মাস আগেই সেনাবাহিনীর একটি রেগুলেশান এ নির্ধারিত হয় যে অনুমোদিত স্থানে চোরাচালানে রত বলে সন্দেহভাজন হওয়া সত্ত্বেও নিরস্ত্র ব্যক্তির উপর গুলিবর্ষণ করা যাবে না। যুক্তরাষ্ট্রের কোর্ট অব মার্শাল সীমান্তরক্ষি অফিসারকে দোষী সাব্যস্ত করে এবং অফিসারকে চাকরি হতে অব্যাহতির আদেশ দেয়। কিন্তু কিছু দিন পর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট উক্ত আদেশ এর সাথে ভিন্নমত পোষণ করেন এবং অফিসারকে আবার চাকরিতে পুর্নবহাল করা হয়। অতঃপর বিষয়টি Mexico-USA জেনারেল ক্লেইমস কমিশনে বিবেচনার জন্য প্রেরণ করেন।

মামলাটিতে বিচার্য বিষয় ছিল, যুক্তরাষ্ট্রের অফিসার কর্তৃক কৃত কাজটি যুক্তি সঙ্গত কিংবা যথার্থ কি না? আদালতের সিদ্ধান্তানুসারে নির্ধারিত হয় যে, না অফিসারের কৃতকর্ম পরবর্তী রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারা যেভাবেই বৈধ করার চেষ্টা করা হোক না কেন, যথার্থ কিংবা আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য কোন কর্ম নয়। এটা অনস্বীকার্য যে শিশু দু'টির অনানুমোদিত স্থান দিয়ে নদী পারা পারের চেষ্টা নিঃসন্দেহে একটি বেআইনি কাজ। কিন্তু কেবলমাত্র এতটুকু কারণে কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটানো আন্তর্জাতিক আইনে কোনভাবেই স্বীকৃত বা অনুমোদিত হতে পারে না। আন্তর্জাতিক আইনে ব্যক্তির প্রতি আচরণের একটি নূন্যতম গ্রহণযোগ্য মাত্রা আছে এবং এমন কোন আইন নেই যা দ্বারা ব্যক্তির প্রতি এমন অমানবিক আচরণ সমর্থিত হতে পারে। সুতরাং মেক্সিকান এ শিশু দু'টির হত্যা নিঃসন্দেহে আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন এবং এর জন্য অবশ্যই যুক্তরাষ্ট্র দায়ি হবে।

অতঃপর উপরোক্ত মামলায় যুক্তরাষ্ট্রকে দায়ি চিহ্নিত করা হয় এবং সন্তান দু'টির পিতামাতাকে দু'হাজার ডলার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়।

রাষ্ট্র কোন আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘন করলে কতটুকু দায় উক্ত রাষ্ট্র ভোগ করবে তা নির্ধারণ করতে দু'টি পৃথক তত্ত্বের উপর নির্ভর করতে হয়-

১. Principle of Objective State Responsibility / Risk Theory

এ তত্ত্ব অনুযায়ী, কোন আন্তর্জাতিক দায়িত্ব ভঙ্গের ফলে পরম দায়ের (Strict liability) সৃষ্টি হয়। পরম দায় (Strict liability) বলতে বুঝায় যখন কোন কার্যের জন্য কাউকে অন্যায়মূলক অভিপ্রায় বা অবহেলার অস্তিত্ব নির্বিচারে দায়ী বলে গণ্য করা হয়। অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে কোন রাষ্ট্রের বা নাগরিক কর্তৃক কোন বেআইনী কাজ সংঘটিত হয়েছে এবং এর ফলে ক্ষতি সাধিত হয়েছে সে ক্ষেত্রে ঐ রাষ্ট্র ক্ষতিগ্রস্ত রাষ্ট্রের কাছে দায়ী থাকবে তা সহজ বিশ্বাসে করা হোক বা না হোক। কোন অন্যায় সংঘটিত হলে এবং আন্তর্জাতিক আইন লংঘিত হলে রাষ্ট্র দায়ী হবে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের দায় পরম। এটি এমন কোন লঙ্ঘন যা রাষ্ট্রের উপর বর্তায়। পরম বা নিরঙ্কুশ দায়ের ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করতে হলে তার দোষী মানসিকতা (Mens rea) রয়েছে কি না তা বিবেচ্য বিষয় নয়। **Risk Theory'র** ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত মামলাগুলি প্রাসঙ্গিক বিষয়-

মামলা : Neer Claims; নির-এর দাবি; (USA Vs. Mexico, 1926)

এই মামলায় Neer একজন মার্কিন নাগরিক ছিলেন। তিনি মেক্সিকোতে একটি কয়লার খনির তত্ত্বাবধায়ক (Superientendant) ছিলেন। শ্রমিকদের সাথে কথা কাটাকাটির পর তাকে মেরে ফেলা হয়। মার্কিন সরকার মেক্সিকো সরকারের নিকট ক্ষতিপূরণ দাবি করলে মেক্সিকো সরকার বলে যে, কিছু ব্যক্তির অপরাধমূলক কার্যকলাপের ফলে খুনটি সংঘটিত হয়েছে। এর সাথে রাষ্ট্রের কোন সম্পর্ক নেই। ফলে মামলাটি সালিশ আদালতে যায়।

এই মামলার বিচার্য বিষয় হলো-Mr. Neer এর খুনের জন্য মেক্সিকো দায়ী হবে কি না এবং এর জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে কি না? সালিশ আদালত যে কারণের ভিত্তিতে রায় প্রদান করেন তাহলো Objective principle বা risk theory অনুযায়ী কোন রাষ্ট্রের কার্যকলাপের দরুণ অপর কোন রাষ্ট্র ক্ষতিগ্রস্ত হলে দোষ থাকুক বা না থাকুক ঐ রাষ্ট্র দায়ী হবে। কাজেই খুনের কাজটি যেহেতু মেক্সিকোর এলাকার মধ্যে সংঘটিত হয়েছে তাই

দোষ থাকুক বা না থাকুক Objective principle theory বা Risk theory অনুযায়ী মেক্সিকো ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে বাধ্য থাকবে।

মামলা : Caire Claims; কেয়ার-এর দাবি; (France Vs. Mexico, 1929)

এই মামলার Mr. Caire একজন ফরাসি নাগরিক ছিলেন। তিনি ভ্রমণের উদ্দেশ্যে মেক্সিকোতে বেড়াতে যান। তিনি মেক্সিকোতে ঘুরে বেড়ানোর সময় কয়েকজন মেক্সিকান পুলিশ তার কাছে পাঁচ হাজার ডলার ঘুষ দাবি করে। Mr. Caire তা প্রদান করতে অস্বীকার করলে সৈন্যদের সাথে বাদানুবাদ শুরু হয়। এক পর্যায়ে মেক্সিকান সৈন্যরা Mr. Caire-কে গুলি করে মেরে ফেলে। ফ্রান্স তখন মেক্সিকোর নিকট ক্ষতিপূরণ দাবি করলে মেক্সিকো বলে যে এটি একটি ব্যক্তির অপরাধমূলক কাজ। এজন্য মেক্সিকো দায়ী হবে না।

এ মামলার বিচার্য বিষয় হলো একজন ব্যক্তির (Individual) কাজের জন্য রাষ্ট্র দায়ী হবে কি না?

এই মামলার রায় দিতে গিয়ে সালিশ আদালত বলেন যে, আন্তর্জাতিক আইনের একটি সুস্পষ্ট নীতি হচ্ছে কোন বিদেশী নাগরিক (foreign national) কোন রাষ্ট্রের ভূ-খণ্ডে গমন করলে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের পবিত্র দায়িত্ব হচ্ছে ঐ বিদেশীর সাথে দুর্ব্যবহার না করা, অর্থাৎ তার প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। যদি কোন রাষ্ট্র কোন উপায়ে এ দায়িত্ব ভঙ্গ করে তবে তার উপর রাষ্ট্রীয় দায় অর্পিত হবে। এখানে মেক্সিকো আন্তর্জাতিক দায়দায়িত্ব ভঙ্গ করেছে। তাই এখানে তাদের দায়িত্ব হবে strict বা পরম, তা কাজটি যেই করুক না কেন। ফলে এখানে রাষ্ট্রীয় দায়দায়িত্বের Objective তত্ত্ব কার্যকর হবে।

২. The Principle of Subjective State Responsibility / Fault Theory

এ তত্ত্ব অনুযায়ী কোন কার্যের জন্য একটি রাষ্ট্রকে দায়ী করতে হলে অবশ্যই উক্ত রাষ্ট্রের ঐ কার্যে Fault (দোষ) প্রমাণ করতে হবে। যে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের তরফ থেকে কোন Negligence, intention প্রমাণ করা যায় না অর্থাৎ Mens rea থাকে না সে ক্ষেত্রে Subjective State responsibility অনুযায়ী ঐ রাষ্ট্রকে দায়ী করা যাবে না। এ তত্ত্বের আওতায় সিদ্ধান্তিত একটি উল্লেখযোগ্য মামলা :

মামলা : Home Missionery Society Claims; হোম মিশনারীর দাবি; (USA Vs. UK, 1920)

এই মামলায় Home Missionery Society একটি আমেরিকান ধর্মীয় বেসরকারি সংস্থা যার বিভিন্ন কার্যালয় ছিল। আফ্রিকার সিয়েরালিওনে উক্ত সংস্থার একটি কার্যালয় ছিল, তখন সিয়েরালিওন বৃটেনের একটি কলোনী ছিল। বৃটেন সরকার সিয়েরালিওনে জনগণের জন্য Hut tax জারি করলো। কিন্তু জনগণ তা মানতে রাজি হলো না। এর প্রতিবাদে জনগণ

রাস্তায় নেমে গেল এবং প্রচণ্ড বিক্ষোভ শুরু হলো। এক পর্যায়ে বিক্ষুব্ধ জনগণ সেখানে অবস্থিত Home Missionary-তে আগুন ধরিয়ে দিলে উক্ত সংস্থার বাড়িঘর পুড়ে যায় এবং কয়েকজন আমেরিকান নাগরিক মারা যায়। আমেরিকা এজন্য বৃটেনের নিকট ক্ষতিপূরণ দাবি করলে বৃটেন জবাব দিল, জনগণ উন্মত্ত হলে রাষ্ট্রের তৎক্ষণাৎ কিছুই করণীয় ছিল না।

এই মামলায় বিচার্য বিষয় হলো– বৃটেন সিয়েরালিওনের উক্ত বিদ্রোহের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত সংস্থার এবং আমেরিকান নাগরিকদের প্রাণনাশের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে দায়ী হবে কি না?

সালিশ আদালত বলল যে, একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠীর উন্মত্ততা ও বিদ্রোহ তাৎক্ষণিকভাবে নিবারণ করা একটি রাষ্ট্রের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। এক্ষেত্রে বৃটেনের রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনে সতর্কতার ব্যাপারে কোন প্রকার আন্তরিকতার ঘাটতি ছিল না। তাই আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে সিয়েরালিওনের উক্ত জনতা কর্তৃক সংঘটিত ক্ষতির জন্য কাউকে দায়ী করা যায় না বলে সালিশ আদালত আমেরিকার আনীত দাবি বাতিল করে দেন।

কোন পরিস্থিতিতে কখন এবং কোন ধরনের কাজকে রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হবে এবং হবে না

যখন কোন রাষ্ট্র কর্তৃক কোন কাজ করা হয় বা কাজ করা হতে বিরত থাকার ফলশ্রুতিতে কোন আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘিত হয় এবং অপর কোন রাষ্ট্রের ক্ষতিসাধিত হয় তখন উক্ত রাষ্ট্রের কাজ করা বা করা হতে বিরত থাকা রাষ্ট্রীয় দায় (State Responsibility) হিসেবে গণ্য হবে। যখন কোন ঘটনা রাষ্ট্রের কার্যের সাথে সম্পৃক্ত করা যায় তখনই কেবল রাষ্ট্র দায়ী হবে। একটি রাষ্ট্রকে কোন দায়দায়িত্বের জন্য অভিযুক্ত করতে হলে নিম্নলিখিত শর্তসমূহ পূরণ হওয়া আবশ্যক :

১. রাষ্ট্রের কোন অঙ্গ বা প্রতিনিধি দ্বারা অফিসিয়ালভাবে কার্যপরিচালনায় আন্তর্জাতিক আইন দ্বারা সংজ্ঞায়িত কোন বাধ্যবাধকতার বিধানসমূহ ভঙ্গ করা হলে ঐ রাষ্ট্র এজন্য দায়ি হবে।

২. আন্তর্জাতিক আইনের বিধান অনুযায়ী ঐ বাধ্যবাধকতার লঙ্ঘন রাষ্ট্রের সাথে আরোপিত বা সম্পর্কিত হবে। প্রাসঙ্গিক মামলা –

মামলা : Nicaragua Case; নিকারাগুয়া মামলা; (Nicaragua Vs. USA, ICJ, 1986)

এই মামলায় নিকারাগুয়াতে ১৯৭৯ সালে ডানপন্থী Somoza সরকারকে ক্ষমতা হতে উৎখাত করে বামপন্থী Sandinista সরকার ক্ষমতায় আসে। পরবর্তীতে এই Sandinista সরকারকে উৎখাত করার জন্য প্রতিমন্ত্রী কমাণ্ডার জিরো চেষ্টা চালায়। এই সময় Sandinista সরকারের বিরুদ্ধে গেরিলা বিদ্রোহ চলছিল। তাই গেরিলা বিদ্রোহীদের দমন

করার জন্য যাতে কোন জাহাজ সাহায্য বা রসদ নিয়ে নিকারাগুয়াতে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য আমেরিকা সমুদ্র উপকূলে মাইন পুতে রাখল। নিকারাগুয়া আন্তর্জাতিক আদালতে এটা আন্তর্জাতিক প্রথাগত আইনের পরিপন্থী বলে দাবি করলো এবং সে কারণে নিকারাগুয়া ক্ষতিপূরণ চাইল। এই মামলার মূল বিচার্য বিষয় হলো আমেরিকা নিকারাগুয়াকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে বাধ্য কি না?

এই মামলায় আন্তর্জাতিক আদালত রায়ে বলে যে, যেহেতু আমেরিকা গেরিলা বিদ্রোহীদের সাহায্য করেছে এবং নিকারাগুয়ার রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে মাইন বসানোর কাজটি সরাসরি নিকারাগুয়ার ক্ষতিসাধনের জন্য করা হয়েছে তাই এখানে আমেরিকা তার কাজের জন্য (imputed) সম্পৃক্ত এবং দায়ী হবে; এজন্য নিকারাগুয়াকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করতেও বাধ্য থাকবে।

মামলা : Corfu Channel Case; কর্ফু প্রণালী মামলা; (UK Vs. Albania, ICJ, 1949)

এই মামলায় Corfu Channel (North) হচ্ছে আলবেনিয়া ও গ্রীসের মধ্যবর্তী একটি চ্যানেল। এই চ্যানেলের সীমানা নিয়ে তাদের মধ্যে একবার বিরোধ দেখা দেয়। ১৯৪৬ সালের ২২ অক্টোবর তারিখের আগে বৃটেন আলবেনিয়ার এই চ্যানেল হতে মাইন অপসারণ করে জাহাজ চলাচলের উপযোগী করে তোলে।

১৯৪৬ সালের ২২ অক্টোবর তারিখে দুইটি বৃটিশ যুদ্ধ জাহাজ এই Corfu Channel অতিক্রম করার সময় আলবেনিয়ার জলসীমায় পৌঁছানোর পর মাইন এর বিস্ফোরণ ঘটে এবং ফলশ্রুতিতে জাহাজগুলো ধ্বংস হয় এবং আরোহী নাবিক মারা যায়।

১৯৪৬ সালের ১২ ও ১৩ অক্টোবর তারিখে আলবেনিয়ার অনুমতি ছাড়াই বৃটিশ নৌ সেনারা এই চ্যানেল হতে মাইন অপসারণ করে এবং তা জাহাজ চলাচলের উপযোগী করে তোলে। পরবর্তীতে বৃটেন এ কাজের জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করলে আলবেনিয়া ক্ষতিপূরণ দিতে অস্বীকার করায় বৃটেন আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা দায়ের করে।

এই মামলার বিচার্য বিষয় ছিল যে আলবেনিয়া দায়ী কি না এবং ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে বাধ্য কি না?

এই মামলার রায়ে আদালত মত প্রকাশ করেন যে, মাইন বিস্ফোরণ এবং এতদসংক্রান্ত ক্ষয়ক্ষতি এবং জীবন নাশের জন্য আলবেনিয়া আন্তর্জাতিক আইনে দায়বদ্ধ। এ কারণে আদালত ক্ষতিপূরণ বাবদ ৮৪৩, ৯৪৭ পাউণ্ড বৃটেনকে প্রদান করার জন্য আলবেনিয়াকে আদেশ করেন। আদালতের এরূপ রায়ের পেছনে যুক্তিটি গুরুত্বপূর্ণ; তা হলো : কর্ফু চ্যানেল হচ্ছে একটি আন্তর্জাতিক চ্যানেল। এই চ্যানেলটি দিয়ে সকলেই, এমনকি যুদ্ধ জাহাজও চলাচলা করতে পারে। তাই আলবেনিয়ার দায়িত্ব ছিল এই চ্যানেলকে সর্বদা জাহাজ চলাচলের উপযোগী করে রাখা। এই দায়িত্ব পালনে আলবেনিয়া ব্যর্থ হয়। শুধু তা-ই নয়, এই চ্যানেলে যে মাইন পোঁতা আছে এবং তা একটি ভয়াবহ বিপদের কারণ হতে পারে,

আলবেনিয়া এই কথা বিশ্ববাসীকে অবহিত করে নি। যার কারণেই বৃটিশ নৌবহরকে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করতে হয়।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, আলবেনিয়া একদিকে কর্ফু চ্যানেলে নিরাপত্তা নিশ্চিত করে নি; অপর দিকে সম্ভাব্য বিপদের আশংকাও প্রকাশ করে নি। এই উভয় দায়িত্ব পালন না করার কারণেই আদালত আলবেনিয়াকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের আদেশ প্রদান করেন।

মামলা : The Rainbow Warrior Case; রেইনবো ওয়ারিয়ার মামলা; (Newzealand Vs. France, ICJ, 1985)

এই মামলায় Rainbow Warrior একটি জাহাজের নাম যা Greenpeace-এর যান হিসেবে কাজ করত। প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ যেখানে ফ্রান্স পারমানবিক বিস্ফোরণ ঘটাত তা দেখতে জাহাজটি সেখানে যেত। ফলে ফ্রান্স ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং জাহাজটি Newzealand এ নোঙর করা অবস্থায় ফ্রান্স ৩ জন ডুবুরীকে পাঠায় জাহাজটি ধ্বংস করার জন্য। তারা বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে জাহাজটি ধ্বংস করে ফেলে। নিউজিল্যান্ড সমস্ত কর্মকাণ্ডের জন্য ফ্রান্সের সম্পৃক্ততা প্রতিষ্ঠা এবং ফ্রান্সের নিকট ৭ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী হয়। কিন্তু ফ্রান্স তার দায়দায়িত্ব অস্বীকার করে। এই মামলার বিচার্য বিষয় ছিল– ফ্রান্সের আলোচ্য ঘটনায় দায়-দায়িত্ব ছিল কি না?

এই মামলার রায়ে বলা হয় যে, ফ্রান্স নিউজিল্যান্ডকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে। কারণ যেহেতু তিনজন ডুবুরী যারা ফরাসি নাগরিক Rainbow Warrior-কে ডুবিয়ে দিয়েছে সেহেতু তারা ফরাসিদের পক্ষে কাজটি করেছে বলে ধরে নেয়া হবে। কাজেই এরূপ কাজের জন্য ফ্রান্স আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে দায়ী হয়েছিল এবং ৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে সাব্যস্ত হয়েছিল। কিন্তু নিউজিল্যান্ড উক্ত ক্ষতিপূরণের অর্থ গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায় এবং দাবি জানায় যে,

১. ফ্রান্সকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে এবং শপথ করতে হবে যে, সে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটাবে না।

২. ঐ তিনজন ডুবুরীকে নিউজিল্যান্ড এর দ্বীপে দ্বীপান্তর দিতে হবে এবং এ সময়ে তারা ফ্রান্সে যেতে পারবে না।

অবশেষে ফ্রান্স নিউজিল্যান্ড কর্তৃক আরোপিত শর্তাবলী মেনে নিয়েছিল।

কোন ধরনের নাগরিক বা ব্যক্তির কাজ রাষ্ট্রীয় কাজ হিসেবে গণ্য হবে বা কোন ব্যক্তির কাজ করা বা করা হতে বিরত থাকা রাষ্ট্রের কাজ বলে গণ্য হবে

প্রথমত : যদি এক বা একাধিক ব্যক্তির কোন দল রাষ্ট্রের পক্ষ হয়ে বা রাষ্ট্রের নির্দেশ পেয়ে ...ন কাজ করে বা করা হতে বিরত থাকে, তখন এটি রাষ্ট্রের কাজ বলে গণ্য হবে।

... কোন ব্যক্তি বা দল রাষ্ট্রের পক্ষ হয়ে কাজ না করে তথাপি রাষ্ট্র প্রদত্ত ক্ষমতা/

কর্তৃত্বের মধ্যে থেকে সম্পাদন করলে বা করা হতে বিরত থাকলে তখনও এটা রাষ্ট্রে কাজ বলে গণ্য হবে।

প্রাসঙ্গিক মামলা– ১. **Neer Claim**

২. **Caire Claim**

তৃতীয়ত : যদি কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রের পক্ষে কাজ করার বা কাজ করা হতে বিরত থাকার অধিকারী হয় এবং সে তার ক্ষমতার অপব্যবহার (Ultra Vires) করে তখনও ঐ রাষ্ট্রের এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় দায়ের জন্য হবে। প্রসাঙ্গিক মামলা–

মামলা : Youman's Claim; ইয়োম্যান'স-এর দাবি; (USA Vs. Mexico, 1926)

এই মামলায় কিছু আমেরিকান নাগরিক মেক্সিকোতে টুরিস্ট হিসেবে অবস্থান করছিল। তারা যে শহরে ছিল সেই শহরে মার্কিনীদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। তাই আমেরিকার নাগরিকগণ একটি বাড়িতে আশ্রয় নেয়। পরবর্তীতে পুলিশ ঘটনা জানার পর তাদের নিরাপত্তা দেখার জন্য সেখানে যায় কিন্তু উত্তেজিত জনগণের সাথে একাত্ম হয়ে তাদেরকে গুলি করে হত্যা করে। আমেরিকা মেক্সিকোর বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ দাবি করল। মেক্সিকো তাদের পক্ষে যুক্তি দেখায় যে, পুলিশ বাহিনীকে মার্কিনীদের নিরাপত্তার জন্যই পাঠানো হয়েছিল কিন্তু তারা ক্ষমতার অপব্যবহার করে তাদেরকে গুলি করে হত্যা করে। এজন্য মেক্সিকো দায়ি নয়। বিষয়টি তখন সালিশ আদালতে যায়। এই মামলার বিচার্য বিষয় ছিল ব্যক্তি বা দলের ক্ষমতার অপব্যবহারের জন্য মেক্সিকো দায়ী হবে কি না?

এই মামলার রায় দিতে গিয়ে সালিশ আদালত বলেন যে, রাষ্ট্র কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির কাজ যেহেতু রাষ্ট্রীয় কাজেরই অন্তর্ভুক্ত; তাই ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা দল দোষ করলে বা ক্ষমতার অপব্যবহার করলে তার দায় অবশ্যই সরকারকে নিতে হবে। এজন্য পুলিশ বাহিনীর কাজের জন্য মেক্সিকো দায়ী হবে।

ক্ষতিপূরণ প্রদানের পদ্ধতি (Modes of Reparation)

রাষ্ট্রীয় দায়-এর মূলনীতি হচ্ছে দায়দায়িত্ব ভঙ্গ হলে দায়দায়িত্ব ভঙ্গকারী রাষ্ট্র ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য। **Chorzow Factory (1928)** মামলায় এই নীতিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই মামলার সিদ্ধান্তে বলা হয়, আন্তর্জাতিক দায় ভঙ্গকারী রাষ্ট্র যে রাষ্ট্রের ক্ষতি হয়েছে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে। ক্ষতিপূরণের পন্থা হতে পারে ভিন্ন প্রকৃতির।

১. **পুনরুদ্ধার দ্বারা ক্ষতিপূরণ (Restitution in kind) :** যখন কোন দেশের সম্পদ বা অন্য কোন কিছুর ক্ষতিসাধন করা হয় তা অবশ্যই যে রাষ্ট্র করে সে রাষ্ট্র সমপরিমাণ বা একই জিনিস প্রতিস্থাপন দ্বারা পূরণ করবে বা ফেরত দিবে। অর্থাৎ ক্ষতিসাধিত হওয়ার পূর্বে যে অবস্থায় ছিল ক্ষতি সাধিত হওয়ার পর সেই অবস্থায় নিয়ে যাওয়াই হচ্ছে পুনরুদ্ধার দ্বারা ক্ষতিপূরণ (Compensation by Restitution)। যেমন– সার্বভৌমত্বের প্রতি আঘাত হানলে সার্বভৌমত্ব ফিরিয়ে দিতে হবে। ইরাক কর্তৃক কুয়েত দখলের পর ইরাক কুয়েত থেকে তার দখল উঠিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিল।

২. **আর্থিক ক্ষতিপূরণ (Monetory Compensation) :** কোন রাষ্ট্রের উপর অন্যায় আচরণ করা হলে উক্ত রাষ্ট্রের আর্থিক ক্ষতিসাধিত হোক বা না হোক আর্থিক ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রাসঙ্গিক মামলা- **I am Alone (1935)** (সমুদ্র আইন দ্রষ্টব্য)।

৩. **সন্তুষ্টি বিধান (Satisfaction) :** এ ক্ষেত্রে বিধানটি হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত রাষ্ট্রের নিকট অর্থাৎ যে রাষ্ট্রের উপর অন্যায়মূলক আচরণ করা হয় তার নিকট ক্ষমা চাইতে হবে এবং ভুল স্বীকারপূর্বক ভবিষ্যতে একই ধরনের কাজের পুনরাবৃত্তি না করার নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে। প্রাসঙ্গিক মামলা– **Rainbow Warrior Case, 1985-** এই মামলায় ফ্রান্স নিউজিল্যান্ডের কাছে স্বীয় কাজের জন্য ক্ষমা চেয়েছিল এবং নিউজিল্যান্ড কর্তৃক আরোপিত শর্তাবলীও তারা মেনে নিয়েছিল।

ব্যতিক্রম

কিছু কিছু পরিস্থিতিতে কোন রাষ্ট্রীয় দায় সৃষ্টি হয় না যদিও কোন রাষ্ট্রের কার্য বা কার্য থেকে বিরত থাকার ফলে অন্য রাষ্ট্রের বা ব্যক্তির ক্ষতিসাধিত হয়। আর এটাকে 'রাষ্ট্রীয় দায়মুক্তি' বলে অভিহিত করা যেতে পারে। ১৯৮০ সালের International Law Commission কর্তৃক পেশকৃত Draft Articles on State Responsibility এর Articles 29 to 35 এ defences to state Responsibility-তে দায়মুক্তির ব্যাপারে যা বলা আছে নিম্নে তা আলোকপাত করা হলো:

১. **সম্মতি (Consent) : (Article-29) :** যে রাষ্ট্রের ক্ষতিসাধিত হয়েছে সে রাষ্ট্রের যদি পূর্ব সম্মতি থাকে তাহলে অপর রাষ্ট্র ক্ষতিকর বা অন্যায়কারী বলে বিবেচিত হবে না। যেমন– সৌদি আরবের সম্মতিক্রমে সেখানে USA এর সেনাবাহিনীর অবস্থান। তবে এই বিধান Peremtory rule of international law লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

২. **আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে বৈধ নিষেধাজ্ঞা (Legitimate application of sanctions) : (Article-30) :** যে অন্যায়মূলক আচরণের ফলে অন্য রাষ্ট্রের উপর আঘাত করা হয় এবং সেই আচরণ যদি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় দ্বারা আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘন হিসেবে পরিগণিত না হয়ে বরং আইনগত বৈধতা প্রদান করা হয় তবে সেটা রাষ্ট্রীয় দায় বলে গণ্য হবে না। যেমন ইরাকের উপর আরোপিত অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা।

৩. **আকস্মিক বা দৈব ঘটনার ফলে (Fortuitious event) : (Article-31) :** উক্ত অন্যায়মূলক কাজটি যদি প্রাকৃতিক উপায়ে এবং আকস্মিক ঘটনা দ্বারা সংঘটিত

হয়ে থাকে যা কোনভাবেই কারো পক্ষেই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়, সে সকল ক্ষেত্রে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা নেই।

৪. **অত্যন্ত দুঃখ দুর্দশার ফলে (Distress) : (Article-32) :** কোন রাষ্ট্র কর্তৃক এর অত্যন্ত দুঃখ কষ্টের (extreme distress) সময় অন্য কোন উপায়ান্তর না দেখে তার জীবন রক্ষার্থে যদি কোন আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘন করে কোন বেআইনী কার্য করে তবে এজন্য ঐ রাষ্ট্র দায়মুক্তির অধিকার ভোগ করবে।

তবে, উক্ত দুঃখ- দুর্দশা যদি ঐ রাষ্ট্রের স্বেচ্ছাকৃত হয়ে থাকে তাহলে সে এই দায়মুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবে না।

৫. **আবশ্যকতা বা প্রয়োজনের ক্ষেত্রে (State of necessity) :** (Article-33) যখন কোন রাষ্ট্রের নিজের নিরাপত্তা ও স্বার্থ রক্ষায় এমন কোন আবশ্যক কাজ সম্পাদন অপরিহার্য হয়ে পড়ে যে ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা ভঙ্গ হয় তখন উক্ত দায়ভঙ্গের কারণে সে ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে বাধ্য হবে না।

মামলা: Torry Canyon Incident; টোরি ক্যানিয়ন ঘটনা; (Liberia Vs. UK, 1967)

এই মামলায় Torry Canyon ছিল লাইবেরিয়ার একটি বড় মাপের জাহাজ যা তেল ভর্তি অবস্থায় ছিল। জাহাজটি যখন বৃটেনের সমুদ্র সীমানার বাইরে অবস্থান করছিল (যেখানে বৃটেনের এখতিয়ার ছিল না) তখন শিলার সাথে সংঘর্ষ হয়ে জাহাজের ট্যাংকারটি ফুটো হয়ে তেল নিঃসৃত হতে থাকে। সমুদ্রের স্রোতের সাথে সাথে তেল প্রবাহিত হয়ে বৃটেনের উপকূলীয় সমুদ্র সীমানা দূষিত হতে শুরু করে। বৃটেন সকল চেষ্টা সত্ত্বেও তেলের নিঃসরণ বন্ধ করতে না পেরে বিমান থেকে বোমা মেরে জাহাজটি ধ্বংস করে ফেলে। ফলে লাইবেরিয়া বৃটেনের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের মামলা করে। তাদের যুক্তি ছিল উন্মুক্ত সাগরে অন্য দেশের সম্পত্তি ধ্বংস করার অধিকার বৃটেনের নেই। কারণ রাষ্ট্রের সমুদ্র সীমার বাইরে উপকূলীয় রাষ্ট্রের কোন এখতিয়ার নেই।

এই মামলার বিচার্য বিষয় হলো– এই জাহাজটি ধ্বংসের ফলে বৃটেনের কোন রাষ্ট্রীয় দায়ের সৃষ্টি হবে কি না?

এই মামলার রায় দিতে গিয়ে আদালত বলেন যে, যদিও উক্ত জাহাজটি ধ্বংস করা একটি অন্যায়মূলক কাজ তথাপিও বৃটেন উক্ত দায় হতে মুক্ত থাকবে। কারণ :

প্রথমত : বৃটেন কর্তৃক উক্ত সংঘটিত কাজটি রাষ্ট্রীয় বিশেষ প্রয়োজনে করা হয়েছে;

দ্বিতীয়ত : নিজেদের রক্ষার জন্য করা হয়েছে। কারণ উক্ত জাহাজের নির্গত তেল বৃটেনের পরিবেশ দূষিত করেছিল।

৬. **আত্মরক্ষার অধিকারের ক্ষেত্রে (Self defence) :** জাতিসংঘ সনদের ৫১ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী যখন কোন রাষ্ট্র আত্মরক্ষার্থে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে এতে অপর রাষ্ট্রের কোন ক্ষতি হলেও আত্মপক্ষ সমর্থনকারী রাষ্ট্র এজন্য দায়ি হবে না (Article-34)

রাষ্ট্রীয় উত্তরাধিকার
State Succession

আন্তর্জাতিক আইনে উত্তরাধিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। হুগো গ্রসিয়াস সর্বপ্রথম রোমান আইন থেকে আন্তর্জাতিক আইনে রাষ্ট্রীয় উত্তরাধিকারের ধারণাটি প্রচলিত করেন। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যখন একটি রাষ্ট্র থেকে অন্য এক বা একাধিক রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়, কিংবা একাধিক রাষ্ট্র তাদের সার্বভৌমত্ব বিসর্জন দিয়ে অন্য রাষ্ট্রের সাথে একত্রিত হয় কিংবা একটি রাষ্ট্রের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে অন্য একাধিক রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়, তখনই রাষ্ট্রীয় উত্তরাধিকারের প্রশ্নটি সামনে চলে আসে। খুব সহজ ভাষায় বললে বিষয়টি হলো আন্তর্জাতিক অধিকার ও দায়িত্বের প্রশ্নে নতুন রাষ্ট্রের সাথে পূর্ববর্তী রাষ্ট্র কিংবা অন্য কোন তৃতীয় রাষ্ট্রের সম্পর্ক নিরূপণের প্রক্রিয়া। অন্য কথায় বললে, যখন কোন নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত এক রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব অন্য রাষ্ট্র অর্জন করে, তখনই আন্তর্জাতিক দায়িত্ব ও অধিকার সম্পর্কে রাষ্ট্রীয় উত্তরাধিকারের প্রশ্নটির উদ্ভব হয়।

রাষ্ট্রীয় উত্তরাধিকার সংক্রান্ত সমস্যাবলী নিরসনের জন্য ১৯৭৮ ও ১৯৮৩ সালে ভিয়েনায় দু'টি আন্তর্জাতিক চুক্তি (Convention) স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি দু'টি হলো যথাক্রমে *চুক্তির প্রশ্নের রাষ্ট্রীয় উত্তরাধিকার সংক্রান্ত ভিয়েনা কনভেনশন* এবং *রাষ্ট্রীয় সম্পদ, দলিল দস্তাবেজ ও দেনার প্রশ্নের রাষ্ট্রীয় উত্তরাধিকার সংক্রান্ত ভিয়েনা কনভেনশন*। এই দু'টি কনভেনশনের অনুচ্ছেদ ২- এ রাষ্ট্রীয় উত্তরাধিকারের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এভাবে : 'রাষ্ট্রীয় উত্তরাধিকার হলো ভূ-খণ্ড সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্পর্কের জন্য দায়-দায়িত্বের ক্ষেত্রে এক রাষ্ট্র কর্তৃক অন্য রাষ্ট্রের স্থলাভিষিক্ত হওয়া।'

ভূ-খণ্ডের উপর রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের পরিবর্তনসমূহ নিম্নরূপে হতে পারে :

১. এক রাষ্ট্রের ভূ-খণ্ডের অংশ বিশেষ অন্য আরেক রাষ্ট্রে একীভূত বা একাধিক রাষ্ট্রের মধ্যে বিভাজিত হওয়া;

২. এক রাষ্ট্রের অংশ বিশেষ নিয়ে নতুন রাষ্ট্র সৃষ্টি;

৩. কোন রাষ্ট্রের পুরো ভূ-খণ্ড অন্য রাষ্ট্রে একীভূত হয়ে প্রথম রাষ্ট্রের বিলুপ্তি;

৪. কোন রাষ্ট্রের পুরো ভূ-খণ্ড একাধিক রাষ্ট্রের মধ্যে ভাগ হয়ে যাওয়া;

৫. কোন রাষ্ট্র ভেঙে একাধিক রাষ্ট্র গঠন এবং প্রথম রাষ্ট্রের বিলুপ্তি।

যে রাষ্ট্র থেকে ভূ-খণ্ড বিচ্ছিন্ন হচ্ছে কিংবা যে রাষ্ট্র বিলুপ্ত হচ্ছে, তাকে বলা হয় পূর্ববর্তী রাষ্ট্র (Predecessor state) আর বিচ্ছিন্ন হওয়া অংশকে বা নতুন উদ্ভব হওয়া রাষ্ট্রকে বলা হয় উত্তরাধিকারী রাষ্ট্র (Successor state). রাষ্ট্রীয় উত্তরাধিকারের প্রশ্ন নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতে পারে–

ক. রাষ্ট্রীয় দেনা

রাষ্ট্রীয় উত্তরাধিকার আইনে দেনার প্রশ্নটিই সবচে' স্পর্শকাতর প্রশ্ন, কারণ এখানে পাওনাদার (Creditor) তৃতীয় পক্ষ জড়িত থাকে, যারা কখনোই চায় না যে তাদের দেনাদার পরিবর্তিত হোক। এই কারণেই পাওনাদারের স্বার্থকে ১৯৮৩ সালের ভিয়েনা কনভেনশনের ৩৬ অনুচ্ছেদে এই বলে সংরক্ষণ করা হয়েছে যে, রাষ্ট্রীয় উত্তরাধিকার নীতি পাওনাদারের স্বার্থকে প্রভাবিত করবে না।

দেনা পরিশোধের ক্ষেত্রে এটা সাধারণ নীতি যে, ভূ-খণ্ডের সাথে দেনা উত্তরাধিকার রাষ্ট্রের সাথে যায়। যদি দেনার অর্থ ও সম্পদ সংশ্লিষ্ট ভূ-খণ্ডের উন্নয়নের জন্য ব্যয় হয়ে থাকে, তাহলে উত্তরাধিকারী রাষ্ট্রের দায়িত্ব সেই অর্থ দাতা রাষ্ট্রকে পরিশোধ করে দেয়া। তবে ঐ অর্থ আসলেই উত্তরাধিকারী রাষ্ট্রের উন্নয়নের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে কি না, তা নিরূপণ করা সবসময় সহজ সাধ্য নয়। এক্ষেত্রে সন্দেহের অবকাশ থাকলে উত্তরাধিকারী রাষ্ট্র এই দেনা পরিশোধে বাধ্য নয়।

১৯৮৩ সালের ভিয়েনা কনভেনশনের অনুচ্ছেদ ৪০ অনুসারে যখন কোন রাষ্ট্রের কোন একটি অংশ, মূল অংশ হতে বিচ্ছিন্ন হয়, তখন ভিন্নরূপ চুক্তির অনুপস্থিতে, পূর্ববর্তী রাষ্ট্রের দেনা ন্যায় পরায়ণতার (equitable principle) ভিত্তিতে আনুপাতিক হারে নতুন রাষ্ট্রের উপরও বর্তাবে। এই অনুপাত নির্ধারিত হবে সম্পদ, অধিকার ও সুবিধাদির ভিত্তিতে, যা নতুন রাষ্ট্রের প্রতি ন্যস্ত হয়।

নব্য স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় দেনা কিভাবে নির্ধারিত হবে তা আলোচনা করা হয়েছে অনুচ্ছেদ ৩৮-এ। এই অনুচ্ছেদ অনুসারে, ভিন্নরূপ কোন চুক্তির অনুপস্থিতিতে পূর্ববর্তী রাষ্ট্রের কোন দেনা নতুন রাষ্ট্রের উপর বর্তাবে না। যুদ্ধ সংক্রান্ত দেনাকে বলা হয় 'Odious debts' বা Offensive debts. এই অর্থ যেহেতু স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধেই ব্যবহার করা হয়, কাজেই যুক্তিসঙ্গত কারণেই এই দেনা পরিশোধের কোন দায়িত্ব নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রের নেই। এছাড়াও যে অর্থ নতুন রাষ্ট্রকে অবদমিত করার জন্য কিংবা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, তা পরিশোধের কোন দায় নতুন রাষ্ট্রের নেই।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সে সমস্ত দেনার দায়ভার স্বীকার করেছে, যে অর্থ তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানের উন্নয়নের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ প্রতিটি পাওনাদার রাষ্ট্র বা সংস্থার সাথে সুনির্দিষ্ট পৃথক পৃথক চুক্তি স্বাক্ষর করে তার আন্তর্জাতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে।

খ. চুক্তির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় উত্তরাধিকার

রাষ্ট্রীয় উত্তরাধিকার প্রশ্নে আন্তর্জাতিক চুক্তিও খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই বিষয়গুলো নির্ধারিত হয় চুক্তির প্রশ্নে রাষ্ট্রীয় উত্তরাধিকার সংক্রান্ত ১৯৭৮ সালের ভিয়েনা কনভেনশনের দ্বারা। তবে এই কনভেনশনের বিধানাবলী কেবলমাত্র লিখিত চুক্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সাধারণভাবে চুক্তি উদ্ভূত সব অধিকার ও দায়দায়িত্ব উত্তরাধিকারী রাষ্ট্রের উপর বর্তায় না। ১৯৭৮ সালের

কনভেনশনের ৯ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী রাষ্ট্রের সাথে অপর রাষ্ট্রের চুক্তি যদি উত্তরাধিকারী রাষ্ট্র নিজ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে চায়, তবে তার একপাক্ষিক সম্মতির ভিত্তিতে তা হবে না। সেক্ষেত্রে তাকে অপর দুই রাষ্ট্রের সম্মতি গ্রহণ করতে হবে। আর যদি উত্তরাধিকারী রাষ্ট্র পূর্ববর্তী রাষ্ট্র কর্তৃক সম্পাদিত রাজনৈতিক চুক্তিসমূহ হতে উদ্ভূত দায়দায়িত্ব গ্রহণ করতে না চায়, তবে উত্তরাধিকারী রাষ্ট্রকে ঐ সমস্ত চুক্তি দ্বারা বাধ্য করা যাবে না। উদাহরণ স্বরূপ ভারতের কোন রাজ্য যদি বিযুক্ত হয়ে যায় তবে সেই রাজ্য (নতুন রাষ্ট্র) সার্ক চুক্তি মানতে বাধ্য হবে না। তবে সে যদি মানতে চায় এবং অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহ তাতে সম্মতি প্রদান করে তবে সেই রাজ্য (নতুন রাষ্ট্র) সার্ক চুক্তির আওতাধীন হতে পারে।

তবে ভূ-খণ্ড সংক্রান্ত চুক্তি সার্বভৌমত্বের পরিবর্তন দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় না, অর্থাৎ উত্তরাধিকারী রাষ্ট্র যে ভূ-খণ্ড অর্জন করেছে, সে ভূ-খণ্ড সংক্রান্ত পূর্ববর্তী চুক্তি দ্বারা সে বাধ্য, অর্থাৎ এই সমস্ত চুক্তি ভূ-খণ্ডকেই অনুসরণ করে।

১৯৭৮ সালের কনভেনশনের ১৫ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, যখন একটি রাষ্ট্র কোন ভূ-খণ্ড হারায়, ঐ ভূ-খণ্ডের সঙ্গে সম্পর্কিত চুক্তিউদ্ভূত সকল অধিকার ও দায়দায়িত্বও সে হারায়। অন্যদিকে, যখন কোন রাষ্ট্র ভূ-খণ্ড অর্জন করে, তখন সেই ভূ-খণ্ডে পূর্ববর্তী রাষ্ট্রের চুক্তিসমূহের কার্যকারিতা লোপ পায় এবং তার নিজস্ব চুক্তিসমূহই কেবল অর্জিত ভূ-খণ্ডে প্রয়োগ লাভ করে। আন্তর্জাতিক আইনের এই নীতিটিকে বলা হয় Moving Treaty Frontier Rule বা চলমান চুক্তি সীমানা বিধান। তবে কোন ভূ-খণ্ড অর্জনকারী রাষ্ট্র যদি পূর্বে সম্পাদিত চুক্তির উপকার গ্রহণ করে, তবে তার চুক্তি-উদ্ভূত দায়দায়িত্বও গ্রহণ করা উচিত।

১৯৮৩ সালের কনভেনশনের মতো ১৯৭৮ সালের কনভেনশনেও নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত রাষ্ট্রসমূহের জন্য বিশেষ বিধান রাখা হয়েছে। এক্ষেত্রে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত রাষ্ট্রসমূহ Tabula Rasa মতবাদের অধীনে পূর্ববর্তী রাষ্ট্র কর্তৃক সম্পাদিত কোন চুক্তি দ্বারা বাধ্য হবে না। অন্য ভাবে এই নীতিকে Clean Slate নীতিও বলা হয়; অর্থাৎ পূর্ববর্তী সকল বাধ্যবাধকতা পাশ কাটিয়ে নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত রাষ্ট্রসমূহ তাদের নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে নতুন নতুন চুক্তিতে আবদ্ধ হবে এবং নতুন করে সব কিছু শুরু করবে। তবে এখানে উল্লেখ্য যে, স্বাধীনতাপ্রাপ্ত রাষ্ট্রসমূহ চাইলে পূর্ববর্তী বহুপাক্ষিক চুক্তি বা কনভেনশনের পক্ষ হতে পারে, তবে তাদেরকে বাধ্য করা যাবে না।

গ. রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি

আন্তর্জাতিক আইনের সাধারণ নীতি হলো, হস্তান্তরিত ভূ-খণ্ডে অবস্থিত বা হস্তান্তরিত ভূ-খণ্ডের সঙ্গে সম্পর্কিত সব স্থাবর ও অস্থাবর 'রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি' এবং তহবিলের অধিকার উত্তরাধিকারী রাষ্ট্রের উপর বর্তাবে। 'রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি' বলতে কোন কোন সম্পত্তিগুলো বুঝাবে, তা বর্ণিত হয়েছে ১৯৮৩ সালের ভিয়েনা কনভেনশনের অনুচ্ছেদ ৮-এ। এই অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি বলতে পূর্ববর্তী রাষ্ট্রের সেই সমস্ত সম্পদ, অধিকার বা স্বার্থকে বুঝায়,

যার মালিকানা সার্বভৌমত্ব পরিবর্তনের দিন পর্যন্ত উক্ত রাষ্ট্রের ছিল। আরো উল্লেখ্য যে, স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি পূর্ববর্তী রাষ্ট্রের সীমানার বাইরে বা বিদেশে অবস্থিত হলেও তা যদি হস্তান্তরিত ভূ-খণ্ডের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়, তাহলে তার অধিকার উত্তরাধিকারী রাষ্ট্রের।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের ঠিক পূর্বে পাকিস্তানের যে সকল সম্পত্তি বিদেশের মাটিতে ছিল, বাংলাদেশ তার অংশ পাওয়ার অধিকারী; যদিও পাকিস্তান তা দেয় নি। এমনকি গচ্ছিত তহবিলের কোন অংশও বাংলাদেশকে দেয়া হয় নি। এটা আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন। আন্তর্জাতিক আইন অনুসারেই বাংলাদেশ অবিভক্ত পাকিস্তানের সম্পদের ন্যায্য হিস্যা দাবি করতে পারে।

ঘ. রাষ্ট্রীয় দলিল দস্তাবেজ

উত্তরাধিকারী রাষ্ট্রের নিকট রাষ্ট্রীয় দলিল-দস্তাবেজ হস্তান্তর সংক্রান্ত বিধানাবলী ১৯৮৩ সালের ভিয়েনা কনভেনশনে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। এই ক্ষেত্রে সাধারণ নীতি হচ্ছে এই যে, যে দলিল-দস্তাবেজ পুরোপুরি বা মূলত হস্তান্তরিত ভূ-খণ্ড সংক্রান্ত, সেগুলো উত্তরাধিকারী রাষ্ট্র পাবে। বাস্তবে এই সমস্ত বিষয় সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের আলোচনা বা চুক্তির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়। চুক্তিগুলো এমন প্রকৃতির হতে পারবে না, যা সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের জনগণকে তাদের অতীত ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত হওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। যে সমস্ত দলিল-দস্তাবেজ বা বিষয়াবলী উভয় রাষ্ট্রের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ, তা রাষ্ট্রসমূহ পাল্টাপাল্টি করে নিজেদের কাছে রাখতে পারে অথবা একাধিক কপি করে সেই কপি ভাগ করে নিতে পারে।

ঙ. আন্তর্জাতিক সংগঠনের সদস্যপদ

আন্তর্জাতিক সংগঠনের সদস্যপদ সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় উত্তরাধিকারের নির্ধারণ হয় সংশ্লিষ্ট সংগঠনের গঠনতন্ত্র সাপেক্ষে। আন্তর্জাতিক সংগঠনের গঠনতন্ত্র অনুসরণেই এতদসংক্রান্ত সমস্যাবলীর সমাধান করা হয়। সাধারণত: এই বিষয়ে নিম্নোক্ত নীতি অনুসরণ করা হয় :

ক. ভূ-খণ্ড বা সার্বভৌমত্বের কিছু পরিবর্তন হলেই কোন রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক সংগঠনে তার সদস্যপদ হারায় না; বরং তা আগের মতই অটুট থাকে। অর্থাৎ পূর্ববর্তী রাষ্ট্রের সদস্যপদ বিদ্যমান থাকবে।

খ. আন্তর্জাতিক সংগঠনের কোন সদস্য রাষ্ট্রের ভূ-খণ্ড নিয়ে কোন নতুন রাষ্ট্র গঠিত হলে, সে উত্তরাধিকারী রাষ্ট্র আপনা-আপনি সেই আন্তর্জাতিক সংগঠনের সদস্য বলে বিবেচিত হবে না; বরং তাকে সদস্য পদের জন্য আবেদন করে প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে সদস্য হতে হবে।

উদাহরণ স্বরূপ, ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুইটি আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে জাতিসংঘে ভারতের মূল সদস্যপদ ১৯৪৭ পরবর্তী নতুন ভারত রাষ্ট্রের

জন্য বহাল থাকে এবং পাকিস্তানকে নতুন করে সদস্যপদ লাভের জন্য আবেদন করতে হয়। অবিভক্ত ভারতের অংশ হিসেবে পাকিস্তানও আবেদন ছাড়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে সদস্যপদের দাবি করেছিল; এই দাবি জাতিসংঘে গৃহীত হয় নি। একইভাবে ১৯৭১ সালে পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশের জন্ম হলে জাতিসংঘে পাকিস্তানের সদস্যপদই বহাল থাকে এবং বাংলাদেশকে নতুন করে সদস্যপদ অর্জন করতে হয়।

চ. রাষ্ট্রীয় আইন

এই ক্ষেত্রে সাধারণ নীতিটি হচ্ছে পূর্ববর্তী রাষ্ট্রের যে সমস্ত আইন সংশ্লিষ্ট ভূ-খণ্ডে কার্যকর ছিল, নতুন রাষ্ট্রেও সে সমস্ত আইন কার্যকর থাকবে। নতুন জন্ম নেয়া রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা এড়ানোর জন্য এটা অত্যন্ত জরুরি। উদাহরণ স্বরূপ, বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর এক আদেশের (Order on Laws Continuance in Force) মাধ্যমে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে কার্যকর আইনসমূহকে বাংলাদেশে কার্যকর বলে ঘোষণা দেয়া হয়। তবে যে সমস্ত আইন দেশের মূলনীতি ও গঠনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় তা প্রয়োগযোগ্যতা হারাবে।

একই বৈধতার প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে পূর্ববর্তী রাষ্ট্রের বিচারিক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রেও। সাধারণ নীতি হচ্ছে যে, উত্তরাধিকারী রাষ্ট্রের নীতি ও কাঠামোর পরিপন্থী না হলে, এই সকল সিদ্ধান্ত উত্তরাধিকারী রাষ্ট্রে বলবৎযোগ্য। এই সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়েছিল পাকিস্তানের লাহোর হাইকোর্টে ১৯৪৭ সালে বৃটিশ ইন্ডিয়া বিভাজনের পর উদ্ভূত এক সমস্যায়। মোহাম্মদ এবং অন্যান্য বনাম ক্রাউন নামক এই মামলায় লাহোর হাইকোর্ট মত প্রকাশ করেন যে, বৃটিশ ভারতীয় আদালত কর্তৃক ১৯৪৭ সালের পূর্বে কোন মামলায় প্রদত্ত সাজা পাকিস্তানে কার্যকর করা যাবে, কারণ ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্টের পূর্বে এটি একই রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচিত হত।

ছ. জাতীয়তা

জাতীয়তা নির্ধারণ করে নতুন রাষ্ট্র। এটি নির্ভর করে মূলত নতুন রাষ্ট্র কর্তৃক জাতীয়তা সংক্রান্ত অনুসৃত নীতি ও প্রণীত আইনের উপর। তবে সাধারণত সংশ্লিষ্ট ভূ-খণ্ডে বসবাসকারী পূর্ববর্তী রাষ্ট্রের জাতীয়তাভুক্ত ব্যক্তিবর্গ নতুন রাষ্ট্রের জাতীয়তা লাভ করেন। আবার অনেক সময় জনগণকেই জাতীয়তা বেছে নেয়ার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় দেয়া হয়। যেমনটি হয়েছিল ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাজনের সময়। আবার যে ক্ষেত্রে সার্বভৌমত্ব পরিবর্তনের সময় ঐ রাষ্ট্রের নাগরিকগণ কোন তৃতীয় রাষ্ট্রে অবস্থান করেন, সেক্ষেত্রে ভূ-খণ্ডগত যোগসূত্র অর্থাৎ রাষ্ট্রের যে অংশের সাথে তার কার্যকর যোগসূত্র বেশি বিদেশে বসবাসকারী ব্যক্তি সে রাষ্ট্রেরই জাতীয়তাভুক্ত হবেন।

জ. ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও ব্যক্তিগত অধিকার

এই বিষয়টি পুরোপুরি নির্ভর করে উত্তরাধিকারী রাষ্ট্রের এতদসংক্রান্ত নীতির উপর। তবে সাধারণ নীতি হচ্ছে, কোন ভূ-খণ্ডের সার্বভৌমত্ব পরিবর্তিত হলে সে ভূ-খণ্ডে বসবাসকারীদের

ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা রাষ্ট্রীয় আইন থেকে সৃষ্ট কোন ব্যক্তিগত অধিকার বিনষ্ট হয় না। তবে, উত্তরাধিকারী রাষ্ট্র তার নিজস্ব নীতির মাধ্যমে এই অধিকার খর্ব করতে পারে। এমনকি এরূপে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার বা অন্যান্য অধিকার খর্ব করার কারণে উত্তরাধিকারী রাষ্ট্র যে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে, তা-ও নয়। এই বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রের নিজস্ব আইন ও নীতির উপর নির্ভরশীল; আন্তর্জাতিক আইনের ভূমিকা এখানে খুবই সীমিত। তবে বিদেশী নাগরিকদের সম্পত্তি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আইনের নিয়মনীতি অনুসরণ করতে হয়। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।

ঝ. ব্যক্তিগত চুক্তি ও টর্ট হতে উদ্ভূত দায়

আন্তর্জাতিক আইনের সাধারণ নীতি হচ্ছে উত্তরাধিকারী রাষ্ট্র, পূর্ববর্তী রাষ্ট্রের কোন ব্যক্তিগত চুক্তি বা টর্ট হতে উদ্ভূত দায় বহনে বাধ্য নয়। দায়ী রাষ্ট্রের বিলুপ্তির সাথে সাথে দায়েরও বিলুপ্তি ঘটে, ফলে উত্তরাধিকারী রাষ্ট্র কোন দায় বহনে বাধ্য নয়। একাধিক মামলায় এই নীতির প্রতিফলন ঘটেছে।

মামলা : West Rand Gold Mining Co. Ltd. Vs. R; ওয়েস্ট র‍্যান্ড গোল্ড মাইনিং কো. লি. বনাম আর; (King's Bench Division, 1905)

মামলার ঘটনা : West Rand Gold Mining Co. Ltd. ছিল ইংল্যান্ডে রেজিস্ট্রিকৃত একটি কোম্পানি। ট্রান্সভ্যাল নামক স্থানে স্বর্ণের খনিতে খননকার্যে কোম্পানিটি নিযুক্ত ছিল। ১৮৯৯ সালের অক্টোবরে দক্ষিণ আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র কোম্পানিটির দু'টি স্বর্ণ বোঝাই পার্সেল আটক করে। তৎকালে বিদ্যমান আইন অনুসারে কোম্পানি বরাবরে স্বর্ণ বোঝাই পার্সেল দু'টি কিংবা সমমূল্যের অর্থ প্রদান করতে দক্ষিণ আফ্রিকা প্রজাতন্ত্র বাধ্য ছিল। এই দাবি আদায় হওয়ার পূর্বেই বৃটেন এবং দক্ষিণ আফ্রিকা প্রজাতন্ত্রের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় এবং ১১ অক্টোবর ১৮৯৯ বৃটেন দক্ষিণ আফ্রিকা দখল করে ফেলে। এরপর West Rand Gold Mining Co. Ltd. স্বর্ণ বোঝাই দু'টি পার্সেল অথবা সমমূল্যের অর্থ দাবি করে বৃটেনে পিটিশন দায়ের করে। তারা যুক্তি দেখায় যে, যেহেতু বৃটেন দক্ষিণ আফ্রিকা দখল করেছে; কাজেই দক্ষিণ আফ্রিকার যাবতীয় দায় এখন বৃটেনের উপরই বর্তাবে।

বিচার্য বিষয় : বৃটেন আটককৃত স্বর্ণ বা সমমূল্যের অর্থ প্রদানে বাধ্য কি না?

সিদ্ধান্ত : এই মামলায় আদালত সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে, দখলকৃত রাষ্ট্রের কোন দায় বহনে দখলকারী রাষ্ট্র বাধ্য নয়, কারণ দখলকৃত রাষ্ট্রের আইনগত অস্তিত্ব বিলুপ্তির সাথে সাথে ব্যক্তিগত চুক্তি উদ্ভূত দায়ও (Private Contractual Obligation) বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কাজেই বৃটেন আটককৃত স্বর্ণ বা সমমূল্যের অর্থ প্রদানে বাধ্য নয়।

মামলা : Robert E. Brown Claims; রবার্ট ই. ব্রাউন-এর দাবি; (USA Vs. Mexico, US-Mexican Joint Claims Commission, 1926)

ব্রাউন নামক জনৈক আমেরিকান নাগরিক দক্ষিণ আফ্রিকায় স্বর্ণ অনুসন্ধানের লাইসেন্স প্রার্থনা করে আবেদন করে। দক্ষিণ আফ্রিকার আইন অনুসারে সে এরূপ লাইসেন্স পাওয়ার অধিকারী ছিল; কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার নির্বাহী পরিষদ (Executive Council) আইনটি বাতিল করে দেয়। অতঃপর মি. ব্রাউন পরিষদের এই কাজকে ক্ষমতা বহির্ভূত আখ্যা দিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার আদালতের স্মরণাপন্ন হয়। আদালত রায়ে বলেন যে, নির্বাহী পরিষদের এই কাজ অসাংবিধানিক এবং আদালত মি. ব্রাউনকে ক্ষতিপূরণ দাবি করার অনুমতি প্রদান করেন।

ক্ষতিপূরণ দাবির শুনানী শুরু হওয়ার পূর্বেই প্রধান বিচারপতিকে বরখাস্ত করা হয় এবং বিচার বিভাগকে আদেশ প্রদান করা হয় সাংবিধানিকতার প্রশ্নে না গিয়ে বর্তমান আইনগুলো প্রয়োগ করার জন্য। এরূপ অবস্থায় মি. ব্রাউনকে ক্ষতিপূরণ দাবি করার জন্য পুনর্বিচার কার্যক্রম শুরু করার জন্য বলা হয়। এমনই প্রেক্ষাপটে বো'র যুদ্ধ শুরু হয় এবং যুক্তরাজ্য দক্ষিণ আফ্রিকা দখল করে নেয়। তখন যুক্তরাষ্ট্র মি. ব্রাউনের পক্ষে যুক্তরাজ্যের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করে।

বিচার্য বিষয় : দক্ষিণ আফ্রিকা প্রজাতন্ত্রের কৃতকাজের জন্য বৃটেন ক্ষতিপূরণ দানে বাধ্য কি না?

সিদ্ধান্ত : এই মামলায় আদালত সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে, এরূপ ক্ষতিপূরণ প্রদানে যুক্তরাজ্য বাধ্য নয়; কারণ আন্তর্জাতিক আইনের সাধারণ নীতি হচ্ছে– কোন রাষ্ট্রের দেওয়ানী অন্যায়ের ক্ষতিপূরণ অন্য (উত্তরাধিকারী) রাষ্ট্র বহন করতে বাধ্য নয়।

ঞ. সরকার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় উত্তরাধিকার

সরকার পরিবর্তন একটি অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন এবং রাষ্ট্রীয় উত্তরাধিকার থেকে বিষয়টি ভিন্ন। এই ধরনের উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূ-খণ্ডের কোন পরিবর্তন হয় না। এক সরকার যখন অন্য সরকারের স্থলাভিষিক্ত হয়, তখনই পূর্ববর্তী সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড হতে উদ্ভূত দায়দায়িত্বের প্রশ্নেই এই ধরনের উত্তরাধিকারের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। পূর্ববর্তী সরকারের যে সমস্ত কর্মকাণ্ড অপর কোন রাষ্ট্র বা তার নাগরিককে অন্তর্ভুক্ত করে, তখন সরকারের উত্তরাধিকারের প্রশ্নটি আন্তর্জাতিক আইনের অন্তর্ভুক্ত হয়। এসকল ক্ষেত্রে যে নীতিটি প্রযোজ্য, তা হলো স্থায়ীত্ব নীতি (Principle of Continuity) অর্থাৎ যেহেতু সরকার পরিবর্তিত হলেও রাষ্ট্রের কোন পরিবর্তন নেই, সেহেতু পূর্ববর্তী সরকারের আন্তর্জাতিক অধিকার ও দায়দায়িত্ব পরবর্তী সরকারের উপর বহাল থাকবে।

তবে Principle of Continuity বা স্থায়ীত্ব নীতিটি নির্বিচারে প্রয়োগ করার সুযোগ নেই। এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে, যখন এই নীতিটি বাস্তবসম্মতভাবে প্রয়োগ করা

সম্ভব নয়। যেমন, কোন বৈপ্লবিক সরকার রাষ্ট্রের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামোতে এমন আমূল পরিবর্তন সাধন করতে পারে, যার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন সরকারের পক্ষে পূর্ববর্তী সরকারের সব দায়দায়িত্ব নীতিগতভাবে মেনে নেয়া সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে 'স্থায়ীত্ব নীতি' অনুসরণ করার সুযোগ নেই। এমনটি ঘটেছিল ১৯১৭ সালে রাশিয়া ঐতিহাসিক অক্টোবর বিপ্লবের পর। নতুন সোভিয়েত সরকার পূর্ববর্তী জার আমলের দায়দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকার করে।

সরকারি উত্তরাধিকার সংক্রান্ত প্রশ্ন সবচেয়ে বেশি উত্থাপিত হয় যখন নির্বাচিত সরকারকে অনিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সরিয়ে কোন স্বৈরশাসক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় এবং এই স্বৈরতান্ত্রিক সরকারকে গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে সরিয়ে কোন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। মাঝখানের সময়টিতে স্বৈরতান্ত্রিক সরকার কর্তৃক সম্পাদিত কোন কাজ হতে উদ্ভূত দায়দায়িত্ব নতুন সরকারের উপর বাধ্যকরী হবে কি না, তা একটি বড় প্রশ্ন। তবে এসব ক্ষেত্রে যদি বহিষ্কৃত সরকার আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে দখলদার সরকারের অবৈধতা সম্পর্কে অবহিত করে এবং ঘোষণা দেয় যে, এই সরকারের কোন দায়দায়িত্ব পরবর্তী বৈধ সরকার বহন করবে না, তাহলে এই সরকারের পতনের পর পরবর্তী সরকার স্বৈর সরকারের দায়দায়িত্ব বহনে বাধ্য হবে না। আর যদি অনিয়মতান্ত্রিক সরকারের কার্যক্রমকে পরবর্তী সরকার মেনে নেয় এবং কোন প্রশ্ন উত্থাপন না করে, তবে সেই সরকারের দায়দায়িত্ব পরবর্তী সরকারকে মেনে নিতে হবে।

১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ জেনারেল এরশাদ অনিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা দখল করে সামরিক আইন জারি করেন এবং ২য় জাতীয় সংসদ ভেঙে দেন। ১০ অক্টোবর, ১৯৮৩ সালে তিনি নিজেকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে ঘোষণা দেন এবং এই ঘোষণাকে বৈধতা প্রদানের লক্ষ্যে ২১ মার্চ ১৯৮৫ সালে দেশব্যাপী হ্যাঁ-না ভোট অনুষ্ঠিত করান; যা ছিল একটি প্রহসনের নির্বাচন। ১৫ অক্টোবর, ১৯৮৬ সালে তিনি আরেকটি জাতীয় নির্বাচনের আয়োজন করেন এবং তার সরকারকে একটি বৈধ চেহারা দেয়ার চেষ্টা করেন। বস্তুত প্রথমত তার সরকার ছিল de facto সরকার এবং পরবর্তীতে তা আইনী চেহারাও লাভ করে। ইত্যবসরে তিনি বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন এবং অনেক চুক্তি স্বাক্ষর করেন; যার অধিকাংশই ছিল ঋণ সম্পর্কিত। ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০ সালে এরশাদ সরকারের পতন ঘটে এবং তিনি গ্রেপ্তার হন। ১৯৯১ সালে জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে খালেদা জিয়ার সরকার ক্ষমতায় আসে। কি দেশের প্রধান কোন রাজনৈতিক দলই এরশাদ সরকার কর্তৃক স্বাক্ষরিত দ্বি-পাক্ষিক বা ব পাক্ষিক আন্তর্জাতিক চুক্তির বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করে নি; সে সময়ের সংসদগুলোবে বৈধ সংসদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কাজেই এরশাদ সরকারের যাবতীয় দায়দায়িত্ব খালেদা জিয়ার সরকার বহন করে।

একই প্রসঙ্গে **Tinoco Arbitration, (Costa Rica Vs. UK, 1923)** মামলাও প্রাসঙ্গিক। এই মামলাতেও দখলদার সরকারের কার্যক্রমকে বৈধতা দেয়া হয়েছে। মামলাটি পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

বিদেশীদের প্রতি রাষ্ট্রীয় আচরণ

Treatment of Aliens

প্রত্যেক রাষ্ট্রের এখতিয়ার আছে সে রাষ্ট্রে বসবাসকারী বিদেশী নাগরিকের উপর কিছুমাত্রায় অধিকার চর্চার। কিন্তু সেই এখতিয়ার যদি নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করে, তবে জন্ম নেয় রাষ্ট্রীয় দায়দায়িত্বের। তাই আইনত ব্যক্তি (Legal person) সহ যে কোন বিদেশী নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্রের আচরণের মাত্রা, অধিকার চর্চার সীমা নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন। রাষ্ট্রে অবস্থানকারী বিদেশীদের প্রতি রাষ্ট্রীয় আচরণ কী হবে তা প্রত্যেকটি রাষ্ট্র স্বয়ং নির্ধারণ করে, সুতরাং স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে রাষ্ট্রে বসবাসরত বিদেশীদের প্রতি আচরণ বিধি রাষ্ট্র ভেদে ভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক।

যদি একজন বিদেশীর অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হয় বা বাধাগ্রস্ত হয়, তবে ব্যক্তি হিসেবে তার অধিকার নয় বরং সে যে দেশের নাগরিক, সেই দেশের অধিকারও খর্ব হচ্ছে বলে ধরা হয়। ফলে রাষ্ট্রসমূহের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রে অবস্থানরত বিদেশীদের প্রতি রাষ্ট্রের আচরণের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে, তবে কূটনৈতিক সম্পর্কের সাথে এর কোন যোগ নেই। লক্ষ্যণীয় যে বিদেশীদের মর্যাদা নির্ধারণের ক্ষেত্রে পশ্চিমা দেশ ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর আচরণ স্পষ্টতই ভিন্ন। প্রবাসে কোন ব্যক্তি সমস্যায় পতিত হলে স্বভাবতই নিজ রাষ্ট্রের কাছে সাহায্য প্রত্যাশা করে। প্রবাসী নাগরিক আনুষ্ঠানিকভাবে বিদেশে নিজ দেশের প্রতিনিধিত্ব না করলেও বাস্তবত নাগরিকের কোন সংকটে রাষ্ট্র নিজেকে একটি পক্ষ বলে মনে করে এবং নাগরিকের সংকট নিজের সংকট মনে করে নিজ দেশের নাগরিককে সুরক্ষা দেবার ব্যবস্থা করে।

সুতরাং প্রবাসে অবস্থানকালে রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা পাবার ব্যাপারটি সম্পূর্ণই নির্ভর করছে নাগরিকত্ব কিংবা জাতীয়তার উপর। রাষ্ট্র কেবল তখনই সুরক্ষা প্রদানে এগিয়ে আসে যখন বিবেচনা করে যে সুরক্ষা প্রত্যাশী ব্যক্তি প্রকৃতার্থে তার নাগরিক। এমন ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কেবল সুরক্ষার ব্যবস্থা করে তাই নয়, বরং সুরক্ষা প্রদান নিজের দায়িত্ব বলেও মনে করে।

কোন কোন ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রবাসে নিজ দেশের নাগরিককে এ সুরক্ষা প্রদান ভিন্নখাতে প্রবাহিত হতে পারে। তখন প্রবাসী নাগরিকের দাবি কেবল ব্যক্তির দাবি বলে পরিগণিত না হয়ে উঠতে পারে রাষ্ট্রের দাবি বলে। আন্তর্জাতিক আইনে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রবাসী নাগরিকের দাবিকে নিজ দাবি হিসেবে বিবেচনা করে দাবি আদায়ের চেষ্টা বহুদিন ধরে স্বীকৃত।

আর যখন এভাবে প্রবাসী কোন ব্যক্তির দাবিকে রাষ্ট্র নিজ দাবি বিবেচনা করে রাষ্ট্র স্বয়ং ব্যক্তির প্রতিনিধিত্ব করে, তখন তাকে বলে কূটনৈতিক সুরক্ষা। অর্থাৎ প্রবাসী নাগরিক যদি প্রবাসে কোন সমস্যার সম্মুখীন হন এবং তার রাষ্ট্র ঐ সমস্যাকে নিজের সমস্যা বিবেচনা করে তার সমাধানে এগিয়ে আসে, তবে তা 'Diplomatic Protection' বলে আখ্যায়িত হয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে ব্যক্তির দাবি উত্থাপনের মাধ্যমে রাষ্ট্র মূলত নিজের অধিকারের দাবিই উত্থাপন করে।

কূটনৈতিক সুরক্ষা

নাগরিকত্ব কোন রাষ্ট্র ও তার নাগরিকের মধ্যে বন্ধন হিসেবে কাজ করে। এটি ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রের মধ্যকার একটি যোগসূত্র।

নাগরিকদের দাবিকে নিজ দাবি হিসেবে স্বীকৃতি দানের নীতি 'কূটনৈতিক সুরক্ষা' বা 'Diplomatic Protection' নামে পরিচিত। তবে এ সুরক্ষা দানে রাষ্ট্র বাধ্য নয়, বরং এটি সার্বভৌম ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ। সার্বভৌম রাষ্ট্র যে প্রয়োজনবোধে নিজের নাগরিককে কূটনৈতিক সুরক্ষা প্রদানে সম্পূর্ণ অধিকারী, এই মূলনীতি **Mavrommatis Palestine Concession Case** -এ সুনির্দিষ্টতা লাভ করে।

মামলা : Mavrommatis Palestine Concession Case; ম্যাভরোম্যাটিস প্যালেস্টাইন ছাড় মামলা; (Greece Vs. Uk, P.C.I.J. 1924)

এই মামলায় আন্তর্জাতিক স্থায়ী বিচার আদালত (PCIJ) মত ব্যক্ত করে যে, আন্তর্জাতিক আইনের খুবই সাধারণ একটি নীতি হচ্ছে যে যদি কোন রাষ্ট্র কর্তৃক আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গের ফলে কোন বিদেশী নাগরিক ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং বিদেশী ব্যক্তিটি স্বাভাবিক পন্থায় নিজের দাবি প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়, তবে সেই বিদেশীর রাষ্ট্রের অধিকার আছে তার নিজ নাগরিককে সুরক্ষা প্রদান করার। এভাবে ব্যক্তির দাবিকে নিজের দাবি হিসেবে তুলে নেয়া এবং তার পক্ষ হতে আন্তর্জাতিক বিচার ব্যবস্থার আশ্রয় নেয়ার মাধ্যমে রাষ্ট্র মূলত নিজের অধিকারই ব্যক্ত করে এবং একই সাথে নিজের নাগরিককে অধিকার ও আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি রাষ্ট্রের আস্থা ও বিশ্বাসের প্রকাশ ঘটায়।

এই মামলার বিবরণে প্রকাশ, Mr. Mavrommatis নামক একজন গ্রিক নাগরিক অটোম্যান কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্যালেস্টাইনে কিছু নির্মাণকার্য সম্পন্ন করার Concession লাভ করেন। পরে প্যালেস্টাইন বৃটেনের অধিকারে চলে যায়। গ্রিক সরকার অভিযোগ করেন যে, ১৯২১ সাল হতে বৃটেন ঐ Concession চুক্তি অনুযায়ী তার নাগরিকের পূর্ণ অধিকার প্রদানে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে। এ কারণে তারা ৬% সুদসহ ক্ষতিপূরণ হিসেবে ১২১,৩৪৫ পাউণ্ড দাবি করে। আদালতের বিবেচনার বিষয় হল যে, ব্যক্তির দাবি রাষ্ট্র পক্ষ হয়ে উত্থাপিত করতে পারে কি না? পূর্বাপর বিবেচনা করে আদালত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে, আন্তর্জাতিক আইনের বিধান লঙ্ঘন করে কোন রাষ্ট্র কোন বিদেশীর প্রতি অন্যায্য আচরণ করলে ঐ বিদেশীর নিজ রাষ্ট্র তার নাগরিককে সুরক্ষা দানের অধিকার রাখে। তাই এক্ষেত্রে গ্রীস তার নাগরিককে সুরক্ষা দান করতে পারে।

তবে কোন রাষ্ট্র কোন ব্যক্তিকে কূটনৈতিক সুরক্ষা দিতে পারে কি না বিষয়টি সম্পূর্ণ নির্ভর করে সেই ব্যক্তির সাথে সেই রাষ্ট্রের সত্যিকারার্থে কোন যোগসূত্র আছে কি না তার উপর। রাষ্ট্র আর ব্যক্তির মধ্যে কোন যোগসূত্র না থাকলে রাষ্ট্র কোন ব্যক্তিকে কূটনৈতিক সুরক্ষা দেয়ার অধিকারী নয়। ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের এই যোগসূত্র বিবেচনা করতে গেলে মূলত জাতীয়তার প্রশ্নটিই এসে যায়। তবে নাগরিকত্ব কিংবা জাতীয়তার প্রশ্নটি কিন্তু আবার

আন্তর্জাতিক আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। ব্যাপারটি সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত হয় রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ আইনের মাধ্যমে-অর্থাৎ রাষ্ট্র ইচ্ছা করলে তার খুশি মত যে কোন ব্যক্তিকে নাগরিকত্ব দান করতে পারে। এভাবে কোন ব্যক্তি হয়তো একাধিক রাষ্ট্রের নাগরিক হতে পারে। ব্যক্তিকে যে সব রাষ্ট্র নাগরিকত্ব প্রদান করলো সবারই কিন্তু একটা নৈতিক দায়িত্ব দাঁড়িয়ে যায় প্রয়োজন বোধে ব্যক্তিকে কূটনৈতিক সুরক্ষা প্রদানের। সে ক্ষেত্রে মূলত বিবেচনা করা হয় কোন্ রাষ্ট্রের সাথে ব্যক্তির সত্যিকার যোগসূত্র আছে। ব্যক্তিকে নিজ রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব প্রদান অতঃপর কূটনৈতিক সুরক্ষা প্রদান রাষ্ট্রের সার্বভৌম ইচ্ছার অধীন, কিন্তু একটা মাত্র কর্তব্য কিংবা নিয়ম রাষ্ট্রকে পালন করতে হয়; সেটি হচ্ছে এরূপ সুরক্ষা প্রদান যেন অন্য রাষ্ট্রের আইনগত অধিকার খর্ব না করে। অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত অন্য কোন রাষ্ট্র ক্ষতিগ্রস্ত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত কোন রাষ্ট্র কোন ব্যক্তিকে নিজ নাগরিকত্ব প্রদানের ক্ষমতা রাখে। বিষয়টি প্রথমবারের মত বিবেচনা করা হয়েছিল **Nottebohm Case**-এ।

মামলা : Nottebohm Case; নটবম মামলা; (Liechtenstein Vs. Guatemala, ICJ,1955)

ফ্রেড্রিক নটবম ১৮৮১ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর জার্মানীর হ্যামবুর্গ এ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জন্মসূত্রে জার্মান নাগরিক ছিলেন এবং ১৯৩৯ সালে লিকটেইনস্টাইন এর নাগরিকত্ব প্রার্থনাকালেও জার্মান নাগরিকত্বই ধারণ করছিলেন।

১৯০৫ সালে নটবম গুয়েতেমালায় চলে যান। সেখানেই বসবাস ও ব্যবসা-বাণিজ্য করতে থাকেন। তার ব্যবসার প্রধান কেন্দ্র ছিল গুয়েতেমালায়। এরপর থেকে জার্মানীর সাথে তার কেবল ব্যবসায়িক সম্পর্কই বজায় ছিল এবং ব্যবসায়িক কারণেই সাধারণত তিনি জার্মানিতে যেতেন। অবশ্য তার কিছু আত্মীয়-স্বজন জার্মানীতে ছিল। তিনি অবশ্য ১৯৪৩ সালের পর থেকে স্থায়ীভাবে গুয়েতেমালাতেই বসবাস শুরু করেন।

১৯৩৮ সালে তার কোম্পানি পরিচালনার ক্ষমতা তার এটর্নিকে দিয়ে তিনি ইউরোপ চলে যান। সেখান থেকে তিনি হ্যামবুর্গ, ভাদুগ এবং লিকটেইনস্টাইন যায়। ১৯৩৯ সালের ৯ অক্টোবর তার এটর্নি নটবম-এর লিকটেইনস্টাইনে নাগরিকত্বপ্রাপ্তির জন্য একটি দরখাস্ত দাখিল করেন। কিন্তু ৪ জানুয়ারি ১৯০৪ সালের নাগরিকত্ব আইন অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে লিকটেইনস্টাইনের নাগরিকত্ব পেতে হলে কিছু শর্তাবলী পূরণ করতে হতো। এর মধ্যে অন্যতম হলো আবেদনকারী ব্যক্তিকে অবশ্যই একাদিকক্রমে তিন বছর লিকটেইনস্টাইনে বসবাস করতে হবে। নটবম তার দরখাস্তে এই শর্তটি তার জন্য শিথিলকরণপূর্বক সত্ত্বর নাগরিকত্ব লাভের প্রার্থনা করেন। অতঃপর ১৩ অক্টোবর ১৯৩৯ সালে ফ্রেডরিক নটবমকে সুপ্রীম রেগুলেশনের মাধ্যমে লিকটেইনস্টাইনের নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়। লিকটেইনস্টাইনের পাসপোর্ট পাবার পর তিনি জুরিখ এ অবস্থানরত গুয়েতেমালার কাউন্সিলরের সাথে ১০ ডিসেম্বর ১৯৩৯ এ দেখা করেন এবং ১৯৪০ সালের প্রথম দিকে গুয়েতেমালায় ফিরে এসে তিনি নাগরিকত্বের পরিবর্তন এর ঘটনা লিপিবদ্ধ করেন এবং গুয়েতেমালায় প্রবাসী হিসেবে নাম রেজিস্ট্রি করেন এবং পুনরায় সেখানে ব্যবসায়ী কার্যক্রম শুরু করেন।

১৯৪৩ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান নাগরিক বিবেচনা করে নটবমকে সেনাবাহিনী গ্রেফতার করে যুক্তরাষ্ট্রে প্রেরণ করে এবং গুয়েতেমালা তার সমস্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করে

নেয়। ১৯৪৬ সালে যুদ্ধ শেষে নটবম গুয়েতেমালায় ফিরতে চাইলে তাকে গুয়েতেমালায় ঢুকতে দেয়া হয় না। অতঃপর তিনি লিকটেইনস্টাইনে চলে যান।

১৯৫১ সালের ১৭ ডিসেম্বর লিকটেইনস্টাইন সরকার আন্তর্জাতিক আদালতে দাবি উত্থাপন করে যে গুয়েতেমালা সরকার তার দেশের নাগরিক ও নাগরিকের সম্পত্তির প্রতি আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘনমূলক আচরণ করছে এবং সে কারণে লিকটেইনস্টাইন সম্পত্তি প্রত্যার্পণ ও ক্ষতিপূরণের দাবি জানাচ্ছে।

মামলায় বিচার্য বিষয় ছিল, লিকটেইনস্টাইন নটবম এর পক্ষ হয়ে দাবি উত্থাপন করতে পারে কি না? এ সমস্যা নির্ণয় ও সমাধানের প্রকৃত মাপকাঠি কি হবে?

আদালতে ১১ বনাম ৩ ভোটে নির্ধারিত হয় লিকটেইনস্টাইন নটবম এর পক্ষ থেকে দাবি উত্থাপন করতে পারে না, কেন না নটবম এর মূলত লিকটেইনস্টাইনের সাথে কোন কার্যকরী যোগসূত্র নেই বরং তুলনামূলকভাবে লিকটেইনস্টাইনের এর চেয়ে গুয়েতেমালার সাথে নটবম এর যোগসূত্র বেশি। নটবম মাত্র দু'বার খুবই সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য লিকটেইনস্টাইনে গিয়েছিল। সুতরাং এমন পরিস্থিতিতে যদি লিকটেইনস্টাইনকে নটবম-এর কূটনৈতিক সুরক্ষা দানের অধিকারী করা হয় তবে তা Multiplicity of Conflicting claims-এর জন্ম দেবে। সুতরাং এমতাবস্থায় এমন রাষ্ট্রকেই কূটনৈতিক সুরক্ষাদানে অধিকারী করা উচিত যার সাথে নাগরিকের 'প্রকৃত যোগসূত্র' রয়েছে। অর্থাৎ এ মামলায় স্পষ্ট হল যে, যে কোন রাষ্ট্র চাইলে কোন নাগরিককে নাগরিকত্ব দিতে পারে কিন্তু কূটনৈতিক সুরক্ষা দিতে পারে কেবল সেই রাষ্ট্র যার সাথে নাগরিকের 'প্রকৃত যোগসূত্র' আছে। এ মামলার মাধ্যমে Doctrine of Genuine Link প্রতিষ্ঠা পায়।

প্রকৃত যোগসূত্রের নীতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সমস্যা সমাধানে কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে, কেন না কার্যকরী জাতীয়তা নির্ধারণ অত্যন্ত জটিল, কিন্তু প্রকৃত যোগসূত্র নির্ধারণ সম্ভব। বিশেষ করে দ্বৈত নাগরিকত্বের ক্ষেত্রে কূটনৈতিক সুরক্ষা প্রদানে অধিকারী রাষ্ট্র নির্ধারণে এ নীতি অত্যন্ত কার্যকরী।

মামলা : Merge Claims; মার্জ-এর দাবি; (Italy Vs. U.S.A., 1955)

মামলায় মিসেস মার্জ ছিল আমেরিকান নাগরিক, তিনি ১৯০৯ সালে আমেরিকায় জন্মগ্রহণ করেন এবং সকল সময় আমেরিকার নাগরিক হিসেবেই নিজেকে প্রকাশ করতেন এবং এ নাগরিকত্ব তিনি হারানও নি কিংবা বর্জনও করেন নি। কিন্তু বৈবাহিক সূত্রে তিনি ইতালিয়ান নাগরিকত্ব পান। ১৯৩৩ সালে তিনি জনাব মার্জকে বিবাহ করেন এবং ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত রোমেই বসবাস করেন। তার স্বামী টোকিওতে অবস্থিত ইতালিয়ান দূতাবাসে চাকরিসূত্রে গমনকালে মিসেস মার্জও সেখানে চলে যান এবং ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত টোকিওতে অবস্থান করেন।

অতঃপর তিনি নয় মাসের জন্য মার্কিন রাষ্ট্রে এসে আবার ইতালি চলে যান। মিসেস মার্জ ইতালি, টোকিও সব স্থানেই নিজেকে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে নাম রেজিস্ট্রি করেন।

১৯৪৮ সালে যুক্তরাষ্ট্র মিসেস মার্জ-এর পক্ষ হয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিসেস মার্জ এর রোমে

অবস্থিত ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ দাবি করে। ইতালি ক্ষতিপূরণ দিতে অস্বীকৃতি জানায়, তারা যুক্তি দেখায় যে মিসেস মার্জ তাদের নাগরিক সুতরাং যুক্তরাষ্ট্র তার পক্ষ থেকে ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারে না।

মামলাটিতে একটা ব্যাপার স্পষ্ট ছিল যে মার্জ যুক্তরাষ্ট্র ও ইতালি দু'দেশেরই নাগরিক। কেবল নির্ধারণের বিষয় ছিল যে, কোন্ দেশের সাথে তার প্রকৃত যোগসূত্র আছে, অতঃপর কোন দেশ তাকে কূটনৈতিক সুরক্ষা প্রদানে অধিকারী।

আন্তর্জাতিক আদালত ইতালির পক্ষে রায় প্রদান করেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের দাবি নাকচ করেন। আদালত উক্ত সিদ্ধান্তের পেছনে যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, সকল সার্বভৌম রাষ্ট্র সমান, সুতরাং যখন কোন ব্যক্তির দ্বৈত নাগরিকত্ব থাকে সে ক্ষেত্রে সমমর্যাদা সম্পন্ন রাষ্ট্র দু'টোর মধ্যে সেই রাষ্ট্রই কূটনৈতিক সুরক্ষা প্রদানে অধিকারী হয় যার সাথে মূলত ব্যক্তির 'প্রকৃত যোগসূত্র আছে'। প্রকৃত যোগসূত্র নির্ধারণে ব্যক্তিটি সাধারণত কোথায় বসবাস করে তা একটি বিবেচ্য বিষয়। অবশ্য এটাই একমাত্র বিবেচ্য বিষয় নয়, এছাড়াও ব্যক্তির অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও পারিবারিক কার্যক্রম ও রাষ্ট্র দু'টির মধ্যে ব্যক্তির সাথে কোনটির যোগাযোগ বেশি সে বিষয়গুলোও বিবেচনায় আনা যায়। এসব বিষয় বিবেচনা করলে মূলত দেখা যায় যে মিসেস মার্জ এর কার্যকরী বা প্রকৃত যোগসূত্র আছে ইতালির সাথে সুতরাং যুক্তরাষ্ট্র তার পক্ষ হয়ে ক্ষতিপূরণের দাবি উত্থাপন করতে পারে না।

প্রকৃত যোগসূত্রের এই নীতিটি কেবল মাত্র প্রাকৃতিক ব্যক্তি নয়, আইনগত ব্যক্তির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এমনই একটি মামলা হলো- **Barcelona Traction, Light & Power Co. Ltd. (Belgium Vs. Spain, IW, 1970)**। এই মামলা হতে এটা স্পষ্ট যে ব্যক্তি তা প্রাকৃতিক কিংবা আইনগত সত্তা যাই হোক না কেন তাকে কূটনৈতিক সুরক্ষা প্রদান করে আন্তর্জাতিক আইনে তার দাবি তুলে ধরতে পারে কেবল সেই রাষ্ট্র যার সাথে তার প্রকৃত যোগসূত্র রয়েছে। কিন্তু কূটনৈতিক সুরক্ষা প্রদান করে আন্তর্জাতিক বিচার ব্যবস্থার আশ্রয় লাভের একটা পূর্বশর্ত আছে- শর্তটি হচ্ছে : কোন রাষ্ট্র তার নাগরিককে কূটনৈতিক সুরক্ষা প্রদান করে দাবি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় নিষ্পত্তি করার পূর্বে অবশ্যই অধিকার ভঙ্গকারী রাষ্ট্রের অন্তর্গত সম্ভাব্য সকল প্রতিকার ব্যবস্থা প্রার্থনা করতে হবে।

প্রতিষ্ঠিত বিধান এই যে, আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা নেয়ার আগে স্থানীয় রাষ্ট্রের আইনের অধীন বিদ্যমান ও প্রয়োগযোগ্য সকল প্রতিকার প্রার্থনা করতে হবে। **Ambatielos** মামলায় নীতিটি **(Exhaustion of local remedies)** সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

মামলা : Ambatielos Case; এ্যামব্যাটিলোস মামলা; (Greece Vs. U.K., 1956)

এই মামলায় গ্রীস দাবি করে যে, গ্রীক নাগরিক Mr. Ambatielos ১৯১৯ সালে বৃটেন থেকে জাহাজ ক্রয়ের চুক্তিতে আবদ্ধ হন। বৃটিশ সরকার বাকিতে জাহাজগুলো তার নিকট বিক্রি করে কিন্তু বিপরীতে জাহাজের উপর বন্ধক স্বত্ব রেখে দেয় এবং যথাসময়ে জাহাজগুলো সরবরাহ করা হবে বলে চুক্তিতে উল্লেখ করে। ভাষ্য মতে, নির্দিষ্ট সময়ে বৃটেন

কিছু জাহাজ সরবরাহ না করায় তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং এজন্য তিনি ২টি জাহাজের ক্রয়চুক্তি বাতিল করার দাবি জানালে বৃটেন আপত্তি জানায়। নিম্নতর ও উচ্চতর আদালত বৃটিশ সরকারের পক্ষে রায় দিলে Ambatielos লর্ড সভায় ঐ আপিল না করে সরাসরি Anglo-Greek Treaty of Commerce and Navigation of 1886 বিধান অনুসারে সালিশ কমিশনের নিকট যান। বৃটেন দাবি করে সালিশ কমিশনের নিকট প্রেরণের আগে Ambatielos সমস্ত সম্ভাব্য প্রতিকার প্রার্থনা করেন নি। গ্রীস বলে, প্রতিকারগুলো যথোপযুক্ত নয় সুতরাং এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

কমিশন বলেন যে, যেহেতু বিষয়টা লর্ড সভায় বিবেচনার জন্য পাঠানো হয় নি সেহেতু সকল স্থানীয় প্রতিকারের পথ বন্ধ হয়ে যায় নি বলে গ্রীস Ambatielos এর পক্ষ হয়ে কমিশনের নিকট 'Diplomatic Protection' নীতির প্রয়োগ দাবি করে ক্ষতিপূরণ চাইতে পারে না। সম্ভাব্য সকল স্থানীয় প্রতিকার প্রার্থনা একটি আবশ্যকীয় শর্ত, যতক্ষণ পর্যন্ত এ শর্তপূরণ করা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কোনভাবেই প্রতিকারার্থে আবেদন গৃহীত হবে না। বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে নিম্নোক্ত মামলায়–

মামলা : Interhandel Case; ইন্টারহ্যান্ডেল মামলা; (Switzerland Vs. USA, ICJ, 1959)

১৯৪২ সালে যুক্তরাষ্ট্র Trading with the Enemies Act নামক আইনের অধীনে যুক্তরাষ্ট্রে নিবন্ধিত একটি প্রতিষ্ঠান General Ariline & Film Co. (GAF)-এর সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে। এই কোম্পানির অধিকাংশ শেয়ারের মালিক ছিল Interhandel নামক একটি Swiss প্রতিষ্ঠান এবং যুক্তরাষ্ট্রের মতে ঐ প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ ছিল IG Farben নামক জার্মান কোম্পানির হাতে। যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগদানের পূর্বেই ১৯৪০ সালে Interhandel জার্মানীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করায় ঐ GAF কোং-এর স্বত্বাধিকারী ছিল সুইজারল্যান্ড। সুইজারল্যান্ড ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৭ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের আদালতে মামলা চালিয়ে যায় ঐ বাজেয়াপ্ত আদেশের বিরুদ্ধে। কিন্তু এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্ট কোন সিদ্ধান্তে উপনীত না হওয়ায় এবং ইতোমধ্যে ৯ বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ায় সুইজারল্যান্ড ICJ-র দ্বারস্থ হয়।

সুইজারল্যান্ড ICJ-র দ্বারস্থ হবার সাথে সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্ট একটি Writ of Certiorari মঞ্জুর করে এবং মামলাটি ফেডারেল জেলা আদালতে পুনর্বিচারের জন্য প্রেরণ করে। যুক্তরাষ্ট্র বলে যে, যেহেতু স্থানীয় প্রতিকার শেষ হয় নি তাই ICJ-এর কাছে বিষয়টি উত্থাপন করার অধিকার সুইজারল্যান্ডের নেই। সুইজারল্যান্ড স্থানীয় প্রতিকার প্রদানের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘ সূত্রিতা ও গড়িমসির কথা উল্লেখ করলেও ICJ বলেন যে, যেহেতু এখনও স্থানীয় প্রতিকার লাভের পথ খোলা আছে তাই সুইজারল্যান্ড ICJ-র দ্বারস্থ হতে পারে না।

তবে দু'দেশের মধ্যে যদি এমন কোন স্পষ্ট চুক্তি থাকে যে কোন সমস্যার উদ্ভব হলে কোন রাষ্ট্র সরাসরি আন্তর্জাতিক আদালত বা সালিশ পদ্ধতির দ্বারস্থ হতে পারবে তবে স্থানীয় সম্ভাব্য সকল প্রতিকার প্রার্থনা হতে চুক্তির পক্ষরাষ্ট্র অব্যাহতি পেতে পারে। তবে যে চুক্তি

বলে রাষ্ট্র এ অধিকার দাবি করবে সে চুক্তিটি ও চুক্তির বিধান এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট হতে হবে। এমনই এক সিদ্ধান্ত দেয়া হয় **ELSI** মামলায়।

মামলা : ELSI Case; এলসি মামলা; (USA Vs. Italy, ICJ, 1989)

ইটালি Electronica Sicula S.P.A. (ELSI) নামক এক ইটালিয়ান কোম্পানি অধিগ্রহণ করে নেয়, কিন্তু কোম্পানির মূল মালিক ছিল মূলত দু'টি মার্কিন কর্পোরেশন। বেশ কিছু বৎসর যাবৎ আর্থিক ক্ষতির পর কর্পোরেশন দু'টি কোম্পানি তুলে নেবার চিন্তাভাবনা করছিল। কিন্তু এমতাবস্থায় ইতালি কর্তৃক অধিগ্রহণের ফলে মার্কিন কর্পোরেশন দু'টি সরাসরি আন্তর্জাতিক আদালতে ক্ষতিপূরণ দাবি করে। ইতালি যুক্তি দেখায় যে স্থানীয় প্রতিকার প্রার্থনা না করেই যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আদালতের শরণাপন্ন হয়েছে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র যুক্তি প্রদর্শন করে যে দু'দেশের মধ্যে সম্পাদিত Treaty of Friendship, Commerce and Navigation; 1948 এর ফলে তারা সরাসরি আন্তর্জাতিক আদালতে প্রতিকার চাইতে পারে।

বিচার্য বিষয় ছিল এমনি চুক্তির ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্রের সরাসরি আন্তর্জাতিক আদালতে প্রতিকার প্রার্থনার অধিকার আছে কি না? আদালত সিদ্ধান্ত দেয় যে, আন্তর্জাতিক আদালতে প্রতিকার প্রার্থী রাষ্ট্রকে অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে যে, সম্ভাব্য সকল স্থানীয় প্রতিকার প্রার্থনা করা হয়েছে; নয় তো দু'দেশের মধ্যে এমন কোন সুস্পষ্ট চুক্তি আছে যার বলে রাষ্ট্র সম্ভাব্য সকল স্থানীয় প্রতিকার প্রার্থনা হতে অব্যাহতি পেতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইতালির মধ্যে সম্পাদিত Friendship, Commerce and Navigation of 1948 চুক্তি এ বিষয়ে সুস্পষ্ট রূপে কিছু উল্লেখ করে নি। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রকে অবশ্যই সম্ভাব্য সকল স্থানীয় প্রতিকার প্রার্থনার মধ্য দিয়েই যেতে হবে।

এতক্ষণ আলোচিত হল কিভাবে একটি রাষ্ট্র প্রবাসে অবস্থানরত নিজ নাগরিককে প্রয়োজনবোধে কূটনৈতিক আশ্রয় প্রদান করে। কিন্তু নাগরিকের নিজ রাষ্ট্র ছাড়াও যে দেশে সে বসবাস করছে সে রাষ্ট্রেরও তার প্রতি কিছু কর্তব্য আছে। আন্তর্জাতিক আইন বিদেশীদের প্রতি রাষ্ট্রীয় আচরণ কি হবে তা নির্ধারণ করার চেষ্টা করে। আন্তর্জাতিক আইনে বিদেশীদের প্রতি দু'ধরনের রাষ্ট্রীয় আচরণের নীতি অনুসরণ করা হয়।

১. আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বিদেশীদের প্রতি আবাস রাষ্ট্রের আচরণের ন্যূনতম গ্রহণযোগ্য নীতি (International minimum standard)। এ নীতি অনুসারে আবাস রাষ্ট্র বিদেশীদের প্রতি ন্যূনতম কিরূপ আচরণ করবে তা আন্তর্জাতিকভাবে নির্ধারিত থাকে। এক্ষেত্রে আবাস রাষ্ট্র তার নিজের নাগরিকদের সাথে কি আচরণ করে না করে সে প্রেক্ষিতে বিদেশীদের প্রতি আচরণে কোন পরিবর্তন ঘটবে না।

২. স্বীয় নাগরিক সুলভ আচরণ নীতি (National treatment)। এ নীতি অনুসারে আবাস রাষ্ট্র তার নিজ দেশের নাগরিকদের সাথে যেমন আচরণ করে রাষ্ট্রে বসবাসকারী বিদেশীদের প্রতিও সম আচরণ করবে বলে মনে করা হয়। বিদেশীরা আবাস রাষ্ট্র হতে, আবাস রাষ্ট্রের নাগরিকদের মত সমান সুযোগ সুবিধা ভোগ করবে এবং সম আচরণ লাভ করবে।

স্বাভাবিকভাবেই বোঝা যায়, National Treatment Standard-এ একজন বিদেশী যে পরিমাণ সুযোগ সুবিধা ভোগ করার সম্ভাবনা রয়েছে International Minimum Standard of Treatment Principle অনুসরণ করলে ততটা সুযোগ লাভের অবকাশ নেই। উন্নতদেশ, বিশেষত যে সব দেশ International Minimum Standand of Treatment Principle এ বিশ্বাস করে তাদের যুক্তি হচ্ছে বিভিন্ন দেশে বিদেশীদের প্রতি আচরণ বিভিন্ন হওয়া ঠিক নয়, এমনকি বহুদেশের নিজ নাগরিকদের প্রতি আচরণই সন্তোষজনক নয়, তাই National Treatment Standand অনুসরণ করাও ঝুঁকিপূর্ণ। সুতরাং বিদেশীদের প্রতি আবাস রাষ্ট্রের আচরণ কি রকম হওয়া উচিত তা আন্তর্জাতিকভাবে নির্ধারিত হওয়া ভাল। তবে এক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে Minimum Standard বলতে কি বোঝায় তার কোন সর্বসম্মত সংজ্ঞা কিংবা নির্ধারণী মাপকাঠি নেই। এরকমই এক সমস্যা পর্যালোচিত হয়েছিল **Garcia & Garza Case, (Mexico Vs. U.S.A. 1926)** মামলায়।

উল্লেখিত মোকদ্দমায় নির্ধারিত হয় যে International Minimum Standerd কি তা আন্তর্জাতিকভাবেই নির্ধারিত হতে হবে। কোন রাষ্ট্রবিশেষের ধারণার উপর Minimum Standard নির্ধারিত হবে না।

সুতরাং প্রবাসীদের প্রতি আচরণের নূন্যতম মাত্রাপূরণ না করতে পারলে রাষ্ট্রীয় দায় উদ্ভব হয়, তবে রাষ্ট্রীয় দায় নির্ধারণ করারও কিছু শর্ত আছে (রাষ্ট্রের দায় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে), যা সব সময় নির্ধারণ করা সহজ নয়। অন্যদিকে আবার প্রবাসী নাগরিকের অধিকার লঙ্ঘিত হলে তার নিজ রাষ্ট্র কূটনৈতিক সুরক্ষা প্রদান করতে পারে। সুতরাং পুরো ব্যাপারটিই অত্যন্ত জটিল এবং যেহেতু বিদেশীদের প্রতি আচরণ এর নীতি কেবল প্রাকৃতিক ব্যক্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয় বরং আইনগত সত্তার ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য সুতরাং ব্যাপারটি কিছু কিছু ক্ষেত্রে বেশ জটিল রূপ লাভ করতে পারে। যেমন বর্তমান পৃথিবীতে এমন অনেক বহু জাতিক কোম্পানিই আছে যেগুলো এককভাবেই ছোট ও দরিদ্র রাষ্ট্র হতে বহুগুণে শক্তিশালী। আবার এরূপ আইনগত ব্যক্তির অধিকার রক্ষায় ঐ প্রতিষ্ঠানের দেশও যদি এগিয়ে আসে তবে ছোট দরিদ্র কিংবা উন্নয়নশীল দেশগুলোর সার্বভৌমত্ব, শক্তি ও সম্পদের প্রতি পুরো বিষয়টাই একটা হুমকি রূপে দাঁড়িয়ে যেতে পারে। এ সমস্যাটি বর্তমান বিশ্বে উন্নয়নশীল এবং অনুন্নতদেশগুলোর জন্য সত্যিকারার্থেই একটা বড় সমস্যা। এ সমস্যার ক্ষেত্রে এ ধরনের দরিদ্র রাষ্ট্রগুলো কি রকম নীতি অনুসরণ করতে পারে, তারই একটি দিকনির্দেশনা হিসেবে ধরা যায় Calvo Clause-কে। এ নীতিটির প্রবক্তা হচ্ছে দক্ষিণ আমেরিকার ব্যক্তিত্ব, আর্জেন্টিনার প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী Dr. Calvo, তিনি পেশায় ছিলেন বুয়েন্সে আয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক। তার প্রচলিত নীতি অনুসারে বিদেশী আইনগত ব্যক্তি আবাস রাষ্ট্রের সাথে সম্পাদিত চুক্তি হতে উদ্ভূত সংকট নিরসনে নিজ রাষ্ট্রের কূটনৈতিক সাহায্য প্রার্থনার অধিকার পরিত্যাগ করে এবং আবাস রাষ্ট্রের আদালতকে সর্বাধিকারী কর্তৃপক্ষ বলে মেনে নেয়। এ নীতি স্বীকার করে নিলে আবাস রাষ্ট্রের সাথে কৃত চুক্তি হতে উদ্ভূত সমস্যায় ব্যক্তির নিজের দেশের সাহায্য প্রার্থনার সুযোগ আর থাকে না বা সীমিত হয়ে যায়। চুক্তিতে এ ক্লজের অন্তর্ভুক্তির বৈধতা বিশ্বব্যাপি স্বীকৃত এবং বর্তমানে বিশ্বের

বহুদেশেই বহুজাতিক কোম্পানির সাথে চুক্তির ক্ষেত্রে এ ক্লজটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তবে সাধারণভাবে এ ক্লজ এর দুটো ব্যতিক্রম আছে :

প্রথমত : Calvo Clause দ্বারা নাগরিককে রক্ষা করার যে সাধারণ সার্বভৌম ক্ষমতা রাষ্ট্রের আছে তা সংকুচিত করা যাবে না।

দ্বিতীয়ত : Calvo Clause এর দ্বারা এমন কোন শর্তের সূচনা করা যাবে না যার ফলে আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘিত হয়।

অর্থাৎ এ ক্লজের মূল কথা হলো, কোন পক্ষ বিদেশী কোন রাষ্ট্রের সাথে চুক্তি বদ্ধ হবার সময় বিদেশী রাষ্ট্রের সমস্ত আইন-কানুন, নিয়মনীতির প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেই চুক্তি করতে হবে এবং ফলশ্রুতিতে সাধারণ কোন বিবাদ বা সংকট দেখা দিলে বিদেশী ব্যক্তি নিজ রাষ্ট্রের কাছে কূটনৈতিক সুরক্ষা চাইতে পারবে না। এ নীতিটি এতটাই গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে যে ১৯৬৫ সালের পর থেকেই বিদেশে বিনিয়োগ সংক্রান্ত প্রায় সকল চুক্তির ক্ষেত্রেই এই ক্লজ প্রয়োগ করা হয়েছে, ব্যতিক্রম শুধু বাংলাদেশ।

আলোচনা সাপেক্ষে একটা বিষয় বোঝা যাচ্ছে যে, নাগরিকের রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব, নাগরিক বা আইনগত ব্যক্তির সাথে সার্বভৌম রাষ্ট্রের চুক্তি ইত্যাদি বিষয়, বিদেশীদের সাথে রাষ্ট্রের আচরণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে; অর্থাৎ অধ্যায়ের শুরুতে যেমন বলা হয়েছিল যে, বিদেশীদের সাথে আবাস রাষ্ট্রের আচরণ কেমন হবে তা সম্পূর্ণরূপে অভ্যন্তরীণভাবে নির্ধারিত নীতির উপর নির্ভর করে। বাস্তবত দেখা যায় সে উক্তিটি পুরোপুরি সত্য নয়, এই নীতি নির্ধারণে আবার বহু বিষয় প্রভাব ফেলে। বিভিন্ন নীতির এমনই এক জটিল পারস্পরিক দ্বন্দ্ব চোখে পরে বিদেশী ভূ-খণ্ডে অবস্থিত বিদেশী সম্পত্তির জাতীয়করণ ও বিদেশীদের প্রতি রাষ্ট্রের আচরণ আলোচনা করতে গেলে।

বিদেশী সম্পত্তি জাতীয়করণ আন্তর্জাতিক আইনে কোন নতুন বিষয় নয়। কোন সার্বভৌম রাষ্ট্র যেমন সে রাষ্ট্রে অন্য কোন রাষ্ট্রের নাগরিকের প্রবেশাধিকার, বসবাস ও সম্পত্তি অর্জনের উপর বিভিন্ন বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারে; তেমনি জনস্বার্থে বিদেশী সম্পত্তির জাতীয়করণের রাষ্ট্রীয় অধিকার ও চর্চা বহুপূর্ব হতেই প্রচলিত। অবশ্য জাতীয়করণেরও কিছু শর্ত আছে :

প্রথমত : জাতীয়করণ অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ জনস্বার্থজনিত কারণে হতে হবে;

দ্বিতীয়ত : জাতীয়করণ হতে হবে বৈষম্যহীন;

তৃতীয়ত : বিশেষ বিশেষ সম্পত্তি তাৎক্ষণিক, কার্যকর ও পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান সাপেক্ষে জাতীয়করণ বৈধ;

চতুর্থত : বৃহৎ শিল্পের জাতীয়করণের রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনীয়তার সাথে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ-এর অর্থ সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। অর্থাৎ জাতীয়করণ হতে পারে শুধু জনস্বার্থে এবং পর্যাপ্ত, তাৎক্ষণিক এবং কার্যকর ক্ষতিপূরণ প্রদান সাপেক্ষে অর্থাৎ উপরোক্ত শর্তসমূহ পূরণ করা না হলে জাতীয়করণ অবৈধ বলে বিবেচিত হবে। বর্তমানে ইউরোপীয় ও উত্তর আমেরিকার অধিকাংশ আইনবিদ মনে করেন তাৎক্ষণিক, কার্যকর ও পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান সাপেক্ষে

জনস্বার্থে রাষ্ট্রে অবস্থিত বিদেশী সম্পত্তির জাতীয়করণ বৈধ ও যথার্থ।

এক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক, কার্যকর ও পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ বলতে কি বোঝায় তা স্পষ্ট হবার প্রয়োজন আছে। প্রত্যয়টির ব্যাখ্যা পাওয়া যায় **Anglo-Iranian Oil Co. Case (1951)** -এ মামলায় বলা হয় পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ বলতে বোঝায়; প্রতিষ্ঠান বা সম্পত্তি জাতীয়করণকালে সম্পত্তির বাজার মূল্য ও এর সাথে মূল্য পরিশোধের দিন পর্যন্ত হিসাবকৃত সুদ আর্থিকভাবে প্রদান করা।

তাৎক্ষণিক ক্ষতিপূরণ বলতে বোঝায়; তাৎক্ষণিকভাবে অর্থাৎ বিলম্ব না করে ক্ষতিপূরণ প্রদান করে দেয়া, যুক্তরাজ্যের মতে অবশ্য বিলম্বিত ক্ষতিপূরণ প্রদানকেও গ্রহণযোগ্য ধরা যায় যদি তিনটি শর্তপূরণ করা হয়–

(ক) ক্ষতিপূরণের অংক অবশ্যই তাৎক্ষণিকভাবেই নির্ধারিত হতে হবে;

(খ) বিলম্বিত প্রদানের জন্য মূল অর্থের উপর সুদ প্রদান করতে হবে;

(গ) ভবিষ্যতে প্রদানের নিশ্চয়তা স্বরূপ জামানত প্রদান করতে হবে যাতে করে প্রয়োজনবোধে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ পুরো অঙ্ক উত্তোলন করে নিতে পারে।

কার্যকর ক্ষতিপূরণ প্রদান বলতে বোঝায় এমনভাবে ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে যেন ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ ক্ষতিপূরণের অর্থ ব্যবহার করতে সমর্থ হয়। অর্থাৎ যদি কোন রাষ্ট্র নিজ মুদ্রায় ক্ষতিপূরণ প্রদান করে, তবে তা কার্যকর ক্ষতিপূরণ প্রদান বলে গণ্য হবে না, অর্থাৎ অর্থ হস্তান্তরযোগ্য হতে হবে এবং ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ ইচ্ছা করলে যেন তা নিজ দেশের মুদ্রায় পরিবর্তিত করতে পারে এবং নিজ দেশে পাঠাতে পারে এমনভাবে অর্থ পরিশোধ করতে হবে।

ক্ষতিপূরণ প্রদানের এ নীতিটি সার্বজনীন স্বীকৃতি পেয়েছে। মেক্সিকোর ভূমি সংস্কার, যুদ্ধ পরবর্তী পূর্ব ইউরোপে জাতীয়করণ, ১৯৫১ সালে ইরানে তেল শিল্পের জাতীয়করণ, মিশর কর্তৃক সুয়েজখালের জাতীয়করণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে এ নীতিটি ব্যাপকভাবে সমর্থিত হয়েছে।

তবে ক্ষতিপূরণ নীতির কতগুলো ব্যতিক্রমও স্বীকৃত, এগুলো হলো চুক্তিশর্ত, পুলিশ বাহিনীর আইনগত ক্ষমতা প্রয়োগের কারণে কৃত ক্ষতি, বহির্হুমকির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণের কারণে সৃষ্ট ক্ষতি, অপরাধের দণ্ড হিসেবে সম্পত্তির বাজেয়াপ্তকরণ, কর আরোপ, স্বাস্থ্য ও পরিকল্পনা সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন দ্বারা পরোক্ষভাবে সৃষ্ট ক্ষতি ইত্যাদি।

বাস্তবিক পক্ষে, সরকারি প্রতিষ্ঠানের অবস্থানকে আন্তর্জাতিক সমাজের এক বিরাট অংশই রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ও উন্নয়নের প্রতীক মনে করে, কিন্তু দ্রারিদ্র্যের কারণে তৃতীয় বিশ্বের বহু দেশকেই বহুলাংশে বিদেশী মালিকানার অধীনস্থ হয়ে থাকতে হয়। *এ দেশগুলো তাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিনিময়ে ভোগ করে অর্থনৈতিক বিনিয়োগ।* কিন্তু বিদেশী মালিকানাধীন সম্পদকে আন্তর্জাতিক মানপূরণ করে তাৎক্ষণিক, কার্যকর ও পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ বিধির কঠোর অনুসরণ করে জাতীয় স্বার্থে জাতীয়করণ মূলত ও বাস্তবত এ রাষ্ট্রগুলোর পক্ষে অসম্ভব। তাই বিদেশী কোম্পানির কাঁচামাল এর যোগানদার ও বাজারে পরিণত হওয়াই এ রাষ্ট্রগুলোর নিয়তি।

আশ্রয়
Asylum

আন্তর্জাতিক আইনে আশ্রয় একটি অধিকার। মানবাধিকার আইন বিকাশের মাধ্যম / উপায় হিসেবে আশ্রয় পাওয়ার অধিকারটি সার্বজনীনভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের আশ্রয় প্রদানের অধিকার আইনগতভাবে স্বীকৃত হলেও ব্যক্তির আশ্রয় পাওয়ার অধিকার সেভাবে স্বীকৃত নয়। যদিও মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রের ১৪ (ক) অনুচ্ছেদে এই অধিকারটি স্বীকার করা হয়েছে। এই ঘোষণাপত্রে বর্ণিত হয়েছে যে নিজ রাষ্ট্রে রাজনৈতিক বা আদর্শগত কারণে নিপীড়ন বা গ্রেফতার এড়ানোর জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির অন্য রাষ্ট্রে আশ্রয় প্রার্থনা ও ভোগ করার অধিকার রয়েছে। উল্লেখ্য, এই ঘোষণাটি কোন অবশ্যপালনীয় চুক্তি নয়, তবে ঘোষণাটি মানবাধিকার আইন বিকাশের নির্দেশক।

রাজনৈতিক আদর্শগত বা ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের জন্য কোন ব্যক্তি যদি তার নিজ রাষ্ট্র থেকে বিতাড়িত হয় অথবা যদি তাকে পশ্চাদ্ধাবন করা হয় তাহলে ঐ ব্যক্তি অন্য রাষ্ট্রে প্রবেশ ও বসবাসের জন্য যে অনুমতি প্রার্থনা করে তা-ই আশ্রয়ের অধিকার।

আন্তর্জাতিক আইনে আশ্রয়ের অধিকার কথাটি দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয়–

ক. প্রত্যেক রাষ্ট্রের অধিকার রয়েছে অন্য রাষ্ট্রের কোন নাগরিককে আশ্রয় প্রদান করার। তবে এ আশ্রয় ক্ষণিক বা কিছু সময়ের চেয়ে বেশি হতে হবে;

খ. যে রাষ্ট্র আশ্রয় দিয়েছে, ব্যক্তির নিরাপত্তার ভার সেই আশ্রয়দানকারী রাষ্ট্রের উপর বর্তায়।

অতএব, আশ্রয় হচ্ছে কোন রাষ্ট্র কর্তৃক কোন অপরাধীকে আশ্রয়দানসহ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। অর্থাৎ আশ্রয়প্রাপ্ত ব্যক্তিকে শুধুমাত্র থাকার অনুমতি দেয়াই যথেষ্ট হবে না, পাশাপাশি আশ্রয়প্রাপ্ত ব্যক্তির আবাসন ও ভরণপোষণে সহায়তা প্রদানেরও বিধান করতে হবে। এটা সেই রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

কোন ব্যক্তি অপর রাষ্ট্রে আশ্রয় প্রার্থনা করলেই তাকে আশ্রয় দেয়া হবে কি না তা কি সে রাষ্ট্রের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল নাকি ঐ ব্যক্তির অধিকার–এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে যদিও আন্তর্জাতিক আইনে কোন বিধিবদ্ধ আইন নেই তবুও রাজনৈতিক, আদর্শগত, বা ধর্মীয় কারণে তাড়িত-বিতাড়িত এবং হুমকির সম্মুখীন কোন ব্যক্তিকে অন্য রাষ্ট্র কর্তৃক আশ্রয় প্রদান করা প্রথাগত আন্তর্জাতিক আইনে স্বীকৃত। আশ্রয়দাতা রাষ্ট্র নিজ ভূ-খণ্ডে সন্দেহাতীতভাবে এ ধরনের আশ্রয় প্রদান করতে পারে। ব্যক্তিকে আশ্রয়দান করা রাষ্ট্রের বিবেচনার উপর নির্ভর করে, কিন্তু যখনই ব্যক্তির আশ্রয় মঞ্জুর করা হয় তখনই তার নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং রক্ষার জন্য রাষ্ট্রকে সচেতন হতে হয়।

Montevideo Treaty, 1933 তে আশ্রয়দান সম্পর্কে কিছু বলা হলেও তা আর বিস্তৃতভাবে সার্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণাতে সম্পৃক্ত করা হয় নি। বর্তমানে এই অধিকার সম্পর্কে অনেক আইনে উল্লেখ আছে। যেমন–

i) **সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা, ১৯৪৮**- অনুচ্ছেদ ১৪ এই ঘোষণাপত্রের ১৪ (ক) অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে যে, নির্যাতন এড়ানোর জন্য প্রত্যেকেরই অপর দেশসমূহে আশ্রয় প্রার্থনা ও ভোগ করার অধিকার রয়েছে।

ii) **১৯৬৭ সালের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণায়** বলা হয় যে, যে ব্যক্তিকে একটি রাষ্ট্র আশ্রয় দিয়েছে অন্য সকল রাষ্ট্র ঐ আশ্রয়ের মর্যাদা দিতে প্রস্তুত থাকবে। এছাড়াও বলা হয় যে, কোন ব্যক্তি যদি আবশ্যিক কারণে আশ্রয় চায় তাহলে তাকে সীমান্তে বাঁধা দেয়া যাবে না এবং যদি সে সীমান্ত অতিক্রম করে রাষ্ট্রের মধ্যে প্রবেশ করে তাহলে ঐ রাষ্ট্র সেই মুহূর্তে তাকে বহিষ্কার করবে না বা পশ্চাদ্ধাবন করবে না।

বহিঃসমর্পণ চুক্তি দ্বারা রাজনৈতিক আশ্রয় সংক্রান্ত অধিকার নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।

iii) ১৯৬৭ সালের আশ্রয় সম্পর্কিত ঘোষণা দুইটি সার্বজনীন অধিকারকে সর্বাগ্রে স্থান দেয়। যথা–

ক. নির্যাতন, যন্ত্রণা, ক্লেশ, রাজনৈতিক উত্তেজনা থেকে মুক্তি বা রেহাই পাওয়ার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তি অন্য যে কোন দেশে আশ্রয় খুঁজতে পারে;

খ. এই অধিকার সাধারণভাবে রাষ্ট্রীয় অরাজনৈতিক কর্মে অভিযুক্ত কোন ব্যক্তি বা জাতিসংঘ নীতিবিরুদ্ধে কোন কাজে অভিযুক্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নাও হতে পারে।

iv) **১৯৫১ সালের শরণার্থীদের মর্যাদা সম্পর্কিত কনভেনশনে** শরণার্থীদের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, শরণার্থী হচ্ছে এমন কোন ব্যক্তি 'যে বর্ণ, ধর্ম, জাতীয়তা, বিশেষ কোন গোষ্ঠীর সদস্যতা বা রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে নিপীড়িত হওয়ার ভয়ে নিজ রাষ্ট্রের বাইরে অবস্থান করছেন এবং নিজ রাষ্ট্রের সহায়তা গ্রহণ করতে পারছেন না বা নিপীড়নের ভয়ে নিজ রাষ্ট্রের নিরাপত্তাগ্রহণে ইচ্ছুক নন; অথবা যে জাতীয়তাবিহীন ব্যক্তি তার পূর্বের আবাস রাষ্ট্রে ফিরে যেতে পারছেন না বা একই ভীতির কারণে তার পূর্বের আবাস রাষ্ট্রে ফিরে যেতে ইচ্ছুক নন' {অনুচ্ছেদ ১/এ (২) যা ১৯৬৭ সালের প্রোটকলের ১ (২) অনুচ্ছেদ দ্বারা সংশোধিত} এই কনভেনশনের ৩৩ ধারায় বলা হয়েছে, 'কোন পক্ষ রাষ্ট্র কোন শরণার্থীকে এমনভাবে বহিষ্কার বা অন্য রাষ্ট্রের সীমানায় ফেরত পাঠাবে না যেখানে বর্ণ, ধর্ম, জাতীয়তা, কোন নির্দিষ্ট সামাজিক গোষ্ঠীর সদস্যতা বা রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে তার জীবন বা স্বাধীনতা হুমকীর সম্মুখীন হতে পারে।'

v) **১৯৮৫ সালের বিদেশে অবস্থানকারী ব্যক্তিদের অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণায়** অনুচ্ছেদ: ২ (২) এ বলা হয়েছে-একজন বিদেশী বর্তমানে অবস্থানকারী রাষ্ট্রের সাধারণ আইনগত (Domestic) অধিকার এবং আন্তর্জাতিক আইনে উল্লেখিত অন্যান্য অধিকার যা কোন জাতীয় রাষ্ট্র বিদেশীদেরকে প্রদান করতে বাধ্য, সেই সব ধরনের অধিকার ভোগ করবে।

উপরোক্ত ধরনের আন্তর্জাতিক কনভেনশন/resolution গুলোতে বলা হয়েছে যে, যদি একবার কোন ব্যক্তিকে রাজনৈতিক আশ্রয় দেয়া হয় তবে উহা আর বাতিল করা বা তুলে নেয়া যাবে না। তাই এটা Hard International Law এবং বাধ্যতামূলক।

আশ্রয় দু'ধরনের হতে পারে যথা–

১. ভূ-খণ্ডগত আশ্রয় (Territorial Asylum)

২. অতি-রাষ্ট্রিক আশ্রয় (Diplomatic or extra-territorial Ayslum).

১. ভূ-খণ্ডগত আশ্রয় (Territorial Asylum)

একটি রাষ্ট্র তার নিজস্ব ভূ-খণ্ডের অভ্যন্তরে এ ধরনের আশ্রয় অনুমোদন করে। ভূ-খণ্ডগত আশ্রয়ের নীতিটি আধুনিক আন্তর্জাতিক আইন দ্বারা সৃষ্টি হয় নি বরং প্রাচীন আইন দ্বারাই সৃষ্টি হয়েছে। বিদেশী নাগরিককে যদি নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য অন্য রাষ্ট্রে প্রবেশের ও বসবাসের অনুমতি দেয়া হয় তবে সেটাকে ভূ-খণ্ডগত আশ্রয় বলে। কোন ব্যক্তিকে ভূ-খণ্ডগত আশ্রয় প্রদানের অধিকার একটি রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বেরই বহিঃপ্রকাশ, যা সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র স্ববিবেচনায় প্রয়োগ করে।

১৯৬৭ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত ভূ-খণ্ডগত আশ্রয় সংক্রান্ত ঘোষণায় রাষ্ট্রসমূহের কিছু করণীয় বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। ঘোষণায় বলা হয়েছে যে, নিপীড়ন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আশ্রয় প্রার্থীকে রাষ্ট্রীয় সীমানার চেকপয়েন্টে প্রত্যাখান করা এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যদি ভূ-খণ্ডে প্রবেশ করেই থাকে তাহলে তাকে ফেরত পাঠানো বা বহিষ্কার করা উচিত নয়।

যদি জাতীয় নিরাপত্তাজনিত কোন কারণ থাকে বা মাত্রাতিরিক্ত সংখ্যায় আশ্রয় প্রার্থীদের আগমন ঘটে যা স্থানীয় জনগণের জন্য হুমকি সৃষ্টি করতে পারে তাহলে আশ্রয় নাও দেয়া যেতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের উচিত অন্য কোন উপায়ে যেমন–সাময়িক আশ্রয় প্রদান, কিংবা অন্য কোন রাষ্ট্রে যেতে বা আশ্রয় লাভ করতে সহায়তা করা (অনুচ্ছেদ-৩)। যদি কোন রাষ্ট্রের পক্ষে ব্যাপক আকারে আশ্রয় প্রদান বা তা অব্যাহত রাখা কঠিন হয় তাহলে অন্য সকল রাষ্ট্রের উচিত তার সাহায্যে এগিয়ে আসা।

একজন ব্যক্তি অন্য দেশের দেওয়া আশ্রয়কে প্রত্যাখান করতে পারে, যদি সেই আশ্রয় তার নিজ দেশের স্বার্থের পরিপন্থী হয়। কোন রাষ্ট্র বিশেষ বিশেষ কারণে অন্য দেশের কোন ব্যক্তিকে আশ্রয় দিতে অস্বীকার করতে পারে। আবার একটি রাষ্ট্র পূর্বচুক্তির দ্বারা অন্য একটি রাষ্ট্রকে প্রয়োজনের সময় আশ্রয় প্রদানের জন্য বাধ্য করতে পারে।

বিভিন্ন দেশে আশ্রয়দান সংক্রান্ত আইন রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ- ইতালি, ফ্রান্স, জার্মানীর সংবিধানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাজনৈতিক কারণে দোষী বা নির্যাতিত ব্যক্তির আশ্রয়লাভের অধিকার আছে কিন্তু যেকোন পলাতক ব্যক্তির আশ্রয়লাভের অধিকার রয়েছে- এ কথা বলা যায় না। এছাড়াও আশ্রয় লাভের অধিকার আইনানুগভাবে বলবৎ করার কো বিধানও আন্তর্জাতিক আইনে স্পষ্টভাবে বলা হয় নি।

২. অতি-রাষ্ট্রিক আশ্রয় (Diplomatic or Extra-territorial Ayslum)

কিছু কিছু ক্ষেত্রে একটি দেশ বিদেশে অবস্থিত তাদের দূতাবাসে বা কনস্যুলার ভবন, আন্তর্জাতিক সংস্থার কার্যালয়, যুদ্ধ জাহাজ বা তাদের সাধারণ জাহাজে কোন নির্যাতিত ব্যক্তিকে আশ্রয় দিতে পারে। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে, কোন ব্যক্তি নিজের রাষ্ট্র অতিক্রম করছে না, নিজের রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বিদেশী কূটনৈতিক মিশনে আশ্রয় প্রার্থনা করছে। এ ধরনের আশ্রয় প্রদান সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত নয়। অতি-রাষ্ট্রিক আশ্রয় বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে।

ক) বিদেশী দূতাবাসে আশ্রয় : যদি কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রের ভিতরে অবস্থিত অন্য রাষ্ট্রের দূতাবাসে আশ্রয় গ্রহণ করে তবে বিদেশী দূতাবাসে আশ্রয় বলে অভিহিত করা হয়। আধুনিক আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী আশ্রয় অনুমোদনের ক্ষমতা কোন বিদেশী মিশন প্রধানের নেই। এটা বিশ্বাস করা হয় যে, বিদেশী দূতাবাসগুলো গ্রাহক রাষ্ট্রের জন্য কোন আপত্তিকর কাজ করতে পারে না এবং আরো মনে করা হয় যে, বিদেশী দূতাবাসকে গ্রাহক রাষ্ট্রের জন্য কোন বিপদের উৎসকেন্দ্রে পরিণত করা যায় না।

প্রথাগত আন্তর্জাতিক আইন হচ্ছে, বিদেশী দূতাবাসগুলো সংরক্ষিত এলাকা; এ এলাকাটুকুতে মিশন প্রেরক রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করা হয়। অন্য কোন ব্যক্তি মিশন প্রধান বা সংশ্লিষ্ট বিশেষ ব্যক্তির সম্মতি ছাড়া বিদেশী মিশনে বা দূতাবাসে প্রবেশ করতে পারবে না। ১৯২৮ সালে কূটনৈতিক প্রতিনিধি সংক্রান্ত হাভানা কনভেনশনের ২২ অনুচ্ছেদে উপরোক্ত প্রথাগত আন্তর্জাতিক আইনের বিধান সমর্থন করা হয়েছে।

তবে Starke-এর মতানুযায়ী নিম্নোক্ত ব্যতিক্রমধর্মী বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে বিদেশী দূতাবাসে আশ্রয়ের অনুমতি দেয়া যেতে পারে-

i) ব্যক্তির নিজ দেশে যদি দলগত আক্রমণ হতে ব্যক্তির শারীরিক বিপদের আশংকা দেখা দেয় অথবা রাজনীতির কারণে যদি ব্যক্তির জন্য বিপদের সম্ভাবনা থাকে তবে সেক্ষেত্রে ব্যক্তির প্রাণ রক্ষার জন্য অস্থায়ীভাবে এ ধরনের আশ্রয় মঞ্জুর করা যায়।

ii) যেখানে এ ধরনের আশ্রয়ের বিধান সাধারণ এবং প্রয়োজনীয় প্রথা হিসেবে চলে আসছে সেখানে এ ধরনের আশ্রয় কোন কোন ক্ষেত্রে মঞ্জুর করা যায়।

iii) যদি ব্যক্তির নিজ রাষ্ট্রের বা আশ্রয়দানকারী রাষ্ট্রের মধ্যে কোন বিশেষ চুক্তি থাকে তবে কোন কোন ক্ষেত্রে এ জাতীয় আশ্রয় মঞ্জুর করা যায়।

শুধু লাতিন আমেরিকাতে দূতাবাসে আশ্রয় লাভের বিষয়টি প্রচলিত আছে। সেখানকার

রাজনৈতিক বাস্তবতার কারণেই এই পদ্ধতিটি টিকে আছে। এটা সেখানকার স্থানীয় প্রথাগত আইন দ্বারা স্বীকৃত। যদি বিশেষ পরিস্থিতিগত কারণে কোন ব্যক্তি বিদেশী দূতাবাসে আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহলে ঐ আশ্রিত ব্যক্তিকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষ দূতাবাস প্রধানকে বা দূতাবাসের কোন কর্মকর্তার উপর বল প্রয়োগ করতে পারবে না। প্রাসঙ্গিক মামলা-

মামলা : The Asylum Case; আশ্রয় মামলা; (Columbia Vs. Peru, ICJ, 1950)

১৯৪৮ সালে Vector Raul Haya Dela Torre নামে পেরুর একজন রাজনৈতিক নেতা একটি ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থান ঘটায়। এ অভ্যুত্থানের দরুণ পেরুর সরকার উক্ত অভ্যুত্থানের নেতাকে দোষী সাব্যস্ত করে এবং আদালতে প্রেরণের নির্দেশ দেয়। Haya Dela Torre'র বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করা হলে সে পেরুর রাজধানী লিমায় অবস্থিত কলম্বিয়ান দূতাবাসে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করলে কলম্বিয়া Haya'র আশ্রয় মঞ্জুর করে। অতঃপর কলম্বিয়ার রাষ্ট্রদূত পেরুকে এ তথ্য প্রদান করে যে, ১৯২৮ সালের হাভানা কনভেনশনের বিধান অনুযায়ী রাজনৈতিক আশ্রয়দানের বিষয়টি কলম্বিয়ান সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। পেরু Haya Dela Torre'র আশ্রয়দানকে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। বিষয়টি তখন ICJ-এর গোচরে আনা হয়।

আদালত বলে যে, পেরু প্রমাণ করতে পারে নি যে, Haya কোন সাধারণ অপরাধ করেছে, রাজনৈতিক অপরাধ নয়। যেহেতু Haya রাজনৈতিক অপরাধী সেহেতু কলম্বিয়া তাকে পেরুর কাছে ফেরত দিতে বাধ্য নয়।

তবে কোন রাষ্ট্র আশ্রয়প্রার্থী ব্যক্তির আশ্রয় মঞ্জুর না করলে অথবা ভুলবশত আশ্রয়প্রার্থী ব্যক্তিকে অন্য রাষ্ট্রে প্রেরণ করলে তবে পরবর্তীতে প্রথম রাষ্ট্র আশ্রয়প্রার্থীর প্রত্যার্পণ দাবি করতে পারে না অথবা পরবর্তী রাষ্ট্র আশ্রয়প্রার্থীকে ফেরত নাও দিতে পারে এবং এরূপ দাবির কোন বৈধতা নেই। প্রাসঙ্গিক মামলা-

মামলা : Savarkar Case; সাভারকার মামলা; (France Vs. Great Britain, 1911)

সাভারকার মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণে বলা হয় যে, সাভারকার নামে জনৈক ভারতীয় বিপ্লবী নেতা রাষ্ট্রদ্রোহীতা ও হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হলে ইংল্যান্ড হতে ব্রিটিশ জাহাজ যোগে বিচারের উদ্দেশ্যে ভারতে প্রেরিত হয়। তাকে ইংল্যান্ড হতে ভারতে প্রেরণের সময় পথিমধ্যে জাহাজটি ফরাসি বন্দরে নোঙর করা হলে সাভারকার ঐ ব্রিটিশ জাহাজ হতে পলায়ন করতে সমর্থ হয়। দুর্ভাগ্যবশত: সাভারকার ফরাসি পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। কিন্তু পুলিশ জানত না যে পলায়নকারী ব্যক্তিই সাভারকার। উক্ত পুলিশ কর্মচারী সাভারকারকে সাধারণ অপরাধী মনে করে তাকে ব্রিটিশ জাহাজের ক্যাপ্টেনের কাছে সমর্পণ করে। পরে ফ্রান্স আনুষ্ঠানিকভাবে বহিঃসমর্পণের জন্য সাভারকারকে ফেরত দেবার জন্য ব্রিটিশ সরকারের

কাছে অনুরোধ জ্ঞাপন করে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার সাভারকারকে ফরাসি সরকারের কাছে প্রত্যার্পণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। ফ্রান্স বিষয়টি সম্পর্কে যথাযথ সিদ্ধান্তের জন্য হেগে অবস্থিত আন্তর্জাতিক সালিশী আদালতে উত্থাপন করে।

এই মামলার মূল বিচার্য বিষয় হলো- ফ্রান্স অপরাধী ব্যক্তি অর্থাৎ সাভারকারের প্রত্যাবর্তন দাবি করতে পারে কি না?

আন্তর্জাতিক আদালত বৃটেনের পক্ষে রায় দিয়ে বলেন যে, অপরাধী বহিঃসমর্পণ সম্পর্কে আন্তর্জাতিক আইনের এমন কোন বিধান নেই যার দ্বারা ইংল্যান্ড অভিযুক্ত সাভারকারকে ফ্রান্সের কাছে প্রত্যাবর্তন করতে আইনত বাধ্য। তাছাড়া ফ্রান্সের পুলিশ কর্মচারী যে কোন কারণেই সাভারকারকে পুলিশের কাছে সমর্পন করে থাকুক না কেন, একবার সমর্পনের পর ফ্রান্স আবার সাভারকারের প্রত্যার্পণ দাবি করতে পারে না।

খ) **আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের অঙ্গনে আশ্রয় :** আন্তর্জাতিক আইনে এমন কোন বিধান নেই যার দ্বারা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কোন অপরাধীর আশ্রয় অনুমোদন করতে পারে। তবে কোন আসন্ন বিপদের হাত থেকে রক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান কোন ব্যক্তিকে সাময়িকভাবে আশ্রয় দিতে পারে।

গ) **যুদ্ধ জাহাজে আশ্রয়:** কয়েকজন লেখক মনে করেন যে, কোন ব্যক্তি যদি সমুদ্রতীরে কোন অপরাধ সংঘটিত করে তারপর তীরে নোঙর করা কোন যুদ্ধ জাহাজে আশ্রয় নেয়, সেক্ষেত্রে জাহাজের অধিনায়ক ঐ অপরাধী ব্যক্তিকে হস্তান্তর করতে অস্বীকার করলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ঐ ব্যক্তিকে জোরপূর্বক আটক করতে পারবে না। এই ধরনের পরিস্থিতিতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ঐ পতাকাবাহী জাহাজের সরকারের কাছে কূটনৈতিক প্রতিবাদ জানাতে পারে। কোন ব্যক্তির জীবন যখন বিপন্ন হয়ে ওঠে সেই মুহূর্তে মানবিক কারণে আশ্রয় দেয়া হয়। এজন্য আশ্রয় প্রদানকারী রাষ্ট্র, সংস্থা বা ব্যক্তির আইনগত দায়িত্ব হলো আশ্রিত ব্যক্তির নিরাপত্তা বিধান করা।

১৯২৮ সালে হাভানাতে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বলা হয়, ফৌজদারি অপরাধে অপরাধী বা দণ্ডিত ব্যক্তিকে যুদ্ধ জাহাজে আশ্রয় অনুমোদন নিষিদ্ধ করা হয়, কিন্তু রাজনৈতিক অপরাধে অপরাধীদের যুদ্ধ জাহাজে আশ্রয়দান অনুমোদন করা হয়।

ঘ) **বাণিজ্যিক জাহাজে আশ্রয় :** বাণিজ্যিক জাহাজসমূহের উপর স্থানীয় কর্তৃপক্ষের এখতিয়ার থাকে, এজন্য বাণিজ্যিক জাহাজ স্থানীয় বাসিন্দাদের আশ্রয় অনুমোদন করতে পারে না।

কূটনৈতিক আশ্রয় সাধারণ আন্তর্জাতিক আইনে স্বীকৃত না হলেও কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে কাউকে তাৎক্ষণিক কোন বিপদ, জীবনের প্রতি হুমকী বা উচ্ছৃঙ্খল জনতা বা দাঙ্গাবাজদের আক্রমণ থেকে রক্ষার ব্যবস্থা হিসেবে কূটনৈতিক মিশনসমূহে সাময়িক আশ্রয় নিষিদ্ধ নয় বলে মনে করা যায়। বিষয়টি বিশেষ পরিস্থিতিতে মানবিক বিবেচনা দ্বারাই নির্ধারিত হয়, যার বিপক্ষে কোন নির্দিষ্ট বিধান দাঁড় করানো কঠিন।

বহিঃসমর্পণ
Extradition

সাধারণত প্রত্যেক রাষ্ট্র তার ভূ-খণ্ডের অভ্যন্তরে বসবাসকারী ব্যক্তির উপর উহার সম্পূর্ণ এখতিয়ার প্রয়োগ করতে পারে। কিন্তু বিশেষ কিছু পরিস্থিতির ক্ষেত্রে যখন কোন ব্যক্তি অপরাধ করে অন্য রাষ্ট্রে পালিয়ে যায় তখন ঐ ব্যক্তির উপর তার রাষ্ট্রের কোন এখতিয়ার প্রয়োগ করারই অবকাশ থাকে না এবং ঐ অপরাধীর বিচার প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতি নিঃসন্দেহে বিশ্ব-মানবতার ও শান্তিশৃঙ্খলার জন্য হুমকীস্বরূপ। আর এরূপ অবস্থায় রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমেই উক্ত শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখা সম্ভব। উক্ত প্রকার অপরাধীদের বিচার ও শান্তি প্রদানের জন্যই আন্তর্জাতিক আইনে একটি মূলনীতি গৃহীত হয় যা বহিঃসমর্পণ বা Extradition নামে খ্যাত।

সাধারণভাবে অপরাধীর বহিঃসমর্পণ বলতে আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে দু'টি রাষ্ট্রের মধ্যে সন্ধি-চুক্তির শর্ত মোতাবেক বা পারস্পরিক সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে এক রাষ্ট্রের পলাতক অপরাধীকে অপর রাষ্ট্র কর্তৃক তার নিজ রাষ্ট্রের আইনসংগত কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর বা সমর্পণ করাকে বুঝায়। এককথায় কোন রাষ্ট্রে পলাতক কোন অপরাধীকে তার নিজ রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষের নিকট সমর্পণ করাকেই অপরাধীর বহিঃসমর্পণ বলে। এই পদ্ধতিতে অপরাধীর অনুপস্থিতিতে শাস্তি হওয়ার পরেও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ফিরিয়ে আনার দাবি করা যায়। মূলত সংঘটিত অপরাধের উপর সমর্পণকারী রাষ্ট্রের এখতিয়ার না থাকলেই বহিঃসমর্পণের প্রশ্ন দেখা দেয়। বহিঃসমর্পণ ব্যবস্থা গুরুতর অপরাধ দমনে আন্তর্জাতিক সহযোগিতারই বহিঃপ্রকাশ।

প্রখ্যাত আইনবিদ J.G. Starke তাঁর গ্রন্থে বহিঃসমর্পণ সম্পর্কে বলেন যে, বহিঃসমর্পণ শব্দটি এমন একটি পদ্ধতিকে নির্দেশ করে যার দ্বারা কোন চুক্তির অধীনে একটি রাষ্ট্র অপর কোন রাষ্ট্রের অনুরোধে ফৌজদারি অপরাধে অভিযুক্ত বা দোষি সাব্যস্ত ব্যক্তিকে অনুরোধকারী রাষ্ট্রের আইন অনুযায়ী বিচারার্থে সমর্পণ করে। কোন অপরাধীকেই সাজাবিহীন রাখা উচিত নয়- সেজন্যই আন্তর্জাতিক আইনে এই নীতিটির বিধান রাখা হয়েছে।

তার মতে দু'টি কারণে বিভিন্ন দেশের মধ্যে অপরাধীকে বহিঃসমর্পণের ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে:

প্রথমত : সভ্য জগতের রাষ্ট্রসমূহের প্রত্যাশা হচ্ছে যে, কোন অপরাধীকে শাস্তিবিহীন যেতে দেয়া উচিত নয়। অপরাধী অবশ্যই আশ্রয়গ্রহণকারী রাষ্ট্র কর্তৃক শাস্তিপ্রাপ্ত হবে অথবা অপরাধীকে অবশ্যই ঐ রাষ্ট্রের কাছে সমর্পণ করতে হবে, যে রাষ্ট্র তাকে শাস্তি দিতে পারবে;

দ্বিতীয়ত : যে দেশে অপরাধটি সংঘটিত হয়েছে সেই দেশই হবে অপরাধীর বিচার হবার জন্য প্রকৃত স্থান। কেননা অপরাধীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রমাণের সুবিধা সেদেশেই পাওয়া যাবে।

এইরূপ পলাতক অপরাধী সমর্পণ সাধারণত বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পাদিত সন্ধি-চুক্তির শর্ত মোতাবেক নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। অনুরূপ কোন সন্ধি-চুক্তির অবর্তমানে অথবা পলাতক অপরাধী সমর্পণ বা হস্তান্তর সম্পর্কিত কোন শর্তের অবর্তমানে অপরাধীকে প্রত্যর্পণ করা বা না করা সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের ইচ্ছার উপরই নির্ভরশীল। কোন পলাতক অপরাধীকে সমর্পণ বা প্রত্যর্পণ সম্পর্কিত বিষয়কে আন্তর্জাতিক আইনে সৌজন্যমূলক ব্যাপার বলে বিবেচনা করা হয়। অর্থাৎ কোন রাষ্ট্র এইরূপ পলাতক অপরাধীর প্রত্যর্পণ সম্পর্কিত বিষয়কে অধিকার হিসেবে দাবি করতে পারে না।

বহিঃসমর্পণ চুক্তি

আন্তর্জাতিক আইনে এমন কোন বিধান নাই যা দ্বারা কোন রাষ্ট্রকে বহিঃসমর্পণে বাধ্য করা যায়। কিন্তু একটি রাষ্ট্র বহিঃসমর্পণ করলে অন্য রাষ্ট্র তা গ্রহণ করবে। যতক্ষণ পর্যন্ত রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বহিঃসমর্পণ চুক্তি না থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন রাষ্ট্র অপরাধীকে বহিঃসমর্পণ করতে বাধ্য নয়। এই চুক্তি দ্বি-পাক্ষিক বা বহু-পাক্ষিক হতে পারে। তবে দ্বি-পাক্ষিক চুক্তিই বেশি হয়ে থাকে।

যদি কোন রাষ্ট্রে বহিঃসমর্পণের কোন চুক্তি না থাকে এবং উক্ত রাষ্ট্র যদি বহিঃসমর্পণ করতে চায় তবে আন্তর্জাতিক আইন সে রাষ্ট্রকে কোনভাবে বাঁধা দিতে পারে না। উক্ত বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি মামলা হচ্ছে **Factor Vs. Laubenheimer 290 US 276 (1933).**

বহিঃসমর্পণ সংক্রান্ত নীতির উপর ১৯৩৩ সালে Montevideo Treaty স্বাক্ষরিত হয়। এই Treaty তে বলা হয় যে, বহিঃসমর্পণের চুক্তি থাকলে একটি রাষ্ট্রের যেমন অধিকার জন্মে অপরাধীকে ফিরিয়ে নেবার দাবি করার তেমনি অন্য একটি রাষ্ট্রের উপর দায়িত্ব অর্পিত হয় বহিঃসমর্পণ করার জন্য।

বৈশিষ্ট্য/ উপাদান

প্রচলিত আন্তর্জাতিক আইন কখনোই বহিঃসমর্পণের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করে নি, যদিও এটি বেশ পুরনো ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিষয়টি সবসময়ই দ্বি-পাক্ষিক চুক্তির ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। বিভিন্ন রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সম্পাদিত অসংখ্য দ্বি-পাক্ষিক চুক্তির শর্তাবলী থেকে বহিঃসমর্পণ সংক্রান্ত কিছু অভিন্ন নীতিমালা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। একটি বহিঃসমর্পণ চুক্তির মধ্যে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য থাকলে বহিঃসমর্পণ নীতি কার্যকর হবে-

১. বহিঃসমর্পণযোগ্য অপরাধের সংজ্ঞা (Extraditable Offence)

গুরুতর অপরাধ যেমন হত্যা, খুন, ধর্ষণ, রাহাজানি, সন্ত্রাস, নারী ও শিশু পাচার, অবৈধ মাদকদ্রব্য ব্যবসা, হাইজ্যাক ইত্যাদি বহিঃসমর্পণযোগ্য অপরাধ। অর্থাৎ যে অপরাধের জন্য বহিঃসমর্পণ চাওয়া হয় তা মারাত্মক ও গুরুতর হতে হবে।

২. দ্বৈত অপরাধের নীতি (Principle of Double Criminality)

যে অপরাধের জন্য বহিঃসমর্পণ করা হবে তা এখতিয়ার প্রয়োগকারী ও সমর্পণকারী উভয় রাষ্ট্রেই অপরাধ বলে পরিগণিত হতে হবে। এটা দ্বৈত অপরাধীত্ব নীতি (Principle of double criminality) নামে খ্যাত। শুধুমাত্র এক রাষ্ট্রের আইনে অপরাধ হলে সেটা বহিঃসমর্পণযোগ্য অপরাধ হবে না। অর্থাৎ দ্বৈত অপরাধের নীতি অনুযায়ী অপরাধটি উভয় দেশের আইন অনুযায়ী অপরাধ হিসেবে গণ্য হতে হবে। এরকম ক্ষেত্রে বহিঃসমর্পণ শুধুমাত্র আশ্রয়দানকারী রাষ্ট্রের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল।

মামলা : Re Arton; রে আরটন; (1896)

মিঃ Arton একজন ফরাসি নাগরিক। তিনি ফ্রান্সে account documents-এর কিছু ক্ষতিসাধন করে বৃটেনে পালিয়ে যান। ফ্রান্স তখন বৃটেনের কাছে তার বহিঃসমর্পণ দাবি করে। মিঃ Arton যে অপরাধ করেছেন তার ফরাসি নাম হচ্ছে "Faux"। বহিঃসমর্পণ চাওয়ার পর বৃটেন এই শব্দটির ইংলিশ অনুবাদ করেন। অনুবাদের পর Arton-এর অপরাধের ব্রিটিশ নাম হয় "Forgery" বা জালিয়াতি এবং এটি ব্রিটিশ ও ফ্রান্সের আইন অনুযায়ী অপরাধ হিসেবে গণ্য হয় বিধায় আদালত Mr. Arton কে বহিঃসমর্পণ করার নির্দেশ দেয়।

বহিঃসমর্পণযোগ্য অপরাধের সংজ্ঞা অনুযায়ী দ্বৈত অপরাধের নীতি নির্ধারণে নিম্নলিখিত পদ্ধতিসমূহ দেখা হয়-

i. দণ্ডের নির্দিষ্ট কোন মাস বা বছরের উল্লেখ থাকতে হবে। যেমন- অনধিক এক বছরের কারাদণ্ড। এ রকম উল্লেখ থাকলেই এটি গুরুতর অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। এই দণ্ড দুই দেশের এখতিয়ারেই (Jurisdiction) থাকতে হবে।

ii. ১৯৩৩ সালে Movtevideo Treaty অনুযায়ী যে সকল অপরাধের জন্য ১২ মাস বা ১ বছরের সাজা হতে পারে সেগুলি গুরুতর অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত হবে এবং এরজন্য বহিঃসমর্পণ প্রযোজ্য হবে। এটিও দু'দেশের এখতিয়ারের মধ্যে থাকতে হবে।

iii. ব্রিটিশ রীতি অনুসারে কোন কোন অপরাধকে বহিঃসমর্পণযোগ্য তথা গুরুতর অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হবে তার একটি তালিকা উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

৩. বহিঃসমর্পণযোগ্য ব্যক্তির সংজ্ঞা (Definition of Extraditable Person)

যে ব্যক্তি কোন বহিঃসমর্পণযোগ্য অপরাধ করেছে সে ব্যক্তিকেই বহিঃসমর্পণযোগ্য ব্যক্তি বলা হয়। বহিঃসমর্পণযোগ্য ব্যক্তির সংজ্ঞা কোন কোন চুক্তিতেও থাকতে পারে। আবার অনেক সময় বিদেশী রাষ্ট্র ন্যায়বিচার করবে কি না এ সন্দেহের ভিত্তিতে বিদেশে সংঘটিত অপরাধের জন্য নিজ নাগরিককে রাষ্ট্র বহিঃসমর্পণ করে না। এক্ষেত্রে নিয়ম হচ্ছে রাষ্ট্র যদি কোন ব্যক্তিকে বহিঃসমর্পণ না করে তবে সে রাষ্ট্রকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে তার বিচার করতে হবে।

এটি ল্যাটিন আমেরিকার রীতি। এতে বলা হয় 'তুমি তোমার নাগরিককে বহিঃসমর্পণ না করলে তুমি তার বিচার করো।'

এ সম্পর্কে ১৯৩৩ সালের Montevideo Treaty তে আরো বলা হয়েছে যে, নিজ দেশের নাগরিককে বহিঃসমর্পণ না করার যে রীতি রয়েছে, সে নীতি অনুযায়ী নিজের দেশের আইন অনুযায়ী উক্ত নাগরিকের বিচার করতে হবে।

৪. বিশেষত্ব নীতি (Doctrine of Specialty)

যে বিশেষ অপরাধের জন্য বহিঃসমর্পণ করা হচ্ছে, এখতিয়ার প্রয়োগকারী রাষ্ট্র শুধু সেই অপরাধের জন্য অপরাধীর বিচার করতে পারবে, অন্য কোন অপরাধের জন্য নয়। এই নীতি বিশেষত্ব নীতি বা Doctrine of Specialty নামে খ্যাত।

সার্বজনীনভাবে এই নীতি স্বীকৃত হয়েছে যে, যে ব্যক্তিকে বহিঃসমর্পণ করা হয়েছে বা হবে এবং যে অপরাধের জন্য তাকে বহিঃসমর্পণ করা হয়েছে বা হবে শুধুমাত্র সেই অপরাধের জন্য তার বিচার করা যাবে, অন্য কোন অপরাধের বিচার করতে পারবে না। অন্য অপরাধের বিচার করতে হলে তাকে মুক্তি দেয়ার পর করতে হবে। প্রাসঙ্গিক মামলা–

মামলা : U.S. Vs Raucher;ইউ.এস বনাম রোচার; (1886)

এই মামলায় আমেরিকা Raucher কে বৃটেনের নিকট হতে এই মর্মে ফেরত আনে যে, তিনি আমেরিকার একটি জাহাজের একজন সহযোগী Servent কে হত্যা করে এসেছেন। কিন্তু পরবর্তীতে তাকে উক্ত হত্যার জন্য বিচার না করে Janssen নামক একজনকে গুরুতর আঘাত করার অভিযোগে বিচার করা হয়। আমেরিকার সুপ্রীম কোর্ট সিদ্ধান্ত দেন যে, একজন ব্যক্তিকে যখন বহিঃসমর্পণ চুক্তির অধীনে আদালতের এখতিয়ারে আনা হয় তখন ঐ ব্যক্তিকে শুধুমাত্র ঐ নির্দিষ্ট অপরাধের জন্য বিচার করা যেতে পারে।

এ প্রসঙ্গে আরো একটি প্রাসঙ্গিক মামলা হচ্ছে–

মামলা : The Govt. of Greece Vs. Governor of Brixton Prison; গ্রীস সরকার বনাম গভর্নর বিক্সটন কারাগার; (Greece Vs. UK, 1971)

একজন গ্রীক নাগরিককে কেন্দ্র করে এই মামলার উদ্ভব ঘটে। তিনি প্রতারণার দ্বারা বেনামে অনেক চুক্তি করেছেন এবং অনেক টাকা আত্মসাৎ করে বৃটেনে পালিয়ে যান। তার অনুপস্থিতিতে গ্রীসের আদালতে তার বিচার হয় এবং তাকে কয়েক বছরের সাজা দেয়া হয়। গ্রীস তখন বৃটেনের কাছে তার বহিঃসমর্পণ দাবি করে। অভিযুক্ত ব্যক্তি স্বীকার করেন তিনি সামরিক সরকারের (জান্তার) বিরুদ্ধে মুক্তির সংগ্রামে জড়িত ছিলেন। এখন যদি বৃটেন তাকে গ্রীসে পাঠিয়ে দেয় তাহলে শুধু প্রতারণার জন্যই তার বিচার করা হবে না, সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্যও বিচার করা হবে এবং তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। তাই বৃটেন যেন তাকে গ্রীসে বহিঃসমর্পণ না করে সেজন্য বৃটেনকে অনুরোধ করে।

ব্রিটিশ হাইকোর্ট সিদ্ধান্তে বলেন বিশেষত্ব নীতির (Specialty Principle) অধীনে যখন একজন অভিযুক্তকে তার কৃত একাধিক অপরাধের মধ্যে যে কোন ১টির বিচারের জন্য তাকে দাবি করে, তখন তারা শুধু ঐ অপরাধটিরই বিচার করতে পারবে, অন্যান্য অপরাধের জন্য নয়। গ্রীস একটি সভ্য দেশ, তারাও এ নীতি মেনে চলবে এবং তাকে শুধু প্রতারণার জন্যই বিচার করবে–রাষ্ট্রদ্রোহিতার জন্য নয়, এমন বিশ্বাস বৃটেনের রয়েছে এবং তাই বহিঃসমর্পণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৫. আপাত প্রতীয়মান কেস (Prima Facie Case)

কোন পলাতক ব্যক্তিকে সাধারণত দাবিদার রাষ্ট্রে সমর্পণ করা হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত সমর্পণীয় রাষ্ট্রের কাছে তার বিরুদ্ধে প্রাথমিকভাবে একটি প্রমাণ তুলে ধরা না হয়। **Tarashor Extradition Case (1963)**

মামলায় অভিযুক্তের Prima Facie Case প্রমাণ করতে না পারায় তাকে অভিযোগ হতে অব্যাহতি দেয়া হয়, কারণ Prima Facie Case হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য প্রমাণ ছিল না।

যে সকল ক্ষেত্রে বহিঃসমর্পণ গ্রহণযোগ্য নয়

সামরিক অপরাধ, রাজনৈতিক অপরাধ এবং ধর্মীয় অপরাধসমূহ সাধারণত বহিঃসমর্পণযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হয় না। কিন্তু সন্ত্রাসবাদকে এই নীতির আওতাভুক্ত বলে গণ্য করা হয় না। বর্তমানে সন্ত্রাসবাদকে রাজনৈতিক অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয় না। এটি বহিঃসমর্পণযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়। বৃটেন ও আমেরিকার মধ্যে ১৯৮৬ সালে বহিঃসমর্পণ সংক্রান্ত যে দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি হয়, তাতে বলা হয়েছে 'সন্ত্রাস একটি ফৌজদারি অপরাধ, রাজনৈতিক অপরাধ নয়।'

রাজনৈতিক অপরাধ নির্ধারণের উপায়

রাজনৈতিক অপরাধ বহিঃসমর্পণযোগ্য অপরাধ নয়। কিন্তু কোনটি রাজনৈতিক অপরাধ তা নির্ধারণের কোন সুনির্দিষ্ট পন্থা নেই। কারণ একটি মাত্র রাজনৈতিক অপরাধের সঙ্গে অনেকগুলো ঘটনা জড়িত থাকে। অপরাধের উদ্দেশ্য, পরিধি ইত্যাদি বিচার করে কোনটি রাজনৈতিক অপরাধ সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

রাজনৈতিক অপরাধ নির্ধারণে বিভিন্ন রাষ্ট্র বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে। অপরাধী যে দেশে পালিয়ে যায় ঐ দেশের বিচার বিভাগ বা উচ্চ আদালত সিদ্ধান্ত নিবেন অপরাধটি রাজনৈতিক না অরাজনৈতিক। নিম্নলিখিত মামলাগুলোতে বিভিন্ন রাজনৈতিক অপরাধকে মানদণ্ড হিসেবে দেখানো হয়েছে।

মামলা : Re Castioni Case; রে ক্যাসটিওনি মামলা; (Switzerland Vs. U.K, 1891)

এই মামলায় Castioni একজন সুইজারল্যাণ্ডের নাগরিক। সুইজারল্যাণ্ডে রাজনৈতিক গোলযোগের সময় Castioni একজন মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলরকে হত্যা করে ইংল্যাণ্ডে

পালিয়ে যায়। অতঃপর সুইজারল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ডের কাছে মিঃ Castioni কে বহিঃসমর্পণের দাবি উত্থাপন করে। Castioni যুক্তি প্রদর্শন করে যে, সে রাজনৈতিক অপরাধ করেছে তাই বৃটেন তাকে বহিঃসমর্পণ করতে পারবে না। বিষয়টি চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তির জন্য তখন ইংল্যাণ্ডের Queen's Bench এ প্রেরণ করা হয়।

বিষয় পর্যালোচনার পর ইংল্যান্ডের Queen's Bench সিদ্ধান্ত দেন যে, যেহেতু রাজনৈতিক গোলযোগে হত্যাকাণ্ডটি সংঘটিত হয়েছে সেহেতু Castioni কর্তৃক সংঘটিত অপরাধটি রাজনৈতিক প্রকৃতির। সুতরাং ইংল্যাণ্ড মিঃ Castioni কে সুইজারল্যাণ্ডে বহিঃসমর্পণ করতে বাধ্য নয়।

অরাজকতায় বিশ্বাসী কোন দল যদি দেশের প্রচলিত আইন ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে কোন অপরাধ কার্য সংঘটন করে, তাহলে সেটা রাজনৈতিক অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে না। এ ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক মামলা–

মামলা : Re Meunier Case; রে মিউনিয়ার মামলা; (France Vs. UK,Q.B.D. 1894)

মিঃ Meunier একজন ফরাসি নাগরিক। তিনি একজন নৈরাজ্যবাদী ছিলেন। তিনি মনে করতেন রাষ্ট্র বলতে কিছু নেই, সরকার বলতে কিছু নেই। এই প্রকার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের অধিকারক ছিলেন তিনি। রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার অভিপ্রায়ে তিনি বিভিন্ন স্থানে বোমা ফেলতেন। তিনি সেনা ছাউনিতে দু'টি বোমা বিস্ফোরণ করে ইংল্যান্ডে পালিয়ে যান। ফ্রান্স তখন ইংল্যাণ্ডের কাছে তার বহিঃসমর্পণ দাবি করে। Meunier তখন যুক্তি দেখাল যে, তার অপরাধটি রাজনৈতিক অপরাধ তাই ইংল্যাণ্ড তাকে বহিঃসমর্পণ করতে পারবে না।

আদালত রায় দেয় যে, মিঃ Meunier একজন নৈরাজ্যবাদী, সন্ত্রাসবাদী। নৈরাজ্যবাদ ও সন্ত্রাসবাদ বিশ্বের সকল সরকার ও রাষ্ট্রের শত্রু। মিঃ Meunier একজন সন্ত্রাসবাদী, ফৌজদারি অপরাধী। সন্ত্রাস কখনো রাজনৈতিক অপরাধ হতে পারে না। রাজনৈতিক অপরাধ হতে হলে দুই বা ততোধিক পক্ষের অস্তিত্ব থাকতে হবে এবং নিজ পছন্দ বা অভিপ্রায় অনুযায়ী প্রত্যেক পক্ষকেই একটি নতুন সরকার গঠনের প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এখানে যেহেতু দু'টো পক্ষের উপস্থিতি নেই, তাই এটি রাজনৈতিক অপরাধ নয়, এটি একটি সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ। তাই ইংল্যাণ্ড মিঃ Meunier কে ফ্রান্সে বহিঃসমর্পণ করতে বাধ্য।

মামলা : Ex Parte Kolczynski; কোল্কজেনস্কি মামলা; (Poland Vs UK-1955)

মিঃ Kolczynski ছিলেন পোল্যান্ডের নাগরিক। তিনি পোল্যান্ডের একটি জাহাজের নাবিক ছিলেন। তিনি এবং অপর কয়েকজন নাবিক জাহাজের ক্যাপ্টেনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে একটি ট্রলারে করে বৃটেনে পালিয়ে যান এবং বৃটেনে আশ্রয় চান। উন্মুক্ত সাগরে কোন অপরাধ হলে পোল্যান্ডের জাহাজের নাবিকদের বিচারের এখতিয়ার কেবলমাত্র পোল্যান্ডেরই রয়েছে– এই যুক্তিতে পোল্যান্ড তার নাবিকদের ফেরত চায়, তখন Kolczynski বলেন

যে, তারা কেবলমাত্র জাহাজের নাবিকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নি, জাহাজের কিছু কমিউনিস্ট ছিল যারা সবসময় তাদের কাজকর্ম ও কথাবার্তার প্রতি লক্ষ্য রাখতো। তাই তারা সমাজতন্ত্রের হাত থেকে মুক্ত হয়ে গণতান্ত্রিক দেশ বৃটেনে মুক্তভাবে বসবাস করার জন্য পালিয়ে এসেছে। তাই যদি বহিঃসমর্পণ করা হয় শুধু নাবিকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য নয়; বরং কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্যও তাদের বিচার করা হবে। তাই Kolczynski বৃটেনকে অনুরোধ জানায় যেন তাদেরকে পোল্যান্ডে ফিরিয়ে না দেয়া হয়।

আদালত বিষয়টি পর্যালোচনার পর সমাজতন্ত্রের হাত থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য Kolczynski ও তার সহযোগীগণ কর্তৃক সংঘটিত অপরাধকে রাজনৈতিক অপরাধ হিসেবে গণ্য করেন এবং নির্দেশ দেন যে, বৃটেন তাদেরকে ফেরত দিতে বাধ্য নয়।

মামলা : Abu Daud Case; আবু দাউদ মামলা; (1977)

১৯৭৬ সালে যখন মিউনিখ অলিম্পিক গেমস হচ্ছিল, প্যালেস্টিনিয়ান নাগরিক আবু দাউদ ইসরাইলী এ্যাথলেটদের বোমা নিক্ষেপ করে হত্যা করে। এরপর আবু দাউদ ফ্রান্সে পালিয়ে গিয়ে বসবাস করতে শুরু করলে ফ্রান্সের গোয়েন্দা সংস্থা তাকে গ্রেফতার করে। আবু দাউদের গ্রেফতারের খবর প্রকাশিত হবার পর জার্মানী ও ইসরাইল উভয়েই আবু দাউদের বহিঃসমর্পণ দাবি করে। জার্মানী বহিঃসমর্পণ দাবি করে এই যুক্তিতে যে, অপরাধটি তার দেশের এখতিয়ারে সংঘটিত হয়েছে। অপরদিকে ইসরাইল দাবি করে এই যুক্তিতে যে, তার দেশের নাগরিককে হত্যা করা হয়েছে।

ফরাসি আদালত রায় দেয় যে, জার্মানী কিংবা ইসরাইল কারোই আবু দাউদের বহিঃসমর্পণ চাওয়ার অধিকার নেই। আদালত আবু দাউদকে জার্মানীর কাছে দেয় নি কারণ জার্মানী বহিঃসমর্পণের জন্য যথাযথ মাধ্যমে তাদের দাবি জানায় নি। আর ইসরাইলে যেহেতু অপরাধটি সংঘটিত হয় নি তাই তারাও বহিঃসমর্পণের অধিকারী নয়। আদালত আবু দাউদকে ফ্রান্সে না রেখে বহিষ্কার করে আলজেরিয়াতে প্রেরণ করে। সেখানে আবু দাউদকে বীরোচিত সম্বর্ধনা দেয়া হয়।

মামলা : Lockerbie Case; লকারবি মামলা; (Libya Vs. UK and USA, ICJ, 1992)

১৯৮৮ সালে প্যান এম ফ্লাইটের-১০৩ একটি বিমান নিউইয়র্ক থেকে লন্ডন হয়ে জার্মানীর ফ্রাঙ্কফুর্টের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। পথিমধ্যে স্কটল্যান্ডের ছোট্ট শহর লকারবীর আকাশ সীমায় বোয়িং ৭৪৭ মডেলের এই বিমানটির লাগেজ কম্পার্টমেন্টে একটি বিস্ফোরণে বিমানটি বিধ্বস্ত হয়। এতে বিমানের সকল ক্রু এবং ২৫৯ জন যাত্রীর সকলেই নিহত হন। শুধু তাই নয়, ধ্বংসপ্রাপ্ত বিমানের বিভিন্ন অংশের পতনের ফলে লকারবীর ১১ জন অধিবাসী নিহত হন।

ব্যাপক ভিত্তিক তদন্তে দেখা যায় যে, এই বিস্ফোরণ ছিল একটি নাশকতামূলক কাজ এবং লিবিয়ার গোয়েন্দা বিভাগের দু'জন কর্মকর্তা-এর সাথে জড়িত। এদের একজন হলো :

আবদেল বাসেত আল ম্যাগরাহি (৪৮) এবং অপরজন আল-আমিন খালিফা ফাহিমা (৪৪), ১৯৯১ সালের ১৪ নভেম্বর তাদের নামে ওয়ারেন্ট জারি হয়। লন্ডন ও ওয়াশিংটন এই দুই অপরাধীকে বহিঃসমর্পণের জন্য লিবিয়াকে চাপ প্রয়োগ করে। লিবিয়া এতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে এবং দাবি করে যে তার নাগরিকদ্বয় নির্দোষ। এমনই এক পর্যায়ে ১৯৯২ সালে লিবিয়া বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আদালতে এই বলে মামলা করে যে এই দু'টি রাষ্ট্র ১৯৭১ সালের মন্ট্রিল কনভেনশনকে পাস কাটিয়ে একটি আন্তর্জাতিক আইনের অধিভুক্ত বিষয়কে রাষ্ট্রীয় আইনের অধীনে নেয়ার চেষ্টা করছে এবং লিবিয়ার উপর বল প্রয়োগ করছে। অপরদিকে উক্ত রাষ্ট্রদ্বয় আন্তর্জাতিক আদালতের এখতিয়ার নিয়েই প্রশ্ন তোলে; যদিও আদালত মত প্রকাশ করে যে তার এখতিয়ার আছে, তথাপি বিষয়টি আদালতমুখী করা যায় নি।

অভিযুক্ত দু'জন নাগরিককে হস্তান্তর করার জন্য জাতিসংঘের পরপর দু'টি সিদ্ধান্তকেও যখন লিবিয়া গুরুত্ব দেয় নি, তখন ১৯৯২ সালে লিবিয়ার উপর জাতিসংঘ অবরোধ আরোপ করে। পরবর্তীতে আরো ৫ বছর আলাপ-আলোচনা চলার পর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, স্কটিশ আইনে বিচার হলেও বিচার কার্য পরিচালিত হবে একটি নিরপেক্ষ স্থানে। অবশেষে ১৯৯৯ সালের মার্চে লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট গাদ্দাফী ঘোষণা করেন যে, লিবিয়া অভিযুক্ত দু'জনকে হস্তান্তর করবে।

এপ্রিল ২০০০-এ বিচার কার্য শুরু হয়। নেদারল্যান্ডের যে স্থানটিতে বিচার কার্য পরিচালিত হয়, বিচারকালীন সময়ের জন্য তাকে স্কটিশ ভূ-খণ্ড বলে ঘোষণা করা হয়। ৩১ জানুয়ারি, ২০০১ তারিখে তিনজন বিচারপতি সমন্বয়ে গঠিত আদালত লকারবী মামলার রায় প্রদান করেন। এতে ম্যাগরাহিকে হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করে ২০ বছরের কারাদণ্ড দিয়ে স্কটিশ কারাগারে প্রেরণ করা হয়, আর অপর অভিযুক্ত আল-আমিন ফাহিমা নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ায় মুক্তি পায়। সে লিবিয়ায় ফিরে এলে তাকে বিরোচিত সম্বর্ধনা দেয়া হয়।

মনে রাখা প্রয়োজন যে পরিবর্তিত বিশ্বে 'রাজনৈতিক অপরাধের' সংজ্ঞা সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে। বর্তমানে সন্ত্রাসবাদ, বিশেষ করে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ যেমন রাজনৈতিক অপরাধের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত নয়, তেমনি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, বিশেষ করে রাষ্ট্র নায়কদের হত্যাও রাজনৈতিক অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয় না, যে ব্যাপারে ১৯৮৮ সালে সাক্ষরিত ইতালি ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বহিঃসমর্পণ চুক্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই চুক্তিতে স্পষ্ট করে বলা হয় যে, রাজনৈতিক হত্যাও জঘন্যতম অপরাধ এবং তাই এ অপরাধও বহিঃসমর্পণযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার অন্যতম আসামী মেজর বজলুল হুদাকে থাইল্যান্ড থেকে বহিঃসমর্পণের জন্য বাংলাদেশ দাবি জানালে, মেজর হুদার আইনজীবী বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডকে 'রাজনৈতিক' চিহ্নিত করে বহিঃসমর্পণের বিরুদ্ধে যুক্তি দেখান। থাইল্যান্ডের আদালত অবশ্য 'হত্যা'কে রাজনৈতিক কর্ম হিসেবে স্বীকৃতি না দিয়ে তাকে বিচারের জন্য বাংলাদেশে বহিঃসমর্পণ করে।

আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইন

International Law of the Sea

আন্তর্জাতিক আইনের ক্রমবিকাশের পথ আর সমুদ্র আইনের ঐতিহাসিক পরিক্রমা অভিন্ন। বর্তমান বিশ্বের নৌপরাশক্তিগুলো অর্থনৈতিকভাবে লাভবান ও নিজেদের শক্তি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে তিনশত বছরের পূর্ব থেকেই সমুদ্রকে অন্যতম অনুষঙ্গ বলে মনে করত। ধীরে ধীরে বিশ্বের বিভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ তাদের মধ্যকার সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে সমুদ্র আইনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। রোমান শাসনামলে স্বাধীন রাষ্ট্রগুলো পারস্পরিক বন্ধনকে সুদৃঢ় ও উন্নততর করার নিমিত্তে রাষ্ট্রীয় আনুষঙ্গিক বিষয়ে আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নিলেও আধুনিক বিশ্বে মুক্তবাজার অর্থনীতির যুগে সমুদ্র আইনের গুরুত্ব দিন দিন বেড়েই চলেছে।

আন্তর্জাতিক আইনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শাখা এই সমুদ্র আইন। সমুদ্র আইন হচ্ছে কতগুলো রীতিনীতি, প্রথা ও নিয়ম-কানুনের সমষ্টি; যেগুলি বিভিন্ন রাষ্ট্র নৌ-চলাচল, খনিজ ও মৎস্য সম্পদ আহরণ এবং সমুদ্রের বহুমুখী ব্যবহারকরণে মেনে চলবে। এক কথায় সমুদ্রে আচার আচরণের সুনিয়ন্ত্রক-ই সমুদ্র আইন।

প্রাচীনকালে সমুদ্র সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল। ফলে বিশ্বের নৌ-পরাশক্তিগুলো সমুদ্রের বিস্তীর্ণ অঞ্চল নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখে দিত যা অন্যান্য রাষ্ট্রের অধিকারকে স্বভাবতই ক্ষুণ্ন করত। এমনকি পরাশক্তিগুলি সমুদ্র উপকূলবর্তী রাষ্ট্রের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। ধীরে ধীরে আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী সাফল্যের সাথে সাথে সমুদ্র হয়ে উঠতে থাকে অর্থনৈতিক সুতিকাগার। অনেক বিশেষজ্ঞরা ভবিষ্যত অর্থনীতি সমুদ্রের অর্থনীতি হবে বলে জোর মতামত দিয়ে থাকেন। তাছাড়া বিশ্বের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দুই-তৃতীয়াংশ সম্পন্ন হয় সমুদ্র পথে। মূলত দু'টি উদ্দেশ্যকে অগ্রগণ্য মনে করেই সামুদ্রিক আইন—লিখিতভাবে প্রণয়নের অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনীয়তা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় অনুভব করেন। যথা :

১. ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে

২. প্রাকৃতিক বিভিন্ন খনিজ সম্পদ আহরণের উদ্দেশ্যে।

ইতিহাস

সমুদ্র নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে উপকূলীয় রাষ্ট্রের নিরাপত্তা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়, কেননা বিশ্বের নৌ-পরাশক্তিগুলো যেমন পর্তুগাল, স্পেন, যুক্তরাজ্য প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলো আঞ্চলিক সমুদ্রের প্রসারতায় সমুদ্রের বিস্তীর্ণ অংশের উপর সার্বভৌমত্ব দাবি করে, যা স্বীকৃত হয় নি কখনই। উপকূলীর রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে তথা কতটুকু সমুদ্রাংশ উপকূলীয় রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে থাকবে– যা বিদেশী শত্রুর হুমকিকে মোকাবেলা করবে-এ প্রসঙ্গে ১৭০২ খ্রিষ্টাব্দে প্রখ্যাত ডাচ্ আইনবিদ Bynkershoek তার de dominio maris dissertatio

(Essay on sovereignty over the sea) গ্রন্থে তাঁর বিখ্যাত 'কামানের পাল্লানীতি' (cannon shot rule) প্রচার করেন। ঠিক একইভাবে আন্তর্জাতিক আইনের জনক হুগো গ্রাসিয়াস (Hugo Grotius) ও এই নীতিকে সমর্থন করেন। অর্থাৎ উপকূল হতে যতদূর পর্যন্ত কামানের গোলা যাবে ঠিক ততদূর পর্যন্ত সমুদ্রের উপর উপকূলীয় রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব থাকবে, যার দৈর্ঘ ছিল তিন নটিক্যাল মাইল (3 nautical miles)। কিন্তু হুগো গ্রোসিয়াস মত দেন যে, এই তিন নটিক্যাল মাইলের বাইরে সমুদ্রের দিকে সব রাষ্ট্রই সমুদ্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্বাধীন। এই নীতির উপর ভিত্তি করেই উনিশ শতকে তিন নটিক্যাল মাইল প্রশস্ত আঞ্চলিক সমুদ্রের নীতি বিশ্ব সম্প্রদায় ব্যাপকভাবে গ্রহণ করে। তবে বিংশ শতাব্দীতে নব নব বিজ্ঞানের আবিষ্কারে উজ্জীবিত হয়ে অনেক শক্তিশালী রাষ্ট্র যেমন– যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য সহ আরো অনেকেই ৩ নটিক্যাল মাইলের বেশি আঞ্চলিক সমুদ্রসীমার দাবি করে বসে। ১৯৩০ সালে হেগ সম্মেলনে সর্বাধিক ৩ নটিক্যাল মাইল আঞ্চলিক সমুদ্রসীমা নির্ধারণের প্রস্তাব হলেও তা প্রত্যাখ্যাত হয়। তবে প্রচলিত ৩ থেকে ৬ নটিক্যাল মাইল মৎস্য শিকার অঞ্চলের (Fishing Zone) ধারণা বহাল থাকে। ১৯৫৮ সালের জেনেভা সম্মেলনে এই সীমা ৩ অথবা ১২ নটিক্যাল মাইল নির্ধারণের প্রস্তাব করা হলেও মীমাংসিত হয় নি; তবে ১২ নটিক্যাল মাইল সংলগ্ন অঞ্চলের বিস্তৃতির বিধান করা হয়। ১৯৬০ সালের দ্বিতীয় জেনেভা সম্মেলনও সমুদ্র আইন সম্পর্কে ফলদায়ক নয়। তবে ১৯৮২ সালের সমুদ্র বিষয়ক কনভেনশন সমুদ্রের বিস্তৃতি নির্ধারণে মোটামুটি সফল।

বিভিন্ন সময়ে আঞ্চলিক সমুদ্র প্রসারে বিভিন্ন রাষ্ট্রের দাবি–

নটিক্যাল মাইল	দেশ	সংখ্যা (রাষ্ট্র)
৩	অস্ট্রেলিয়া, জাপান কানাডা, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, পাকিস্তান, জার্মানী সহ আরো অনেকে।	মোট ২৩টি
৪	সুইডেন, আইসল্যান্ড,ফিনল্যান্ড ও নরওয়ে	৪টি
৫	কম্বোডিয়া	১টি
৬	গ্রীস, স্পেন, পর্তুগাল, তুরস্ক এবং অন্যান্য	১৭টি
৯	মেক্সিকো	১টি
১০	আলবেনিয়া	১টি
১২	বুলগেরিয়া, চীন, কিউবা, মিশর ইন্দোনেশিয়া, ইথিওপিয়া, ইরাক ইরান ও অন্যান্য	মোট ২৯টি
১৩০	গিনি	১টি
২০০	চিলি, পেরু, ইকুয়েডর	৩টি

উপরোক্ত দেশগুলো ছাড়াও আরো অনেক রাষ্ট্র উপকূলীয় রাষ্ট্রের জন্য সমুদ্রসীমা ২৫০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত দাবি করে। এভাবে সময়ের সাথে সাথে সমুদ্রের সীমানা বাড়ানোর প্রক্রিয়াকে creeping annexation of the sea বলা চলে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির সময় সমুদ্রে মহীসোপানের উপর উপকূলীয় রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের দাবি পরিলক্ষিত হয়। ১৯৪৫ সালে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান (Truman) নিজ অধ্যাদেশ দ্বারা মহীসোপানের উপর নিজের দেশের সার্বভৌম এখতিয়ার ও নিয়ন্ত্রণ দাবি করে বসেন। সাথে সাথে অন্যান্য রাষ্ট্র যেমন দক্ষিণ আফ্রিকা, এরাও মহীসোপানের উপর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়। এর উপর সার্বভৌমত্ব দাবির মূল লক্ষ্য ছিল মহীসোপানের অগাধ খনিজ সম্পদ, যদিও ভৌগলিক অবিচ্ছিন্নতা ও নিরাপত্তা একটি যথাযোগ্য যুক্তি ছিল। বেশ কয়েকটি ল্যাতিন আমেরিকান দেশ ১৯৫২ সালে সান্তিয়াগো ঘোষণায় মহীসোপানের উপরস্থ জলরাশির উপরও উপকূলীয় রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব দাবি করে।

১৯৫১ সালের পূর্বে সমুদ্র সংক্রান্ত কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি বা বিধিবদ্ধ আইন ছিল না তবে দেশীয় বা রাষ্ট্রীয় আইন ছিল যেগুলি আন্তর্জাতিক প্রথা আইন হিসেবে বিশ্ব সম্প্রদায়ের নিকট সুগৃহীত হত। **ইঙ্গ-নরওয়ে মৎস্য শিকার মামলায় (১৯৫১)** রাষ্ট্রীয় জলসীমা ও সংলগ্ন অঞ্চলে মৎস্য শিকারের উদ্দেশ্যে নরওয়ে একটি আদেশ জারি করে সেটি আন্তর্জাতিক আদালত নরওয়ে কর্তৃক ঘোষিত সমুদ্রসীমানা পদ্ধতি ও প্রকৃতি সীমারেখা নির্ধারণকে স্বীকৃতি দেয় এবং ১৯৫৮ সালে জেনেভা কনভেনশনে যা সর্বপ্রথম আইন হিসেবে গৃহীত হয়।

সমুদ্র আইন বিষয়ক ১৯৫৮ সালের ও ১৯৮২ সালের কনভেনশন

বিশ্বে ১৯৫৮ সালের পূর্বে সমুদ্র সংক্রান্ত কোন বিধিবদ্ধ আইন প্রণীত হয় নি। কনভেনশনের পূর্বকালীন সময়ে প্রথাই সমুদ্র আইন নিয়ন্ত্রণ করত। বিভিন্ন সময়ে দ্বি-পাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে অথবা কোন দেশ তার স্বীয় ক্ষমতা বলে বিভিন্ন আইন করে সমুদ্রের নিয়ন্ত্রণ ও সার্বভৌমত্ব বজায় রাখত। কিন্তু প্রথাভিত্তিক আন্তর্জাতিক আইন পরিপক্ক ও সুস্পষ্টতা লাভ করতে সম্পূর্ণভাবে সক্ষম না হওয়ায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় সমুদ্রকে সুস্পষ্ট ও সুন্দর নিয়মে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার পর, জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক আইন কমিশনকে সমুদ্র আইন প্রণয়নের গুরুদায়িত্ব অর্পণ করে। সে লক্ষ্যেই সমুদ্র আইনের নানা দিক বিবেচনা করে সুস্পষ্ট ও সম্পূর্ণ আইন প্রণয়নের জন্য কমিশন আন্তর্জাতিক কমিশনের খসড়া প্রণয়ন করে এবং আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে গ্রহণের নিমিত্তে সম্মেলন আহ্বান করে।

১৯৫৮ সালে সুইজারল্যান্ডের রাজধানী জেনেভায় সর্বপ্রথম বিধিবদ্ধ চারটি কনভেনশন একসাথে একই বৈঠকে গৃহীত হয়, সেগুলো হল–

১. রাষ্ট্রীয় সমুদ্র ও নিকটস্থ অঞ্চল বিষয়ক কনভেনশন (Convention on the Territorial sea and Contiguous Zone)

২. উন্মুক্ত সমুদ্র বিষয়ক কনভেনশন (Convention on the High Sea)
৩. মহীসোপান বিষয়ক কনভেনশন (Convention of the Continental Shelf)
৪. মৎস্য শিকার ও প্রাণীজ সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ক কনভেনশন (Convention on Fishing and on the Protection of Living Resources)

উপরের কনভেনশনসমূহ পরবর্তীতে অনেক রাষ্ট্রের অনুমোদন (ratification) পেয়ে আন্তর্জাতিক চুক্তির কার্যকারীতায় উন্নীত হয়। তবে রাষ্ট্রীয় সমুদ্রের সীমা নির্ধারণ এবং উপকূলীয় রাষ্ট্রের একচেটিয়া মৎস্য শিকার অঞ্চলের সীমা নির্ধারণে জটিলতা থেকেই যায়। পরবর্তীতে ১৯৬০ সালে এই বিষয় দু'টি মীমাংসার জন্য জেনেভার আবার এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন ডাকা হয় যা শেষ পর্যন্ত অমীমাংসিত থেকে যায়।

সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথেই মানুষ নিজের গতিবিধি ও আচার আচরণকে যেমন পরিবর্তিত করে থাকে ঠিক তেমনি ১৯৫৮ সালের পর থেকে বিশ্বে সমুদ্র আইনের ধারণায় বিস্তর পরিবর্তন আসতে থাকে। আমেরিকার মহীসোপানের উপর সার্বভৌমত্ব দাবির প্রেক্ষিতে ল্যাতিন আমেরিকার অনেক দেশও একই প্রবণতা গ্রহণ করে।

তবে এই প্রবণতা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার অন্যতম সহায়ক হয়েছিল বিশ্বের শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক আবহাওয়া। সে সময় বিশ্বের প্রত্যেকটি দেশ নিজ নিজ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির দিকে ধাবিত হয়। সুতরাং উন্নয়নশীল দেশগুলো ও উন্নত ও শক্তিশালী দেশের ন্যায় স্ব-স্ব উপকূল থেকে সমুদ্রের দিকে নিজেদের প্রয়োজনেই অর্থনৈতিক সম্পদ আহরণের উদ্দেশ্যে সমুদ্র সীমানা বাড়াতে থাকে। তাছাড়াও ১৯৬০ সালের জেনেভা কনভেনশনের অমীমাংসিত বিষয় রাষ্ট্রীয় সমুদ্রে অবস্থিত ও আন্তর্জাতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ নৌপথ হিসাবে বিবেচিত প্রণালীর মধ্য দিয়ে সব সময় (শান্তি ও যুদ্ধকালীন) যুদ্ধ জাহাজের নির্দোষ অতিক্রমণ এবং দ্বীপপুঞ্জের জলরাশির মধ্য দিয়ে নৌ-চলাচল ও তার উপর দিয়ে বিমান চলাচলের অধিকার। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে উন্নয়নশীল দেশগুলোর স্বার্থ, কেননা তাদের মতে সমুদ্র আইন হচ্ছে উন্নত বিশ্বের স্বার্থের রক্ষাকবচ। তাছাড়া ১৯৫৮ সালের কনভেনশনে মহীসোপান সংক্রান্ত বিধান চূড়ান্ত ছিল না– কেননা উন্নত বিশ্ব কর্তৃক সমুদ্র তলদেশের সম্পদ নির্বিচারে আহরণ বন্ধ করাও একটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি। ষাট এবং সত্তর দশকে– আফ্রিকার অনেক রাষ্ট্র তাদের সমুদ্র সীমানা নিজে নিজেই বর্ধিত করতে থাকে।

অমীমাংসিত বিষয়সমূহ মীমাংসা ও সমুদ্র সংক্রান্ত আইন ব্যাপকতর ও সময়োপযোগী করণকল্পে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ 'সমুদ্র আইন সংক্রান্ত তৃতীয় জাতিসংঘ সম্মেলন' (Third United Nations Conference on the Law of the Sea) আহ্বান করার সিদ্ধান্ত নেয়।

১৯৭৪ সালে ভেনিজুয়েলার কারাকাসে এই সম্মেলনের ১ম অধিবেশন এবং ১৯৭৫ সালে জেনেভায় (২৬ মার্চ হতে ১০মে) দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে সমুদ্র আইন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ব্যাপক আলোচনা, যুক্তি উপস্থাপিত হয় যদিও সেখানে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নি। কিন্তু ১৯৭৫ সালে জেনেভা অধিবেশনে একটি বড় ধরনের চুক্তি সম্পাদনে আলোচনার ভিত্তি হিসেবে নানান জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে 'একক আলোচনামূলক খসড়া' (Single Negotiating Text) প্রস্তুত হয়। এই খসড়ায় অন্তর্ভুক্ত প্রস্তাবগুলির মধ্যে ছিল :

- আঞ্চলিক সমুদ্রসীমা ১২ নটিক্যাল মাইল নির্ধারণ;
- আন্তর্জাতিক নৌপথ হিসেবে ব্যবহৃত প্রণালীসমূহে সর্বপ্রকার জাহাজ ও বিমানের অবারিত অতিক্রমণের অধিকার;
- ২০০ নটিক্যাল মাইল সমুদ্র পর্যন্ত 'অর্থনৈতিক অঞ্চল, (Economic Zone) গঠন, যেখানে প্রাণী ও প্রাণহীন অন্যান্য সম্পদ অনুসন্ধান, ব্যবহার, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার সার্বভৌম ক্ষমতা উপকূলীয় রাষ্ট্রের;
- সমুদ্র বিষয়ক কনভেনশনের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ সংক্রান্ত বিরোধসমূহের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তি।

দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে সমুদ্রসীমা ক্রমে ক্রমে বর্ধিত হচ্ছে। তবে এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হচ্ছে কনভেনশন বিরোধী কোন কাজ কোন রাষ্ট্র করতে পারবে না। কিন্তু যারা ১৯৫৮ সালের কনভেনশন অনুমোদন করে নি তাদের না মেনে নেওয়ার বিষয়টি যুক্তিযুক্ত কেননা আন্তর্জাতিক আইন কারো উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া যায় না। এ প্রসঙ্গে ১৯৭৫ সালের যুক্তরাজ্য ও জার্মানী বনাম আইসল্যান্ডের মধ্যকার মামলাটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার ঝড় তুলে। এ মামলার মাধ্যমে বিশ্ব সম্প্রদায়ের কাছে **অগ্রাধিকারমূলক অধিকার** এর ধারণা সূচিত হয় এবং যা আন্তর্জাতিক আদালত কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ করে।

প্রত্যেকটি সম্মেলনেই সমুদ্র সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তিতে অন্যতম দ্বন্দ্ব ছিল উন্নয়নশীল ও উন্নত রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট সংঘাত। সমুদ্র বিষয়ক তৃতীয় জাতিসংঘ সম্মেলনের শেষ অধিবেশন বসে ১৯৮২ সালে ৬ ডিসেম্বর জ্যামাইকার মন্টিগোবে-তে, তবে ১০ ডিসেম্বর সমুদ্র আইন বিষয়ক ব্যাপক ও চূড়ান্ত কনভেনশন গৃহীত হয় যাতে ৩২০ টি অনুচ্ছেদ রাখা হয়। এই সম্মেলনে ১৫০টিরও বেশি দেশ অংশগ্রহণ করে এবং কনভেনশনটি ১০ ডিসেম্বর তারিখেই কুক দ্বীপ (স্বায়ত্বশাসিত সহযোগী রাষ্ট্র), নামিবিয়া সহ ১১৯টি দেশ স্বাক্ষর করে এবং ফিজি ঐ দিনই একটি অনুসমর্থন পত্র জমা দেয়। অর্থাৎ বর্তমানে ১৯৮২ সালের সমুদ্র আইন সংক্রান্ত জাতিসংঘ কনভেনশনে ১৯৫৮ সালের ৪টি জেনেভা কনভেনশনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থান পেয়েছে, তবে উল্লেখ্য যে, কিছু বিষয়ে মত ভিন্নতার কারণে যুক্তরাষ্ট্রসহ কতিপয় রাষ্ট্র ১৯৮২ সালের কনভেনশনটি আজও স্বাক্ষর করে

নি। তবে প্রায় ১০ বছর লেগেছে ১৯৮২ সালের কনভেনশনটির কার্যকারীতা অর্জনে। তাহলে কি আমরা বলব ১৯৫৮ সালের কনভেনশনটি গুরুত্ব হারিয়েছে? অবশ্যই তা নয়। এখনো অনেক রাষ্ট্র ১৯৮২ সালের কনভেনশন স্বাক্ষর করে নি তবে তারা ১৯৫৮ সালে কনভেনশনের স্বাক্ষরকারী, কাজেই তাদের জন্য ঐ কনভেনশনটির গুরুত্ব আগেও যেমন ছিল এখনও তেমনি পরিলক্ষিত হচ্ছে।

সমুদ্র আইন

১৯৫৮ ও ১৯৮২ সালের কনভেনশন অনুযায়ী সামুদ্রিক অঞ্চলগুলোর বিভিন্ন অংশ নিম্নে ডায়াগ্রাম (Diagram) আকারে দেয়া হল :
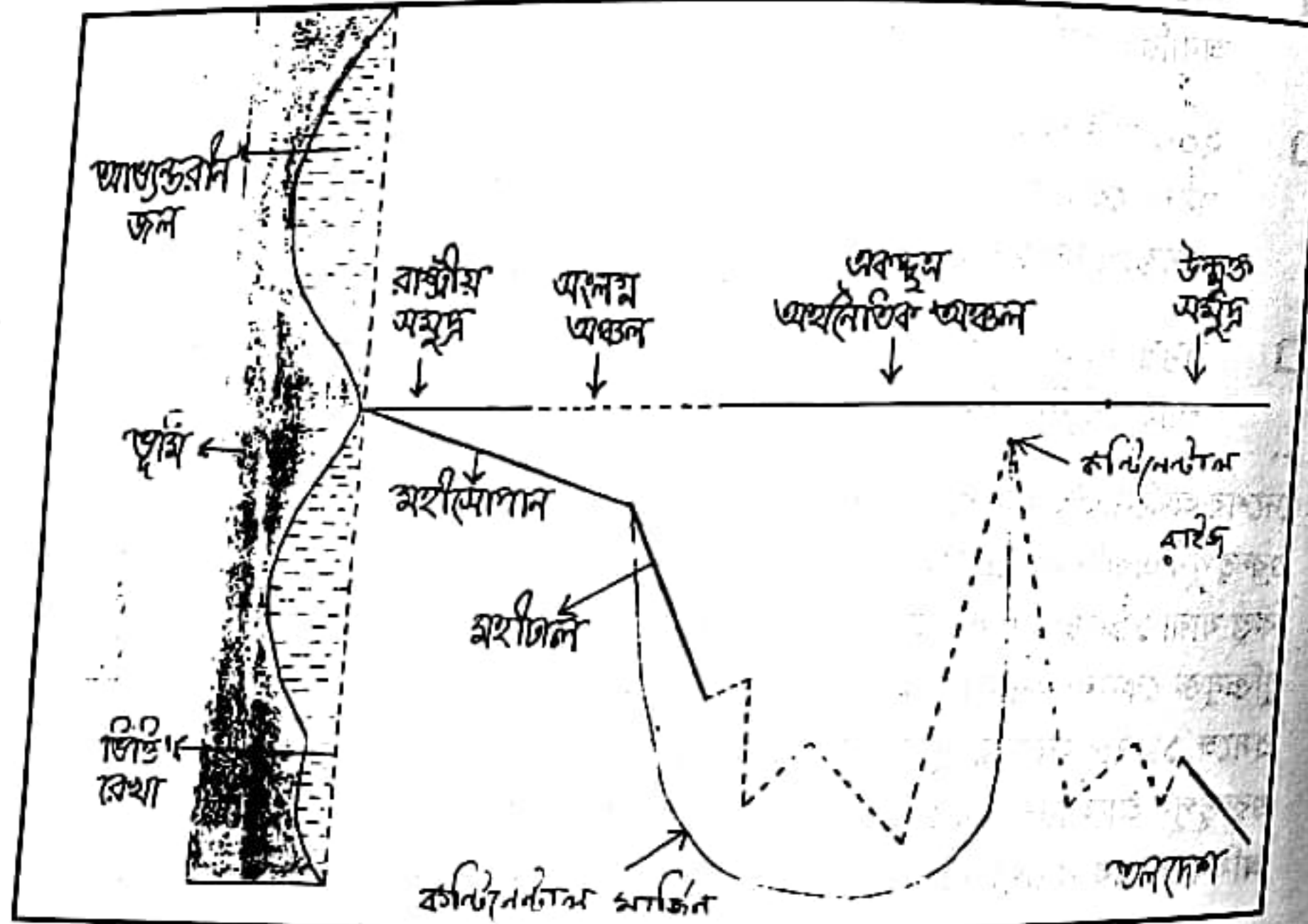
আন্তর্জাতিক আইনের বিকাশের ধারাবাহিকতায় সমুদ্রে উপকূলীয় ও অ-উপকূলবর্তী রাষ্ট্রের এখতিয়ারগত ও সার্বজনীন অধিকার ভোগের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে। তাই সমুদ্রকে আন্তর্জাতিকভাবে কয়েকটি চিহ্নিত সীমানায় ভাগ করা হয়। যেমন–

১. সমুদ্র তটরেখা (Base Line);
২. রাষ্ট্রীয় জলসীমা (Internal/Inland waters);
৩. আঞ্চলিক বা উপকূলবর্তী সমুদ্র অঞ্চল (Territorial Sea);
৪. নিকটস্থ বা সংলগ্ন অঞ্চল (Contiguous Zone);
৫. একচেটিয়া অর্থনৈতিক অঞ্চল (Exclusive Economic Zone);

৬. মুক্ত সাগর (High Sea);
৭. মহীসোপান (Continental Shelf).

১. সমুদ্র তটরেখা

উপকূলীয় যে রেখা হতে সমুদ্রের দিকে একটি রাষ্ট্রের সমুদ্র অঞ্চল মাপা হয় তাই ভিত্তি রেখা বা তটরেখা (Base line or low water line)।

উপকূল রেখা যেখানে গভীর খাতযুক্ত কাটা কাটা অথবা সন্নিকটে দ্বীপমালা থাকে তাহলে সমুদ্র সীমা পরিমাপে উপকূলীয় উপযুক্ত বিন্দুসমূহ সংযোগের মাধ্যমে একাধিক সরল রেখা এঁকে ভিত্তি রেখা নির্ধারণ করা হয়।

সাধারণত ভাটার সময় উপকূলের নিম্নতম জলরেখা (Low water mark) কে ভিত্তি রেখা ধরা হয়। তবে সরল রেখা অঙ্কনের মাধ্যমে ভিত্তি রেখা নির্ধারণে সংশ্লিষ্ট এলাকার বিশেষ অর্থনৈতিক স্বার্থ বিবেচনায় নিতে হবে।

কোন রাষ্ট্র সরল রেখা অঙ্কনের মাধ্যমে এমন ভিত্তি রেখা নির্ধারণ করবে না যাতে অন্য কোন রাষ্ট্রের আঞ্চলিক সমুদ্র উন্মুক্ত সমুদ্র থেকে পৃথক হয়ে যায়। উপকূলীয় রাষ্ট্র অবশ্যই ভিত্তিরেখা বলে চিহ্নিত সরল রেখাগুলো রাষ্ট্রের মানচিত্রে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত ও যথাযথভাবে প্রচার করবে।

তটরেখা নির্ধারণে ১৯৫৮ সালের কনভেনশনের ১২ অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে– যেখানে দু'টো রাষ্ট্রের উপকূল পরস্পরের বিপরীত অথবা সংলগ্ন সেক্ষেত্রে এই সংক্রান্ত ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে কোন বিপরীতধর্মী সন্ধি বা চুক্তি না থাকলে রাষ্ট্রদ্বয়ের কোনটিরই আঞ্চলিক সমুদ্রসীমা উক্ত সমুদ্রের 'মধ্যরেখা' অতিক্রম করবে না। পরস্পর বিপরীত অথবা সংলগ্ন দু'টি রাষ্ট্রের আঞ্চলিক সমুদ্রসীমা নির্দেশকারী রেখা উপকূলীয় রাষ্ট্র দু'টি দ্বারা সরকারিভাবে স্বীকৃত বৃহদাকার মানচিত্রে চিহ্নিত করতে হবে।

তবে যেখানে কোন নদী সমুদ্রে পতিত হয় সেখানে নদীর উভয় তীরের ভাটার সময়কালীন নিম্ন জল রেখায় অবস্থিত বিন্দুসমূহের মধ্যে সংযোগকারী মোহনা বরাবর একটি সরল রেখাকে ভিত্তিরেখা ধরতে হয়।

তবে সরল ভিত্তিরেখা অঞ্চলের আন্তর্জাতিক স্বীকৃত নীতিটি প্রথম ১৯৫১ সালে মীমাংসিত ইঙ্গ-নরওয়ে মৎস্য শিকার মামলার রায় থেকে গ্রহণ করা হয়। মামলাটি নিম্নরূপ :

মামলা : Anglo-Norwegian Fisheries Jurisdiction Case; ইংল্যান্ড–নরওয়ে মৎস্য শিকার মামলা; (ICJ, 1951)

১৯৩৫ সালে নরওয়ে সমুদ্রে মৎস্য চারণ অঞ্চল নির্ধারণে এক সরকারি আদেশ জারি করে। নরওয়ে মূল ভূ-খণ্ড থেকে যথেষ্ট দূরে অবস্থিত তার দ্বীপসমূহ ও পর্বত রাজির মধ্য দিয়ে ৪৮

বিন্দু হতে প্রসারিত রেখাসমূহ দ্বারা এই মৎস্য এলাকা নির্ধারণ করে, যাতে সমুদ্রের বিশাল এলাকা শুধু নরওয়ের জন্য মৎস্য আহরণ ক্ষেত্রে পরিণত হয়। তখন যুক্তরাজ্য, নরওয়ে উল্লিখিত আদেশনামার বৈধতা অস্বীকার করে এবং এটিকে আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী বলে দাবি করে।

আদালতের রায় : আন্তর্জাতিক আদালত ১৯৫১ সালের মামলার রায়ে ঘোষণা করেন নরওয়ের আদেশ নামা বলে ঘোষিত মৎস্য চারণ এলাকা আন্তর্জাতিক আইনের কোন বিধান বা নীতির পরিপন্থী নয়।

এই মামলার পর সারা বিশ্বে অনেক রাষ্ট্রই নরওয়ের ভিত্তি রেখা নির্ধারণের নীতিটি গ্রহণ করে, যা সমুদ্র আইন বিকাশে এবং সমুদ্রসীমা নির্ধারণে সত্যিই এক মাইলফলক হিসেবে ১৯৫৮ সালের জেনেভা কনভেনশনে স্থান পায়। তবে কনভেনশনে শর্ত রাখা হয় যে, সরল ভিত্তিরেখা অঙ্কন পদ্ধতি যেখানে প্রয়োগ হবে সেখানে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অর্থনৈতিক স্বার্থও বিবেচনায় আনতে হবে।

সমুদ্র তটরেখা নির্ধারণে বাংলাদেশ : বাংলাদেশেরও অভ্যন্তরীণ সমুদ্রসীমা নির্ধারণে সুচিহ্নিত তটরেখা (Base line) আছে। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে সমুদ্র স্রোতের গতি পরিবর্তন হেতু বা পলল জমাটবদ্ধ হওয়ার কারণে সমুদ্র ভিত্তিরেখা বিভিন্ন সময়ে ভিন্নরূপ হয়ে থাকে। তবে বাংলাদেশ উপকূলীয় সমুদ্রের ১০ ফ্যাদম (৬০ ফুট) গভীরতা পর্যন্ত তটরেখা অভ্যন্তরীণ হিসেবে গ্রহণ করে। সমুদ্র তটরেখা নির্ধারণে প্রথম ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে সরকারিভাবে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়।

২. অভ্যন্তরীণ জলসীমা (Inland / Internal Waters)

আঞ্চলিক সমুদ্রের ভিত্তিরেখা হতে স্থলভাগ পর্যন্ত যে জলরাশি তা উপকূলবর্তী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ জলরাশি (Internal waters)। অনুচ্ছেদ ৮(১) ১৯৮২ সালের কনভেনশন এবং অনুচ্ছেদ-৫, ১৯৫৮ সালের রাষ্ট্রীয় সমুদ্র ও সংলগ্ন অঞ্চল বিষয়ক কনভেনশন।

অভ্যন্তরীণ জলসীমায় উপকূলীয় রাষ্ট্রের আইনগত অবস্থান (Legal Status) : এই জলরাশিতে উপকূলীয় রাষ্ট্রের একচ্ছত্র এবং পরিপূর্ণ সার্বভৌমত্ব বজায় থাকবে। তবে ১৯৮২ সালের কনভেনশনের ৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সরল ভিত্তিরেখা প্রতিষ্ঠার কারণে, পূর্বে জলরাশির অন্তর্ভুক্ত ছিল না এমন এলাকা অভ্যন্তরীণ জলরাশির অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে, সেক্ষেত্রে এই জলসীমায় ১৯৮২ সালের কনভেনশন অনুযায়ী নির্দোষ অতিক্রমণ (Innocent passage) -এর অধিকার থাকবে।

অভ্যন্তরীণ জলরাশিতে দেওয়ানী ও ফৌজদারি আইনগত এখতিয়ার (Civil and Criminal Jurisdiction) : উপকূলীয় রাষ্ট্রের সার্বভৌম নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষমতা রয়েছে তার অভ্যন্তরীণ জলরাশির উপর। এই অঞ্চলে দেওয়ানী ও ফৌজদারি এই দুই ধরনেরই

এখতিয়ার উপকূলীয় রাষ্ট্রের বর্তমান। তবে সাধারণত উপকূলীয় রাষ্ট্র তার দেওয়ানী এখতিয়ার প্রয়োগ করে না কিন্তু যদি পতাকাবাহী জাহাজের নাবিক (captain) উপকূলীয় রাষ্ট্রকে দেওয়ানী অন্যায়ের ক্ষেত্রেও অনুরোধ করে তাহলে উপকূলীয় রাষ্ট্র তার এখতিয়ার প্রয়োগ করে।

তবে ফৌজদারি বিষয়ে উপকূলীয় রাষ্ট্রের জলরাশিতে কোন রকম জটিলতা দেখা দিলে এবং তা যদি উপকূলের শান্তি, শৃঙ্খলা এবং নিরাপত্তার লঙ্ঘন হয়– তবে অবশ্যই উপকূলীয় রাষ্ট্র তার ফৌজদারি এখতিয়ার প্রয়োগ করবে। এ প্রসঙ্গে একটি আন্তর্জাতিক মামলা হলো **Wildenhus Case (Belgium Vs. USA, 1887)**, যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আরও একটি মামলা হলো :

মামলা : Rex Vs. Anderson; রেক্স বনাম এন্ডারসন মামলা; (1868)

ঘটনা : এন্ডারসন একজন মার্কিন নাগরিক ব্রিটিশ জাহাজে অবস্থানরত অন্য এক বিদেশী নাগরিককে হত্যা করে এবং যখন হত্যাটি সংঘটিত হয় জাহাজটি ছিল তখন ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ জলসীমায়।

ব্রিটিশ আদালতে মামলা দায়ের হলে এন্ডারসন আপত্তি উত্থাপন করেন এই বলে যে, ঘটনাটি ঘটেছে ফ্রান্সের জলসীমায়-ব্রিটেনের কোন এখতিয়ার নেই-এর বিচার করার।

বিচার্য বিষয় : মামলাটির বিচার্য বিষয় সত্যি এন্ডারসনকে বিচার করার এখতিয়ার ব্রিটেনের আছে কি না।

রায় : এই মামলার রায়ে আপীল আদালত বলেন যে, তিনটি দেশই এন্ডারসনের বিচার করার এখতিয়ার রাখে, ব্রিটেন পারবে তার জাহাজকে রক্ষা করার জন্য।

যুক্তি : ব্রিটেনের এখতিয়ার আছে এন্ডারসনের বিচার করার কেননা ঘটনাটি ঘটেছে ব্রিটিশ জাহাজে অর্থাৎ পতাকাবাহী দেশ ব্রিটেন।

যুক্তরাষ্ট্রের এখতিয়ার রয়েছে ব্যক্তিগত এখতিয়ার (Personal Jurisdiction)। আর ফ্রান্সও বিচার করতে পারবে কেননা ফ্রান্সের রাষ্ট্রীয় এখতিয়ার (Territorial Jurisdiction) রয়েছে যা তার উপকূলের শান্তি শৃঙ্খলার পরিপন্থী। এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করা যেতে পারে নিম্নোক্ত মামলাটির :

মামলা : State Vs. Yannopulous; রাষ্ট্র বনাম ইউনোপোলাস; (Italy Vs. Greece, 1974)

ঘটনা : ইউনোপোলাস একজন গ্রীক নাগরিক সাইপ্রাসের পতাকাবাহী জাহাজে নাবিক হিসেবে অবস্থান করেন। জাহাজটি যখন ইতালির নেপলস্ বন্দরে নোঙর করে তখন তার

কাছে ৫ কেজি মারিজুয়ানা পাওয়া যায়, যা ছিল ইতালির দেশীয় আইনে গুরুতর অপরাধ। সে ইতালির পুলিশ কর্তৃক ধৃত হয় এবং আদালতে সোপর্দ হয়।

বিচার্য বিষয় : (১) ইউনোপোলাসের বিচার করার এখতিয়ার ইতালির আছে কি না; (২). এই ধরনের ড্রাগ ধারণ করা উপকূলীয় রাষ্ট্রের শান্তি শৃঙ্খলা এবং নিরাপত্তার জন্য হুমকি স্বরূপ কি না।

রায় : ইতালির আদালত ইউনোপোলাসের বিচার করতে অস্বীকার করে এবং তাকে বেকসুর খালাস দেয়।

যুক্তি : আদালত অভিমত দেয় যে, তার কাছে মাদকদ্রব্য পাওয়া গেলেই এটা বলা যাবে না যে, সে এটা ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বা ইতালির শান্তি শৃঙ্খলা ভঙ্গের উদ্দেশ্যেই নিয়ে আসছিল। সুতরাং এটি ইতালির প্রতি হুমকি স্বরূপ নয়।

তবে এক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল যে, উপকূলীয় রাষ্ট্রই নির্ধারণ করবে যে কোন কোন ধরনের কাজ তার উপকূলের শান্তি শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার জন্য হুমকি স্বরূপ।

৩. আঞ্চলিক বা উপকূলবর্তী সমুদ্র অঞ্চল (Territorial Sea)

রাষ্ট্রীয় অভ্যন্তরীণ জলরাশির পর হতে অর্থাৎ ভিত্তি রেখা হতে সমুদ্রের দিকে আঞ্চলিক বা উপকূলীয় সমুদ্র অঞ্চল। তবে এর দৈর্ঘ্য (Breadth) হচ্ছে সমুদ্র তটরেখা (Base line) হতে সমুদ্রের দিকে ১২ নটিক্যাল মাইল, অনু (৩) ১৯৮২ কনভেনশন।

উপকূলীয় রাষ্ট্রের আইনগত অবস্থান : ১৯৫৮ সালের কনভেনশনের অনুচ্ছেদ ১ এবং ২ এবং ১৯৮২ সালের কনভেনশনের অনুচ্ছেদ ২ অনুযায়ী–

১. কোনো উপকূলবর্তী রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব উহার স্থলভাগ ও অভ্যন্তরীণ জলরাশির বাহিরে এবং দ্বীপপুঞ্জ রাষ্ট্রের (archipelagic state) ক্ষেত্রে দ্বীপপুঞ্জ জলরাশির বাহিরে, আঞ্চলিক সমুদ্র (Territorial Sea) নামে অভিহিত এক সংলগ্ন সমুদ্র বেষ্টনী পর্যন্ত বিস্তৃত।

২. এই সার্বভৌমত্ব আঞ্চলিক সমুদ্রের উপরস্থ বায়ুমণ্ডল (air space) ও আঞ্চলিক সমুদ্রের তলদেশ ও অন্তর্ভূমির (subsoil) উপরও প্রসারিত।

৩. এই কনভেনশন ও আন্তর্জাতিক আইনের অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে আঞ্চলিক সমুদ্রের উপর সার্বভৌমত্ব প্রযুক্ত হবে।

অর্থাৎ আঞ্চলিক সমুদ্রে (Territorial Sea) উপকূলীয় রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব বিদ্যমান থাকবে। তবে একটি ব্যতিক্রমী অধিকার অন্যান্য রাষ্ট্রের থাকবে যা হল নির্দোষ অতিক্রমণের অধিকার (Right of innocent passage)।

নির্দোষ অতিক্রমণ (Innocent passage) : নির্দিষ্টপথে নির্দোষ অতিক্রমণ হল আঞ্চলিক সমুদ্রে (Territorial Sea) উপকূলীয় রাষ্ট্র ব্যতীত অন্যান্য রাষ্ট্রের জাহাজের চলাচলের পথ যা ঐ সমস্ত রাষ্ট্রের একটি অধিকার (অনু ১৭-১৯৮২ কনভেনশন)। এই বিশেষ সুবিধাটিই অভ্যন্তরীণ জলরাশির সাথে আঞ্চলিক সমুদ্রসীমার উপকূলীয় রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বকে পৃথক করেছে।

অনুচ্ছেদ-১৮, ১৯৮২ কনভেনশন

১. অতিক্রমণ (Passage) বলতে নিম্নের উদ্দেশ্যে আঞ্চলিক সমুদ্রের মধ্য দিয়ে নৌ চলনকে (Navigation) বুঝায় :

  ক. অভ্যন্তরীণ জলরাশিতে প্রবেশ না করে অথবা উহার বাইরে নোঙর স্থান (road stead) বা বন্দরের সুযোগ সুবিধা গ্রহণ না করে শুধু আঞ্চলিক সমুদ্র পাড়ি দেয়া; অথবা

  খ. অভ্যন্তরীণ জলরাশি কিংবা নোঙর স্থান বা বন্দর হতে বা অভিমুখে যাত্রা।

২. অতিক্রমণ অবশ্যই দ্রুত (Expeditious) ও ধারাবাহিক হবে। জাহাজ থামানো এবং নোঙর করা অতিক্রমণের বহির্ভূত; কিন্তু সাধারণ নৌ চলন প্রসঙ্গে অথবা গুরুতর বিপর্যয় (force majeure) কিংবা দুর্দৈবের কারণে অথবা বিপন্ন বা দুর্দশাগ্রস্ত কোন ব্যক্তি, জাহাজ বা বিমানকে সাহায্য করার জন্য যতটুকু প্রয়োজন কেবল ততটুকুই থামানো বা নোঙর করা যেতে পারে।

অনু : ১৯ (১) অনুযায়ী যতক্ষণ অতিক্রমণ উপকূলবর্তী রাষ্ট্রের শান্তি শৃঙ্খলা অথবা নিরাপত্তার পক্ষে ক্ষতিকর হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত উহা নির্দোষ বলে গণ্য হবে, তবে অতিক্রমণ এই কনভেনশন ও আন্তর্জাতিক আইনের অন্যান্য নিয়মাবলী অনুসারে করতে হবে।

তবে কোন বিদেশী জাহাজ আঞ্চলিক সমুদ্রে যদি এমন কোন কাজ করে যা উপকূলীয় রাষ্ট্রের শান্তি শৃঙ্খলা বা নিরাপত্তার জন্য ক্ষতিকর তবে অতিক্রমণটি আর নির্দোষ থাকবে না। (১৯৮২ কনেভনশনের অনুচ্ছেদ ১৯ (২) (ক–ঠ)

উপকূলীয় রাষ্ট্রের কর্তব্য (Duty) : উপকূলবর্তী রাষ্ট্র উহার আঞ্চলিক সমুদ্রে নির্দোষ অতিক্রমণ সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করবে। [অনুচ্ছেদ-২১(১–৪)] অর্থাৎ নির্দোষ অতিক্রমণের পথ নিরাপদ রাখার দায়িত্ব উপকূলবর্তী রাষ্ট্রের [অনু : ২২ (১)]

উপকূলবর্তী রাষ্ট্র উহার আঞ্চলিক সমুদ্রে, নির্দোষ নয় এমন অতিক্রমণ বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে [অনু ২৫ (১)]।

উপকূলবর্তী রাষ্ট্র বিদেশী জাহাজসমূহের মধ্যে আনুষ্ঠানিক বা বাস্তব কোন ভেদাভেদ না করে উহার আঞ্চলিক সমুদ্রের কোন নির্দিষ্ট এলাকায় বিদেশী জাহাজের নির্দোষ অতিক্রমণ সাময়িকভাবে স্থগিত করতে পারবে যদি সেই রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষা বা অস্ত্র মহড়ার জন্য উহা অত্যাবশ্যক হয়– তবে অনুরূপ স্থগিতকরণ সম্পর্কে যথাযথ প্রচারণার পরই কেবল উহা কার্যকর হবে [অনু: ২৫(৩)]।

নির্দোষ অতিক্রমণে জাহাজের উপর উপকূলীয় রাষ্ট্রের ফৌজদারি এখতিয়ার (Criminal Jurisdiction)

অনু ২৭ (১) অনুযায়ী আঞ্চলিক সমুদ্র দিয়ে অতিক্রমণের সময় কোন বিদেশী জাহাজে সংঘটিত কোন অপরাধ প্রসঙ্গে কোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার বা কোনো অনুসন্ধান পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে উপকূলবর্তী রাষ্ট্র সেই বিদেশী জাহাজের অভ্যন্তরে উহার ফৌজদারি এখতিয়ার প্রয়োগ করবে না। তবে নিম্নের বিষয়ে এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়–

ক. যদি অপরাধের ফলাফল উপকূলবর্তী রাষ্ট্রে প্রসারিত হয়;

খ. যদি তা উপকূলবর্তী রাষ্ট্রের শান্তি শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে;

গ. যদি জাহাজের অধিনায়ক (master) অথবা জাহাজটির পতাকা রাষ্ট্র (flag state) এর বাণিজ্য দূত (consul) স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাহায্য চায়;

ঘ. যদি মাদক দ্রব্য (Narcotic drugs) বা মানসিক অবস্থা প্রভাবিত করে এমন (psychotropic) পদার্থের পাচার রোধে উহার প্রযোজন দেখা দেয়।

তবে অনু : ২৭ (৪) অনুযায়ী– কাউকে গ্রেফতার করা হবে বা না হবে এবং কিভাবে তা হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় স্থানীয় কর্তৃপক্ষ নৌচালনের স্বার্থের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান দেখাবে।

দেওয়ানী এখতিয়ার (Civil Jurisdiction)

১. অনু : ২৮ অনুযায়ী– কোন বিদেশী জাহাজে কোন ব্যক্তি সম্পর্কে দেওয়ানী এখতিয়ার প্রয়োগের উদ্দেশ্যে উপকূলীয় রাষ্ট্র তার আঞ্চলিক সমুদ্র অতিক্রমণ করছে এমন কোনো জাহাজকে থামাতে বা উহার গতিপথ পরিবর্তন করতে পারে না।

২. দেওয়ানী কার্যধারা গ্রহণের উদ্দেশ্যে বিদেশী জাহাজের বিরুদ্ধে নির্দেশনামা (execution) জারি কিংবা কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারে না। তবে যদি জাহাজটি উপকূলীয় রাষ্ট্রের জলরাশি দিয়ে যাত্রাকালে বা যাত্রার কারণে সংশ্লিষ্ট জাহাজটি নিজে কোনো দায়-দায়িত্ব নিলে বা কোনো দেনায় জড়ালে কেবল সেক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটতে পারে।

৩. কোনো বিদেশী জাহাজ অভ্যন্তরীণ জলরাশি পরিত্যাগ করার পর আঞ্চলিক সমুদ্রে অবস্থান বা চলাকালে কোনো দেওয়ানী কার্যধারা গ্রহণের উদ্দেশ্যে, উপকূলীয় রাষ্ট্রের আইনানুযায়ী, সেই জাহাজের বিরুদ্ধে নির্দেশনামা জারি বা উহাকে গ্রেপ্তার করার অধিকার (২) পরিচ্ছেদ দ্বারা বাধাগ্রস্ত হবে না।

যুদ্ধ জাহাজ ও অন্যান্য অবাণিজ্যিক জাহাজের ক্ষেত্রে : অনু ৩০ অনুযায়ী– যদি কোন যুদ্ধ জাহাজ উপকূলবর্তী রাষ্ট্রের আঞ্চলিক সমুদ্রসীমা অতিক্রমণ সংক্রান্ত বিধি-বিধান লঙ্ঘন করে এবং তা পালনের অনুরোধ অগ্রাহ্য করে তবে উপকূলবর্তী রাষ্ট্র ঐ যুদ্ধ জাহাজকে তৎক্ষণাৎ অঞ্চল পরিত্যাগ করার নির্দেশ দিবে এবং তা মানতে সেটি বাধ্য।

অনু : ৩১ অনুযায়ী– পতাকা রাষ্ট্র (flag state) উহার কোনো যুদ্ধ জাহাজ বা অবাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত সরকারি জাহাজ কর্তৃক উপকূলবর্তী রাষ্ট্রের আঞ্চলিক সমুদ্র অতিক্রমণ-সংক্রান্ত আইন কানুন কিংবা এই কনভেনশনের বিধি-বিধান বা আন্তর্জাতিক আইনের অন্যান্য নিয়ম অমান্য করার ফলে সংঘটিত ক্ষয়ক্ষতির আন্তর্জাতিক দায়দায়িত্ব বহন করবে।

তবে অনু ৩০ ও ৩১ এ যেরকম ব্যতিক্রম রয়েছে সে রকম ব্যতিক্রম ছাড়া সব সময়ই যুদ্ধ জাহাজ ও অবাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত অন্যান্য সরকারি জাহাজ, দেওয়ানী ও ফৌজদারি এখতিয়ার হতে সর্বদাই দায়মুক্ত (Immune)।

নির্দোষ অতিক্রমণের (Innocent passage) পথ নির্দোষ রাখার দায়িত্ব হচ্ছে উপকূলীয় রাষ্ট্রের। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য একটি মামলা হচ্ছে–**Corfu Channel Case, (UK Vs. Albenia, ICJ, 1949);** যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

৪. সংলগ্ন অঞ্চল (Contiguous Zone)

১৯৫৮ সালের আঞ্চলিক সমুদ্র ও সংলগ্ন অঞ্চল বিষয়ক কনভেনশন ১৯৬৪ সালের ১০ সেপ্টেম্বর কার্যকরী হয় যেখানে উপকূলীয় রাষ্ট্রের কিছু অধিকার প্রদান করা হয় কিন্তু এই অঞ্চলে সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নি। অনু: ২৪– ১৯৫৮ সালের সংলগ্ন অঞ্চল বিষয়ক কনভেনশন অনুযায়ী উপকূলীয় রাষ্ট্র এই অঞ্চলে তার শুল্ক, অভিবাসন, মৎস্য শিকার এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিধি লঙ্ঘনরোধে প্রয়োজনীয় নিয়ম করতে পারবে এবং এর ব্যত্যয় ঘটলে শাস্তির বিধান করতে পারবে।

১৯৮২ সালের সমুদ্র আইন বিষয়ক কনভেনশনের অনুচ্ছেদ ৩৩ (২) তে সংলগ্ন অঞ্চলের দৈর্ঘ্য বর্ণিত রয়েছে– যে ভিত্তিরেখা হতে আঞ্চলিক সমুদ্রের প্রশস্ততা পরিমাপ করা হয় সেই রেখা হতে সংলগ্ন এলাকা ২৪ নটিক্যাল মাইলের অধিক প্রসারিত হবে না।

সমুদ্র সংলগ্ন অঞ্চলে ১৯৮২ সালের কনভেনশনের অনু : ৩৩ (১) এ উপকূলীয় রাষ্ট্রের কতিপয় অধিকারকে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। অর্থাৎ উপকূলীয় রাষ্ট্র সংলগ্ন অঞ্চলে নিম্নের প্রয়োজনে তার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে–

ক. উপকূলবর্তী রাষ্ট্রের ভূ-খণ্ড কিংবা আঞ্চলিক সমুদ্রে উহার বহিঃশুল্ক, রাজস্ব, অভিবাসন অথবা স্বাস্থ্য রক্ষা সংক্রান্ত আইন-কানুন লজ্ঘনরোধ করা;

খ. উহার ভূ-খণ্ড অথবা আঞ্চলিক সমুদ্রের অভ্যন্তরে উপরোক্ত বিধি-বিধান লজ্ঘনের জন্য শাস্তি-বিধান করা।

উপকূলীয় রাষ্ট্রের প্রয়োজনে সংলগ্ন অঞ্চলের উৎপত্তি ঘটেছে যা একটি আধুনিক ধারণা। তবে প্রথম দিকে মৎস-শিকার সংক্রান্ত বিধি-বিধান প্রণয়নের জন্য এবং চোরা চালান বন্ধ করার উদ্দেশ্যেই সংলগ্ন অঞ্চলের উদ্ভব। প্রত্যেকটি রাষ্ট্রেরই স্বার্থ বিবেচনা করে সংলগ্ন অঞ্চলের উপর উপকূলীয় রাষ্ট্রের আধিপত্য সুনিশ্চিত করার লক্ষে এ অঞ্চলকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা :

ক. শুল্ক অঞ্চল (Custom Zone)

খ. মৎস্য শিকার অঞ্চল (Fishing Zone)

গ. স্বাস্থ্য সংক্রান্ত অঞ্চল (Sanitary Zone)

ঘ. অভিবাসন অঞ্চল (Immigration Zone)

উপরোক্ত বিষয়গুলোর বিরোধী যেকোন কাজকে উপকূলীয় রাষ্ট্র তার প্রতিরোধের ব্যবস্থা করতে পারবে এবং লজ্ঘনকারীকে শাস্তি দিতে পারবে। এই অঞ্চলে কোন ব্যক্তি অপরাধে লিপ্ত হওয়ার পর সংলগ্ন অঞ্চল থেকে যদি পলায়ন করে তার পরও উপকূলীয় রাষ্ট্র আইনগত এখতিয়ার প্রয়োগ করতে পারবে।

তবে ১৯৮২ সালের কনভেনশন অনুযায়ী উপরোক্ত চারটি বিভাগের মধ্যে মৎস্য শিকার অঞ্চলের পরিবর্তে বর্তমানে রাজস্ব অঞ্চল (Fiscal Zone) করা হয়েছে।

সংলগ্ন অঞ্চলে উপকূলীয় রাষ্ট্রের আইনগত এখতিয়ার (Jurisdiction) : উপকূলীয় রাষ্ট্র যদি দেখে যে কোন জাহাজ বা ব্যক্তি তার অধিকারগুলোর লজ্ঘন ঘটাচ্ছে বা এই অঞ্চলে অপরাধ করে সেখান থেকে পলায়ন করছে তবে তাকে ধরার এবং তার বিচার করার এখতিয়ার উপকূলীয় রাষ্ট্রের থাকবে। এ সংক্রান্ত একটি উল্লেখযোগ্য মামলা হল-

মামলা : Re Martinez Case; মার্টিনেজ মামলা; (1959)

ঘটনা : ইতালির সমুদ্র বিষয়ক আইনের (Maritime Code) ২ নং ধারানুযায়ী ভিত্তিরেখা থেকে ৬ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত শুল্ক অঞ্চল (Custom Zone) এবং পরবর্তী ৬ নটিক্যাল মাইল সতর্কীকরণ অঞ্চল (Vigilance Zone)। মার্টিনেজ ইতালির ভিত্তিরেখা থেকে ৯ নটিক্যাল মাইল দূরত্বে চোরাচালান কাজে (Smuggling) লিপ্ত হয়। ইতালিয়ান কর্তৃপক্ষ তাকে ধরার চেষ্টা করে এবং গোলাবর্ষণ করে কিন্তু মার্টিনেজ তখন ৫৪ নটিক্যাল মাইল গভীর সমুদ্রে পালিয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের হাতে ধৃত হয় এবং তার বিচার শুরু হয়। মার্টিনেজ যুক্তি দেখায় যে,

ক. সে ইতালির আঞ্চলিক সমুদ্রের বাইরে চোরাচালান করেছে; এবং

খ. ৫৪ নটিক্যাল মাইল গভীর সমুদ্র থেকে তাকে অন্যায়ভাবে ধরে আনা হয়েছে; সুতরাং ইতালির এখতিয়ার নেই তার বিচার করার।

বিচার্য বিষয় : আদৌ মার্টিনেজের বিচার ইতালি করতে পারে কি না।

রায় : আপীল আদালত সিদ্ধান্ত দেয় যে, মার্টিনেজের বিচার ইতালির আদালত করতে পারে।

যুক্তি :

১. ইতালির সতর্কীকরণ অঞ্চল করা হয়েছে উপকূলের আধিপত্য বজায় রাখার জন্য। এবং

২. চোরাচালান প্রতিরোধের জন্য।

সংলগ্ন অঞ্চলে উপকূলীয় রাষ্ট্রের এখতিয়ার যে কতোটা শক্তিশালী, এ মামলা তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথেই রাষ্ট্রের সমুদ্রের সম্পদের প্রতি গভীর প্রত্যাশায় বাস্তব রূপায়ন ঘটতে থাকে অর্থাৎ বিভিন্ন দেশ তার সমুদ্র সীমা আরো অনেক অনেক দূর গভীর পর্যন্ত নিজের তথা উপকূলীয় রাষ্ট্রের একান্ত একচেটিয়া করে পেতে চায়। ফলে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাষ্ট্র তার সমুদ্রসীমা বাড়িয়ে নিজেরাই নিজেদের আধিপত্য ঘোষণা করে। যেমন আইসল্যান্ড তার সমুদ্র জলসীমায় ৫০ নটিক্যাল মাইল চূড়ান্ত মৎস শিকার অঞ্চল (Exclusive Fishing Zone) ঘোষণা করে যাকে কেন্দ্র করে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ মামলা **Fisheries Jurisdiction Case (1974)**-এর উৎপত্তি হয়। এই মামলাটিই একচেটিয়া অর্থনৈতিক অঞ্চল (Exclusive Economic Zone) নামে নতুন একটি অঞ্চলের ভিত্তিরূপে প্রথম বিশ্ব সম্প্রদায়ের কাছে পরিগণিত হয়।

৫. একচেটিয়া অর্থনৈতিক অঞ্চল (Exclusive Economic Zone)

এই অঞ্চলটি বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ মামলা আলোচনা করা দরকার যার মধ্য দিয়ে একচেটিয়া অর্থনৈতিক অঞ্চলের ধারণা সুস্পষ্ট হয়।

মামলা : Fisheries Jurisdiction Case; মৎস্য শিকার মামলা; (U.S.A. & Germany Vs. Iceland, ICJ, 1974)

ঘটনা : আইসল্যান্ড তার সমুদ্র অঞ্চলে একচেটিয়া মৎস্য শিকার অঞ্চল ঘোষণা করে ৫০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত। পশ্চিম জার্মানী এবং যুক্তরাজ্য আপত্তি উথাপন করে কেননা তারা

ঐ অঞ্চলে মৎস্য শিকার করত। যখন তারা এ বিষয়টি নিয়ে আপত্তি উথাপন করে তখন বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য আন্তর্জাতিক আদালতে যায়।

রায় : আন্তর্জাতিক আদালত রায় দেন যে, কোন উপকূলীয় রাষ্ট্রেই তার মৎস্য শিকার অঞ্চল ২৪ নটিক্যাল মাইলের অধিক হবে না কিন্তু এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, আইসল্যান্ডের ৯০% অর্থনীতি মৎস্য শিকারের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং আদালত আইসল্যান্ডকে বিশেষ অধিকার (Preferential rights) দিয়ে আইসল্যান্ডের পক্ষেই রায় দেন।

যখন আন্তর্জাতিক আদালতে মামলাটির শুনানি চলে তখন সংলগ্ন সমুদ্র অঞ্চলের উপর চূড়ান্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলের (Exclusive Economic Zone) ঘোষণার আলোচনা আন্তর্জাতিক সমুদ্রসীমা নির্ধারণের অন্যতম শীর্ষবিন্দুতে চলে আসে। যার ফলে অনেক রাষ্ট্রই তাদের মৎস্য অঞ্চল গভীর সমুদ্রের দিকে ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত দাবি করে। সর্বশেষে এই বিষয়টি ১৯৮২ সালের সমুদ্র আইন বিষয়ক কনভেনশনে বিধিবদ্ধ আইনে রূপ নেয় যে ভিত্তিরেখা থেকে একচেটিয়া অর্থনৈতিক অঞ্চল হবে ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত যা ছিল ক্রমে ক্রমে সংযোগ নীতিরই (creeping annexation rule) একটি প্রতিফল।

একচেটিয়া অর্থনৈতিক অঞ্চল : একচেটিয়া অর্থনৈতিক অঞ্চল বলতে আঞ্চলিক সমুদ্রের বাইরে অথচ সংলগ্ন এমন এক এলাকাকে বুঝায় যেখানে, প্রতিষ্ঠিত সুনির্দিষ্ট বিধি ব্যবস্থা সাপেক্ষে ১৯৮২ সালের কনভেনশনের সংশ্লিষ্ট বিধানসমূহের দ্বারা উপকূলবর্তী ও অন্যান্য রাষ্ট্রের অধিকার, এখতিয়ার ও স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত হয়। (অনু : ৫৫– ১৯৮২ কনভেনশন)।

দৈর্ঘ্য (Breadth) : এই অঞ্চল অবশ্যই ভিত্তিরেখা হতে ২০০ নটিক্যাল মাইলের অধিক হবে না। অর্থাৎ আঞ্চলিক সমুদ্র ব্যতীত ইহার দৈর্ঘ্য ১৮৮ নটিক্যাল মাইল (অনু : ৫৭–১৯৮২ কনভেনশন)।

উপকূলীয় রাষ্ট্রের অধিকার (Rights of the Coastal State) : একচেটিয়া অর্থনৈতিক অঞ্চলে উপকূলবর্তী রাষ্ট্রের সার্বভৌম অধিকার থাকবে–[অনু : ৫৬(১)– ১৯৮২ কনভেনশন]

ক. সমুদ্রতলের উপরস্থ জলরাশি, সমুদ্রতল (Seabed) ও উহার অন্তর্ভূমিতে অবস্থিত প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের অনুসন্ধান, সদ্ব্যবহার, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে এবং জল, স্রোত ও বাতাস হতে শক্তি উৎপাদনসহ ঐ অঞ্চলে অর্থনৈতিক অনুসন্ধান ও সদ্ব্যবহার সম্পর্কিত অন্যান্য কার্যকলাপের ক্ষেত্রে;

খ. এখতিয়ার প্রয়োগ : উপকূলীয় রাষ্ট্র ১৯৮২ কনভেনশন অনুযায়ী নিম্নের বিষয়ে তার এখতিয়ার প্রয়োগ করবে–

১. কৃত্রিম দ্বীপ, স্থাপনা (Installation) ও কাঠামো নির্মাণ ও ব্যবহার।

২. সামুদ্রিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা (Scientific Research)

৩. সামুদ্রিক পরিবেশ রক্ষণ ও সংরক্ষণ;

গ. এই কনভেনশনের বিধান অনুসারে অন্যান্য অধিকার ভোগ ও কর্তব্য পালন করবে।

দায়িত্ব (Duty) : অনু: ৫৬ (২) অনুযায়ী উপকূলবর্তী রাষ্ট্র এই কনভেনশনের অধীনে একচেটিয়া অর্থনৈতিক অঞ্চলে উহার অধিকার প্রয়োগ ও কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে, অন্যান্য রাষ্ট্রের অধিকার ও কর্তব্যের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করবে এবং কনভেনশনের বিধানাবলীর সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে কাজ করবে।

অন্যান্য রাষ্ট্রের অধিকার (Rights of Non-Coastal States) : একচেটিয়া অর্থনৈতিক অঞ্চলে উপকূলবর্তী অথবা ভূ-বেষ্টিত সব রাষ্ট্রই এই কনভেনশনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, ৮৭ অনুচ্ছেদে বর্ণিত নৌ ও বিমান চলাচল এবং সমুদ্র গর্ভে যোগাযোগ তার (Cable) ও পাইপ লাইন স্থাপনের স্বাধীনতা এবং এই স্বাধীনতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত অন্যান্য আইনগত ব্যবহারের অধিকার ভোগ করবে। (অনু : ৫৮) যে সমস্ত রাষ্ট্র ভূ-খণ্ড বেষ্টিত তাদেরও অন্যান্য রাষ্ট্রের যেসব অধিকার রয়েছে ঠিক একই রকম অধিকার রয়েছে (অনু : ৬৯)

তবে এখানে অন্যান্য রাষ্ট্রের কর্তব্য ও দায়িত্ব হবে এই অঞ্চলে উপকূলবর্তী রাষ্ট্রের যে অধিকার রয়েছে তার প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করা এবং তা মেনে চলা। একচেটিয়া অর্থনৈতিক অঞ্চল উপকূলীয় রাষ্ট্রকে বিশেষ অধিকার প্রদান করেছে যাকে Sui generis বলা যায়। [একচেটিয়া অর্থনৈতিক অঞ্চল সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য অনুচ্ছেদ (৫৫–৭৫), ১৯৮২ সালের সমুদ্র আইন বিষয়ক কনভেনশন দ্রষ্টব্য]

৬. মুক্ত সাগর (High Sea)

উন্মুক্ত সমুদ্র সংক্রান্ত বিধানাবলী আন্তর্জাতিক আইনের অন্যতম আলোচিত বিষয়। তবে সমুদ্রে একচেটিয়া অর্থনৈতিক অঞ্চল নির্দিষ্ট করার পর উন্মুক্ত সাগরের পরিধি অনেকটা কমে গেছে কিন্তু তার গুরুত্ব ঠিকই বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ উন্মুক্ত সমুদ্র হচ্ছে একচেটিয়া অর্থনৈতিক অঞ্চল অর্থাৎ ২০০ নটিক্যাল মাইলের পরবর্তী বিস্তীর্ণ ও গভীর জলরাশি।

১৯৫৮ সালের জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী কোন রাষ্ট্রের আঞ্চলিক সমুদ্র অথবা অভ্যন্তরীণ জলরাশির বহির্ভূত সমুদ্রাংশকে বুঝায়। কিন্তু সমুদ্র আইনে একচেটিয়া অর্থনৈতিক অঞ্চল চিহ্নিত হওয়ার পর ১৯৮২ সালের কনভেনশন অনুযায়ী কোন রাষ্ট্রের আঞ্চলিক সমুদ্র অথবা একচেটিয়া অর্থনৈতিক অঞ্চল অভ্যন্তরীণ জলরাশি বা দ্বীপপুঞ্জ দ্বারা গঠিত দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত জলরাশির বাইরের সমুদ্রাংশকে উন্মুক্ত সমুদ্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয় (অনু: ৮৬)।

১৯৫৮ সালের কনভেনশনে মুক্ত সমুদ্রে ৪ ধরনের স্বাধীনতার কথা বলা হয়। কিন্তু ১৯৮২ সালের কনভেনশনে অতিরিক্ত দুটো স্বাধীনতা যোগ হয়েছে অনুচ্ছেদ ৮৭ অনুযায়ী।

১. উপকূলবর্তী হোক আর ভূ-বেষ্টিত হোক, সব রাষ্ট্রের জন্য গভীর সমুদ্র উন্মুক্ত থাকবে। গভীর সমুদ্রের স্বাধীনতা এই কনভেনশন এবং আন্তর্জাতিক আইনের অন্যান্য নিয়মাবলীর দ্বারা নির্ধারিত শর্তাদির অধীনে প্রয়োগ করতে হবে। উপকূলবর্তী ও ভূ-বেষ্টিত সব রাষ্ট্র গভীর সমুদ্রে নিম্নের স্বাধীনতাগুলো ভোগ করবে:

ক. নৌ চালনার স্বাধীনতা;

খ. উপরস্থ বায়ুমণ্ডলে বিমান চলাচলের স্বাধীনতা;

গ. আন্তঃসাগরীয় যোগাযোগতার ও পাইপ লাইন স্থাপনের স্বাধীনতা;

ঘ. কৃত্রিম দ্বীপ এবং আন্তর্জাতিক আইনের দ্বারা অনুমোদিত অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণের স্বাধীনতা;

ঙ. মৎস শিকারের স্বাধীনতা;

চ. বৈজ্ঞানিক গবেষণার স্বাধীনতা।

অনু : ৮৭ (২) অনুযায়ী সব রাষ্ট্রই অন্যান্য রাষ্ট্রের স্বার্থ এবং স্বাধীনতা ভোগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন পূর্বক এই স্বাধীনতাগুলি ভোগ করবে।

উন্মুক্ত সমুদ্র কেবল শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত থাকবে এবং কোন রাষ্ট্র গভীর সমুদ্রের কোনো অংশ বৈধভাবে উহার সার্বভৌমত্বের অধীনে আনতে পারবে না (অনু : ৮৮ ও ৮৯)।

অতএব বলা যায় গভীর সমুদ্র সবার জন্য উন্মুক্ত তা সে উপকূলবর্তী রাষ্ট্র বা অন্যান্য রাষ্ট্র এমনকি ভূ-বেষ্টিত রাষ্ট্রই হোক। আর গভীর সমুদ্র উন্মুক্ত থাকবে–এই ধারণাটি প্রথম উল্লেখ ঘটান আন্তর্জাতিক আইনের জনক হুগো গ্রোসিয়াস। তিনি মূলত দু'টি কারণে উন্মুক্ত সমুদ্রে সবার স্বাধীনতার কথা বলেন যা তার অন্যতম গ্রন্থ Mare Liberum এ তুলে ধরেছেন:

১. সমুদ্র কখনো কোন রাষ্ট্রের একক সম্পত্তি হতে পারে না কেননা দখলের মাধ্যমে গভীর সমুদ্রের নিয়ন্ত্রণ টিকিয়ে রাখা অসম্ভব;

২. যা সবার ব্যবহারের নিমিত্তে প্রকৃতি দান করেছে তা কারও একা ভোগ করা তথা সমুদ্র সম্পদ আহরণ করা প্রকৃতি বিরুদ্ধ। তাই তার মতে উন্মুক্ত সমুদ্র হচ্ছে res gentium or res extra commercium.

গভীর সমুদ্রে জাহাজের চলাচল : যে কোন রাষ্ট্রই গভীর সমুদ্রে উহার নিজস্ব পতাকাধীনে জাহাজ চালাতে পারবে (অনু : ৯০)। প্রত্যেক রাষ্ট্র কোনো জাহাজকে উহার জাতীয়তা প্রদান, উহার ভূ-খণ্ডে কোনো জাহাজের নিবন্ধন এবং উহার পতাকা বহনের অধিকার দান সংক্রান্ত শর্তাদি নির্ধারণ করবে। যে জাহাজ যে রাষ্ট্রের পতাকাবাহী সে জাহাজ সে দেশের জাতীয়তা (Nationality) লাভ করবে। তবে রাষ্ট্রের সঙ্গে জাহাজটির বাস্তব সম্পর্ক

(genuine link) থাকবে; প্রত্যেক রাষ্ট্র উহার পতাকাবাহী জাহাজকে পতাকা বহনের অধিকার সংক্রান্ত দলিল পত্র প্রদান করবে (অনু : ৯১)।

কোনো জাহাজ মাত্র একটি রাষ্ট্রের পতাকা বহন করবে এবং আন্তর্জাতিক চুক্তি বা কনভেনশনে ব্যতিক্রমী বিধান না থাকলে গভীর সমুদ্রে জাহাজটি সম্পূর্ণরূপে সেই রাষ্ট্রের এখতিয়ারাধীন থাকবে। জাহাজের মালিকানা বা নিবন্ধন পরিবর্তন না হলে উহার পতাকা পরিবর্তন করবে না; কোনো জাহাজ দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের পতাকা বহন করলে এবং নিজের সুবিধামত সেগুলো ব্যবহার করলে সেটি হবে Flag of convenience এবং সেক্ষেত্রে তৃতীয় কোন রাষ্ট্র প্রসঙ্গে, সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র দু'টির কোনটিরই জাতীয়তা দাবি করতে পারবে না এবং উহা জাতীয়তাবিহীন জাহাজ বলে পরিগণিত হবে (অনু : ৯২)। তবে যেসব জাহাজ জাতিসঙ্ঘ বা উহার বিশেষায়িত সংস্থাসমূহ বা আন্তর্জাতিক আনবিক সংস্থার (International Atomic Energy Agency) কাজে নিয়োজিত, ঐ সব সংগঠনের পতাকা বহন করলে ৯২ অনুচ্ছেদের বিধান প্রযোজ্য হবে না (অনু : ৯৩)। প্রত্যেক রাষ্ট্র উহার পতাকাবাহী জাহাজে প্রশাসনিক, কারিগরি ও সামাজিক, এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যাপারে কার্যকরী এখতিয়ার ও নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করবে (অনু : ৯৪)।

যুদ্ধ জাহাজ সম্পর্কিত বিধান (Warship) : গভীর সমুদ্রে যুদ্ধ জাহাজসমূহ নিজস্ব পতাকা রাষ্ট্র ব্যতীত অন্য সব রাষ্ট্রের এখতিয়ার প্রয়োগ হতে বিমুক্ত (Immunity) বা দায়মুক্তি ভোগ করবে (অনু : ৯৫)।

গভীর সমুদ্রে আইনগত এখতিয়ার প্রয়োগ : কোনো জাহাজ গভীর সমুদ্রে সংঘর্ষ ঘটালে অথবা নৌ চালন সম্পর্কে কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে এবং অনুরূপ ঘটনার সঙ্গে জড়িত জাহাজের মাস্টার বা জাহাজের কাজে নিয়োজিত অন্য কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক অথবা শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হলে পতাকাবাহী রাষ্ট্র কিংবা সেই ব্যক্তি যে রাষ্ট্রের নাগরিক সেই রাষ্ট্রের বিচার বিভাগীয় কিংবা প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ ব্যতীত অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট তার বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না (Lotus Case-1927); পতাকাবাহী রাষ্ট্র ব্যতীত অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ, এমনকি তদন্ত পরিচালনার পদক্ষেপ হিসেবেও সংশ্লিষ্ট জাহাজকে গ্রেপ্তার কিংবা আটক রাখার নির্দেশ দিতে পারবে না (অনু : ৯৭)। তবে নিজ জাহাজের কোনো বিপদের আশংকা না থাকলে অন্য কোনো জাহাজের সাহায্যে বা কোনো ব্যক্তির উদ্ধারের জন্য যে কোনো জাহাজ এগিয়ে আসতে বাধ্য–যে মানবিক বিধানটি বহুদিন থেকেই সমুদ্র আইনে প্রচলিত (অনু : ৯৮)।

প্রত্যেক রাষ্ট্র উহার পতাকা বহনের অধিকারী জাহাজে ক্রীতদাস বহন নিবারণ এবং অনুরূপ কাজের জন্য শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। কোনো ক্রীতদাস কোনো জাহাজে আশ্রয় নিলে সে জাহাজ যে রাষ্ট্রেরই হোক না কেন সেই ক্রীতদাস স্বতঃই মুক্ত হবে (অনু : ৯৯)।

গভীর সমুদ্রে জলদস্যুতা দমন সংক্রান্ত বিধান : গভীর সমুদ্রে অথবা কোন রাষ্ট্রের এখতিয়ার বহির্ভূত যে কোন স্থানে জলদস্যুতা দমনের জন্য সব রাষ্ট্র যথাসম্ভব পরস্পরের সহযোগিতা করবে (অনু : ১০০)। ১০১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নিম্নের কাজগুলো জলদস্যুতা বলে গণ্য হবে–

১. যেকোনো বেসরকারি জাহাজের বা বিমানের নাবিক বা বৈমানিক (crew) বা আরোহী কর্তৃক ব্যক্তি স্বার্থে কৃত কোনো অবৈধ হিংসাত্মক কাজ, অবৈধ আটক বা লুটতরাজের কাজ যা;

   ক. অপর কোনো জাহাজ বা বিমানের কোনো ব্যক্তি বা সম্পত্তির বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়;

   খ. কোনো রাষ্ট্রের এখতিয়ার বহির্ভূত কোনো স্থানে কোনো জাহাজ, বিমান, ব্যক্তি অথবা সম্পত্তির বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়;

২. কোন জাহাজ বা বিমান দস্যু জাহাজ বা বিমান হিসেবে অবগত হওয়া সত্ত্বেও সেই জাহাজ বা বিমান স্বেচ্ছায় অবৈধ উদ্দেশ্যে পরিচালনা করা;

৩. জলদস্যুতামূলক কোনো কাজে কাউকে প্ররোচিত, উত্তেজিত অথবা অনুরূপ কাজকে সহজসাধ্য করাও জলদস্যুতা।

এই সমস্ত জলদস্যুতার বিধান ছাড়াও ১৯৮২ সালের কনভেনশনের ১০২ থেকে ১০৭ পর্যন্ত বিধানাবলী জলদস্যুতা সংক্রান্ত।

তবে উল্লেখ্য যে অনু : ১০৭ অনুযায়ী–কেবল যুদ্ধ জাহাজ অথবা সামরিক বিমান অথবা সরকারি কাজে নিয়োজিত এবং সেই মর্মে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন জাহাজ অথবা বিমান, জলদস্যুতার জন্য কোনো জাহাজ বা বিমানকে আটক করতে পারে।

উন্মুক্ত সাগরে জাহাজ পরিদর্শন সংক্রান্ত বিধান : গভীর সমুদ্রে কোন যুদ্ধ জাহাজ অন্য কোনো বাণিজ্যিক জাহাজকে চুক্তির ভিত্তিতে পরিদর্শন বা অনুসন্ধান করতে পারবে অন্যথায় তা যুক্তিসঙ্গত হবে না; তবে যদি সন্দেহ করার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে তবে যুদ্ধ জাহাজ তা পরিদর্শন করবে নিম্নের কারণে যদি–

ক. জাহাজটি জলদস্যুতার কাজে ব্যাপৃত থাকে; অথবা

খ. জাহাজটি দাস ব্যবসায় জড়িত থাকে; অথবা

গ. জাহাজটি অননুমোদিত বেতার প্রচার কাজে নিয়োজিত;

ঘ. জাহাজটি যদি জাতীয়তাবিহীন হয়; অথবা

ঙ. যদিও কোনো বিদেশী পতাকা বহন করছে বা উহার পতাকা বহন করতে অস্বীকার করছে, যেখানে প্রকৃত পক্ষে জাহাজের জাতীয়তা ও যুদ্ধ জাহাজের জাতীয়তা একই।

উপরোক্ত ক্ষেত্রে যুদ্ধ জাহাজ তা পরিদর্শন করতে পারবে। তবে যদি সন্দেহটি ভিত্তিহীন হয় তাহলে ঐ জাহাজের যদি কোনো লোকসান বা ক্ষতি হয় তবে যুদ্ধ জাহাজকে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রকে তার জন্য অবশ্যই ক্ষতিপূরণ দিতে হবে (অনু : ১১০)।

তবে একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ যে কোন সন্ত্রাসী বা নাশকতামূলক কাজ রাজনৈতিক উদ্দেশে উন্মুক্ত সমুদ্রে (Terra Nullius) হলে তা জলদস্যুতা নাও হতে পারে; তবে যেহেতু কাজটি রাজনৈতিক কি না তা নির্ণয় কষ্টসাধ্য হওয়ায় জাহাজটির বিদ্রোহী (Insurgent) মনোভাব অর্জন প্রাসঙ্গিক এবং অপেক্ষাকৃত সহজ।

সবশেষে দেখা যায় অনু: ১০৯ অনুযায়ী অ-অনুমোদিত সম্প্রচারের জন্য কোন ব্যক্তির বিচার নিম্নের কর্তৃপক্ষ করতে পারে–

ক. পতাকা রাষ্ট্র

খ. যে রাষ্ট্রে সংশ্লিষ্ট স্থাপনা নিবন্ধিত হয়েছে

গ. সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যে রাষ্ট্রের নাগরিক

ঘ. বেতার প্রচার যে সব রাষ্ট্র হতে শ্রবণ করা যায়

ঙ. যে সব রাষ্ট্রে অনুমোদিত বেতার যোগাযোগ বিঘ্নিত হয়।

দ্রুত পশ্চাদ্ধাবনের অধিকার (Right of Hot Pursuit)

পশ্চাদ্ধাবনের অধিকার একটি কনভেনশন স্বীকৃত অধিকার যা ১৯৮২ কনভেনশনে অনু: ১১১ বর্ণিত।

যখন কোন উপকূলবর্তী রাষ্ট্রের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের বিশ্বাসের কারণ থাকে যে, বিদেশী কোনো জাহাজ উক্ত রাষ্ট্রের আইন লঙ্ঘন করেছে, সেই লঙ্ঘনকারী জাহাজকে ধরার জন্য উপকূলবর্তী রাষ্ট্রের দ্রুত পশ্চাদ্ধাবনের অধিকার আছে। তবে বিদেশী জাহাজটি উপকূলবর্তী রাষ্ট্রের আঞ্চলিক সমুদ্র, সংলগ্ন অঞ্চল, একচেটিয়া অর্থনৈতিক অঞ্চলে বা মহীসোপানের নিয়ম ভঙ্গ করে তবে উপকূলীয় রাষ্ট্র তা বন্ধ করার জন্য বা ভঙ্গকারীর বিচারের উদ্দেশ্যে তাকে আটক করতে পারবে। তবে জাহাজটি উপকূলীয় রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষের নির্দেশ পাবার পর আত্মসমর্থন না করে পলায়ন করে তবে তাকে ধরার জন্য কর্তৃপক্ষ তার পশ্চাদ্ধাবন করতে পারবে এবং সে যদি উন্মুক্ত সাগরেও পলায়ন করে তবে তাকে আটক করতে পারবে। তবে যে জাহাজের পশ্চাদ্ধাবন করা হচ্ছে সেই জাহাজ উহার নিজ দেশের বা তৃতীয় কোনো

দেশের আঞ্চলিক সমুদ্রে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই পশ্চাদ্ধাবনের অধিকার লোপ পাবে। যে জাহাজটির পিছনে ধাওয়া করা হচ্ছে সেই জাহাজ বা নৌকা বা যান (craft), যা উহার সাথে একযোগে কাজ করছে এবং উহাকে মূল জাহাজ (Mothership) হিসেবে ব্যবহার করছে, আঞ্চলিক সমুদ্রে বা সংলগ্ন অঞ্চলে বা অর্থনৈতিক সীমানা এমনকি মহীসোপনের উপর অবস্থান করছে এ সম্পর্কে পশ্চাদ্ধাবনকারী জাহাজটি যথাসম্ভব উপায়ে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত পশ্চাদ্ধাবন আরম্ভ হয়েছে বলে গণ্য হবে না। বিদেশী জাহাজ হতে দেখা বা শুনা যায় এমন দূরত্ব হতে উহাকে থামার জন্য কোনো দৃশ্যমান অথবা শ্রাব্য সংকেতের পরই পশ্চাদ্ধাবন আরম্ভ করা যাবে। কেবলমাত্র যুদ্ধ জাহাজ অথবা সামরিক বিমান বা সরকারি কাজে নিয়োজিত এবং সেই মর্মে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত জাহাজ বা বিমানের দ্বারাই পশ্চাদ্ধাবনের অধিকার প্রয়োগ করা যাবে। যে জাহাজ বা বিমান থামার নির্দেশ দেবে বা গ্রেপ্তারের উদ্দেশে রওনা হয়েছে কিন্তু জাহাজটিকে আটকের ক্ষমতা রাখে না সেক্ষেত্রে উপকূলীয় রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষের কাছে শক্তিশালী জাহাজ বা বিমানের সাহায্য চাইলে তাকে ঐ সাহায্যকারী জাহাজ বা বিমান না আসা পর্যন্ত পশ্চাদ্ধাবন চালিয়ে যেতে হবে।

দ্রুত পশ্চাদ্ধাবন এর অধিকার প্রয়োগের মতো উপযুক্ত পরিস্থিতি বিদ্যমান না থাকা সত্ত্বেও যদি কোনো জাহাজকে আঞ্চলিক সমুদ্রের বাইরে থামানো বা গ্রেপ্তার করা হয় এবং তার ফলে যদি জাহাজটির কোনো লোকসান বা ক্ষতি হয় সেক্ষেত্রে উপকূলীয় রাষ্ট্র তার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য।

দ্রুত পশ্চাদ্ধাবন সংক্রান্ত মামলা : দ্রুত পশ্চাদ্ধাবনে কতটুকু অধিকার উপকূলীয় রাষ্ট্র প্রয়োগ করবে সে বিষয়ে আন্তর্জাতিক আইন বিতর্কের উর্ধ্বে নয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য মামলা হল–

মামলা : I am Alone Case; আমি একা মামলা; (Canada Vs. U.S.A, 1935)

ঘটনা : I am alone একটি কানাডায় রেজিস্ট্রিকৃত জাহাজ ১৯২৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের আঞ্চলিক সমুদ্রে (১০ নটি: মা:) মাদক দ্রব্য চোরাচালানে লিপ্ত ছিল। যুক্তরাষ্ট্রের নৌ পুলিশ জাহাজটিকে থামার সংকেত দিলে তা না মেনে I am alone পালাতে থাকে। তখন নৌ কর্তৃপক্ষ জাহাজটিকে লক্ষ করে গোলা বর্ষণ করতে থাকে এবং Wolcott নামক একটি জাহাজ নিয়ে তার পিছু নেয়। কিন্তু Wolcott এর গতি কম হওয়ায় কর্তৃপক্ষ দ্রুত গতি সম্পন্ন Dextar জাহাজ চেয়ে পাঠায়। Dextar তার পিছু ধাওয়া করে এবং জাহাজটিকে থামার সংকেত দিলে যখন থামে নি তখন যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ গোলাবর্ষণ করে এবং জাহাজটি সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস হয়। জাহাজের মানুষগুলো সমেত জাহাজটি ডুবে যায়। ২০০ নটিক্যাল মাইল দূরত্বে এই ঘটনা ঘটে।

বিচার্য বিষয়

১. যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চাদ্ধাবনের অধিকার আছে কি না;

২. Dextar দ্বারা পশ্চাদ্ধাবন আসলে পশ্চাদ্ধাবন ধরা হবে কি না যেহেতু উহা প্রথম পশ্চাদ্ধাবিত জাহাজ ছিল না।

রায় : সালিশ আদালত কানাডার পক্ষে রায় প্রদান করে যেখানে যুক্তরাষ্ট্রকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য আদালত নির্দেশ দেয়। কিন্তু আদালত আরো বলেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চাদ্ধাবনের অধিকার রয়েছে তবে তা ধারাবাহিক পশ্চাদ্ধাবন হয় নি। আদালত সাথে সাথে এও বলেন যে, পশ্চাদ্ধাবন করা যাবে, জাহাজকে আটক করা ন্যায়সঙ্গত কিন্তু জাহাজের সম্পূর্ণ ধ্বংস এবং জাহাজের মানুষ/নাবিকগুলোর প্রাণ নাশের ঘটনা ন্যায়সঙ্গত নয়।

যুক্তি : আন্তর্জাতিক আইনে এমন কোন নীতি নেই যা মানুষের প্রাণনাশ ঘটায়।

গভীর সমুদ্রে যোগাযোগ তার ও পাইপ লাইন বসানোর বিধানাবলী : জাহাজ অথবা পাইপ লাইন হতে তেল নিঃসরণ দ্বারা বা সমুদ্র তল (Sea bed) এবং অন্তর্ভূমির (Sub soil) ব্যবহার ও সেখানে অনুসন্ধান (Reseasch) পরিচালনায় সমুদ্র যাতে দূষিত না হয় সেজন্য প্রত্যেক রাষ্ট্র এই বিষয়ে বিদ্যমান যেকোন চুক্তির বিধানসমূহের প্রতি দৃষ্টি রেখে নিয়মকানুন প্রণয়ন করবে (অনু : ১১২) (বিস্তারিত অনু : ১১৩ হতে ১১৫ দ্রষ্টব্য)।

গভীর সমুদ্রে প্রাণীজ সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা : মুক্ত সাগরে প্রাণীজ সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ ও আহরণ এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় বিধান ১৯৮২ সালের কনভেনশনের অনু : ১১৬ হতে ১২০ এ সংযোজিত হয়েছে।

ভূ-বেষ্টিত রাষ্ট্রসমূহের সমুদ্রে প্রবেশ ও বহির্গমনের অধিকার এবং অন্তবর্তী যাত্রার স্বাধীনতা (Right of access of Land Locked States to and from the Sea and Freedom of Transit)

১৯৮২ সালের কনভেনশন ভূ-বেষ্টিত রাষ্ট্র বা যাদের সমুদ্র উপকূল নেই তাদেরকে সমুদ্রে প্রবেশ এবং তা থেকে প্রত্যাবর্তনের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে যা স্থলবদ্ধ রাষ্ট্র ও উপকূলের মধ্যে অবস্থিত উপকূলীয় রাষ্ট্রের মধ্যে Transit থাকবে। আর এই অধিকার বাস্তবায়নে উপকূলীয় রাষ্ট্র সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে তবে তা অবশ্যই স্থলবদ্ধ রাষ্ট্র ও উপকূলীয় রাষ্ট্রের মধ্যে চুক্তিবদ্ধতার মাধ্যমে সম্পন্ন হবে। (বিস্তারিত অনু: ১২৪ হতে ১৩২-১৯৮২ কনভেনশন)।

এলাকা এবং মানব জাতির উত্তরাধিকার (The Area and Common Heritage of Mankind) : মৎস্য শিকার ও প্রাণীজ সম্পদ সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিধান প্রথম ১৯৫৮ সালের কনভেনশনে বিধিবদ্ধ রূপ নেয়। তবে উন্মুক্ত সমুদ্রের তলদেশ, অন্তর্ভূমির সদ্ব্যবহার

সংক্রান্ত বিধান এসেছে ১৯৮২ সালের কনভেনশনে। কেননা যদিও সমুদ্রে আঞ্চলিক অঞ্চল, একচেটিয়া অর্থনৈতিক অঞ্চল চিহ্নিত হয়েছে তারপরও সমুদ্র আইনে বিংশ শতাব্দীর অন্যতম আলোচিত বিষয় গভীর সমুদ্রের তলদেশ ও তার সম্পদের নিয়ন্ত্রণ ও তার ব্যবহার। ১৯৬৭ সালে রাষ্ট্রদূত আরভিড পাদ্রো (Arvid Padro) মানব জাতির অভিন্ন উত্তরাধিকার (common heritage of mankind) ধারণার আধুনিক প্রবক্তা। অর্থাৎ গভীর সমুদ্র অঞ্চল ও তার সম্পদ সমগ্র মানব জাতির অভিন্ন উত্তরাধিকার।

১৯৮২ সালের কনভেনশনের একাদশ (XI) ভাগে এলাকা এবং সমগ্র মানব জাতির অভিন্ন উত্তরাধিকারের বিষয়ে বিধানসমূহ বিধৃত রয়েছে। এই কনভেনশনে রাষ্ট্রীয় এখতিয়ার বহির্ভূত সমুদ্রগর্ভ, সমুদ্রতল ও অন্তর্ভূমিকে 'এলাকা' (Area) বলে অভিহিত করা হয়েছে (অনু : ১৩৩)। এই এলাকা এবং এর সম্পদসমূহ সমগ্র মানবজাতির (common heritage of mankind) সাধারণ উত্তরাধিকারভুক্ত (অনু : ১৩৬)। কোন রাষ্ট্র এই 'এলাকা' বা তার কোন অংশ বা সম্পদের উপর সার্বভৌমত্ব দাবি বা প্রয়োগ করতে পারবে না অথবা কোন রাষ্ট্র বা ব্যক্তি এই 'এলাকার' কোন অংশের উপর দখল প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না (অনু : ১৩৭)।

সমগ্র দেশের অধিকার সুনিশ্চিতকরণ এবং মানবজাতির উপকারার্থে অনু : ১৪০ (১) অনুযায়ী সমগ্র মানব জাতির মঙ্গলের জন্য কোনো রকম তারতম্য না করেই গভীর সমুদ্রে কার্যক্রম চলবে এবং এখানকার সম্পদ উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়নে এবং জাতিসংঘ কর্তৃক স্বীকৃত ঐ সমস্ত মানবগুলোর উপকারেই ব্যবহার করা হবে। সমুদ্রে এই কাজগুলো যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয় সে জন্য **আন্তর্জাতিক সমুদ্র তলদেশ কর্তৃপক্ষ (International Sea Bed Authority)** প্রতিষ্ঠিত হয়েছে (অনু : ১৫৬)। অনু : ১৪০ (২) অনুযায়ী গভীর সমুদ্র এলাকায় যেসব আর্থিক ও অন্যান্য অর্থনৈতিক সুবিধা অর্জিত হবে সেগুলোর কোনো তারতম্য ব্যতিরেকেই কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন দেশের মধ্যে অংশ নির্ধারণ করে তা বণ্টন করবে।

পরিশেষে বলা যায় যে, ১৯৮২ সালের এই কনভেনশন তাত্ত্বিকভাবে হলেও বিভিন্ন রাষ্ট্রের এবং সমগ্র মানব জাতির গভীর সমুদ্র এলাকা ও তার সম্পদের অধিকার ও সুষম বণ্টন নিশ্চিত করেছে। (বিস্তারিত– অনু : ১৩৩ হতে ১৬৯ দ্রষ্টব্য)।

৭. মহীসোপান (Continental Shelf)

সমুদ্রে মহীসোপান একটি অত্যাধিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল যাতে গ্যাস ও তেল সম্পদের প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হয়। তাই সব রাষ্ট্রই এই অঞ্চলে নিজেদের দখল প্রতিষ্ঠা করতে চায়। বিশ্বে সর্বপ্রথম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান (Truman) ১৯৪৫ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর এক আদেশ (Proctamation) বলে মহীসোপানে যুক্তরাষ্ট্রের এখতিয়ারের ঘোষণা দেন। যুক্তরাষ্ট্রের পরপরই আর্জেন্টিনা, এল সালভাদর তাদের নিজ নিজ মহীসোপান ও তার উপরের পানি ও আকাশ সীমার উপর উপকূলীয় রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব দাবি করে ঘোষণা দেয়। চিলি ও পেরু ঘোষণায় বলে যে, সমুদ্র তটরেখা (Base Line) থেকে ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত এলাকায় উপকূলীয় রাষ্ট্রের সার্বভৌম এখতিয়ার থাকবে। মহীসোপানে উপকূলীয় রাষ্ট্রসমূহের আধিপত্য অর্জনের মূল লক্ষ্য ছিল–

১. মহীসোপানের ব্যবহার উপকূলীয় রাষ্ট্রের সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল;

২. ইহা উপকূলীয় রাষ্ট্রের স্থলভূমিরই বর্ধিতাংশ (Natural prolongation);

৩. মহীসোপানের যে কোন ব্যবহারিক কার্যক্রমে উপকূলীয় রাষ্ট্রই সবচেয়ে বেশি আগ্রহী।

১৯৫৮ সালের কনভেনশনের অনু : ১ অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় সমুদ্রের বাইরে কিন্তু তদ্‌সংলগ্ন জলরাশির তলদেশ ও তার অন্তর্ভূমি (Subsoil) যা ২০০ মিটার জলের গভীরতা পর্যন্ত বিস্তৃত বা তার বাইরে যে এলাকায় কারিগরী উৎকর্ষতা দ্বারা সম্পদ আহরণ সম্ভব তাই মহীসোপান। তবে সেই সময় সম্পদ আহরণের অভূতপূর্ব কারিগরী উৎকর্ষতা সাধিত না হলেও ক্রমশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নব নব আবিষ্কারের ফলে ১৯৮২ সালে মহীসোপানের একটি সফল ও পূর্ণাঙ্গ আইনগত রূপ প্রদানের চেষ্টা করা হয়েছে। ১৯৮২ সালের কনভেনশনের ষষ্ঠ ভাগে (VI) মহীসোপান সংক্রান্ত সব বিধি বিধান অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অনু : ৭৬ (১) অনুসারে কোনো উপকূলবর্তী রাষ্ট্রের মহীসোপান সামুদ্রিক এলাকার তলদেশ ও অন্তর্ভূমি নিয়ে গঠিত যা আঞ্চলিক সমুদ্রের বাইরে ভূ-ভাগের (Land Territory) প্রাকৃতিক প্রসারের (Natural Prolongation) মাধ্যমে মহাদেশীয় প্রান্তের (Continental Margin) বহিঃসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত, অথবা যেখানে মহাদেশীয় প্রান্তের বহিঃসীমা ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত প্রসারিত নয় সেখানে (যে ভিত্তিরেখা হতে আঞ্চলিক সমুদ্রের প্রশস্ততা পরিমাপ করা হয় সেই) ভিত্তিরেখা হতে ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত হবে।

মহীসোপান সংক্রান্ত বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রের ভূ-ভাগের (Landmass) নিমজ্জিত প্রসার (Prolongation) নিয়ে গঠিত এবং সোপানের সমুদ্রতল, অন্তর্ভূমি, ঢাল (Slope) ও চড়াই (rise) এর অন্তর্ভুক্ত।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, একচেটিয়া অর্থনৈতিক অঞ্চলের বিস্তৃতিও ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত। সুতরাং অর্থনৈতিক অঞ্চলে উপকূলীয় রাষ্ট্রের অধিকারের সাথে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য মহীসোপানের সীমাও ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত করা হয়েছে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সমুদ্রে দেখা গেছে কোনো কোনো রাষ্ট্রের মহীসোপান প্রাকৃতিক প্রসারের দরুণ (Natural prolongation) ৫০০/৬০০ মাইল দীর্ঘ। তাই সে সমস্ত রাষ্ট্রের কথা বিশেষ বিবেচনা করে সর্ব সম্মতিতে তাদের মহীসোপানের বিস্তৃতি ৩৫০ নটিক্যাল মাইল করা হয়েছে {(অনু : ৭৬(৫)}।

উপকূলীয় রাষ্ট্রের অধিকার : মহীসোপানে উপকূলীয় রাষ্ট্র তার সার্বভৌম অধিকার ভোগ করবে। অনু : ৭৭ অনুযায়ী নিম্নলিখিত অধিকারগুলো উপকূলীয় রাষ্ট্র তার মহীসোপানে ভোগ করবে–

১. অনুসন্ধান, পরিচালনা ও প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার করবে;

২. এই অঞ্চলের অধিকার উপকূলীয় রাষ্ট্রের জন্য একচেটিয়া;

৩. কোনো ঘোষণা ছাড়াই এ অঞ্চলে উপকূলবর্তী রাষ্ট্রের অধিকার ও দখল প্রতিষ্ঠিত হবে।

তবে মহীসোপানের উপর উপকূলবর্তী রাষ্ট্রের অধিকার প্রয়োগ কোনোভাবেই এই কনভেনশনের বিধান অনুসারে অন্যান্য রাষ্ট্রের নৌ চলাচল (Navigation) এবং অন্যান্য অধিকার খর্ব করবে না বা অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ ঘটাবে না; সব রাষ্ট্র মহীসোপানে আন্তঃসাগরীয় যোগাযোগ তার ও পাইপ লাইন স্থাপন করতে পারবে। সম্পদের অধিকার বাস্তবায়নের জন্য উপকূলীয় রাষ্ট্র মহীসোপান এলাকায় প্রয়োজনীয় স্থাপনা কাঠামো তৈরি করতে পারবে। তবে অনু : ৮২ অনুযায়ী উপকূলীয় রাষ্ট্র ২০০ নটিক্যাল মাইলের বাইরে-আরো ১৫০ নটিক্যাল মাইল এলাকায় উত্তোলিত সম্পদের আয়ের একটা অংশ সমুদ্র তলদেশ কর্তৃপক্ষ (ISBA) কে প্রদান করবে।

অনুচ্ছেদ ৮৩ অনুযায়ী– বিপরীতমুখী অথবা সংলগ্ন উপকূল বিশিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে মহীসোপানের সীমানা নির্দিষ্টকরণ আন্তর্জাতিক আদালতের সংবিধির ৩৮ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত আন্তর্জাতিক আইনের ভিত্তিতে সম্পাদিত চুক্তির (agreement) মাধ্যমে কার্যকর হবে।

তথাপিও মহীসোপানের সীমা নিয়ে বিপরীতধর্মী রাষ্ট্রের মধ্যে বিভিন্ন মতবিরোধ থেকে আন্তর্জাতিক আইনে দু'টি নীতির উদ্ভব ঘটেছে।

১. সমদূরত্বের নীতি (Equidistance Principle)

২. ন্যায়পরতার নীতি (Principle of Equity)

বিভিন্ন মামলার আলোকে নীতি দু'টি নিম্নে আলোচিত হল :

মামলা : North Sea Continental Shelf Cases; উত্তর সাগর মহীসোপান মামলা; (Federal Republic of Germany Vs Denmark & Netherland, ICJ, 1969)

ঘটনা : ডেনমার্ক এবং নেদারল্যান্ডের সাথে মহীসোপান সংক্রান্ত দু'টি চুক্তি ছিল জার্মানীর এবং চুক্তি দু'টি উভয় দেশগুলো ১৯৬৪ ও ১৯৬৫ সালে স্বাক্ষর করে। কিন্তু দু'টি দেশের মধ্যকার সীমানা নির্দেশক রেখা তারা নির্দিষ্ট করে নি। পরবর্তীতে North Sea

Continental Shelf নির্ধারণ করা দুষ্কর হয়ে পড়ে। ফলে বিবাদমান রাষ্ট্রগুলির সীমানা নির্ধারণের সমস্যা সমাধানে তারা আন্তর্জাতিক আদালতে যায়। যেহেতু মামলার বিচার্য বিষয় একই বিধায় মামলা দু'টি একই সঙ্গে নিষ্পত্তি হয়।

বিচার্য বিষয়

১. পক্ষগণের সীমানা চিহ্নিতকরণে আন্তর্জাতিক আইনের কোন নীতি প্রয়োগ করা হবে;

২. ১৯৫৮ সালের Continental Shelf Convention এর অনু : ৬ যা সমদূরত্বের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত সেটি জার্মানীর মত রাষ্ট্রের উপর বাধ্যকর কি না; কেননা জার্মানী উপরোক্ত চুক্তির পক্ষ নয়।

রায় : সমদূরত্বের নীতি পক্ষগণের মধ্যে বাধ্যকর নয়। এই মামলার রায়ে আদালত প্রথম ন্যায়পরতার নীতির উদ্ভাবন ঘটায় এবং তা ডেনমার্ক ও নেদারল্যান্ডের পক্ষে যায়।

যুক্তি : যেহেতু জার্মানী ১৯৫৮ কনভেনশন অনুমোদন (Ratify) করে নি তাই সে কনভেনশনের বিধান মানতে বাধ্য নয়। কিন্তু আদালত বিষয়টি বিশেষ বিবেচনায় এনে নতুন এক নীতি 'ন্যায়পরতার নীতি'র (Principle of Equity) উদ্ভাবন করে।

মামলা : Anglo-French Continental Shelf Case; এ্যাংলো ফরাসী মহীসোপান মামলা; (UK Vs. France, 1978)

ঘটনা : প্রায় ১০ বছর যাবৎ (১৯৬৪-৭৫) যুক্তরাজ্য এবং ফ্রান্স তাদের মহীসোপানের সীমানা নির্ধারণে ব্যর্থ হয়। ১৯৭৫ সালে দু'দেশের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যে, তাদের বিষয়টি সালিশী আদালতে (Arbitration) নিষ্পত্তি হবে। ১৯৭৭ সালের জুন মাসে জেনেভাতে সালিশ আদালত তাদের সীমানা নির্ধারণ করে দেয়।

বিচার্য বিষয় : কোন নীতির বা আইনের ভিত্তিতে ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্যের মহীসোপানের সীমা নির্ধারিত হবে।

সিদ্ধান্ত : সালিশ আদালত ন্যায়পরতার নীতির উপর ভিত্তি করে তার সিদ্ধান্ত প্রদান করেন।

যুক্তি : ১৯৫৮ সালের মহীসোপান সংক্রান্ত জেনেভা কনভেনশনের অনু : ৬ এই মামলার ক্ষেত্রে সমদূরত্বের নীতি প্রয়োগ করতে হবেই তা বলা যায় না এবং সেই কারণে নতুন নিয়ম এখানে প্রয়োগ করা হয় যা হল ন্যায়পরায়ণতার নীতি।

মামলা : Tunisa-Libya Continental Shelf Case; তিউনিসিয়া-লিবিয়া মহীসোপান মামলা; (ICJ,1982)

ঘটনা : ১৯৭৭ সালের ১০ জুন লিবিয়া ও তিউনিশিয়া তাদের দু'দেশের মধ্যকার মহীসোপানের সীমানা নির্ধারণ সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনের জন্য আন্তর্জাতিক আদালতে

যাওয়ার লক্ষ্যে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। আন্তর্জাতিক আদালতকে একটি রায় প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয় এবং তদানুসারে রায় প্রদান করে কিন্তু তিউনিশিয়া এর বিরুদ্ধে রিভিশন (Revision) করে কিন্তু রিভিশন আদালত পূর্বের রায় বহাল রাখে।

বিচার্য বিষয় : এই মামলা নিষ্পত্তিতে ১৯৫৮ সালের জেনেভা কনভেনশন নাকি আন্তর্জাতিক প্রথা প্রয়োগ হবে, কেননা দু'দেশের কেউই কনভেনশন স্বাক্ষর করে নি।

রায় : এই মামলার রায় ন্যায়পরতা নীতির (Equitable Principle) উপর ভিত্তি করে প্রদান করা হয়।

মামলা : Libya-Malta Continental Shelf Case; লিবিয়া-মাল্টা মহীসোপান মামলা; (1985)

ঘটনা : উভয় পক্ষই ১৯৮২ সালের সমুদ্র আইনের স্বাক্ষরকারী দেশ। কিন্তু প্রাকৃতিক প্রসারের কারণে মহীসোপানের সীমা নিয়ে দু'টি দেশের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। উভয় দেশই তাদের বর্ধিত মহীসোপান সম্পূর্ণ দাবি করে। তখন দু'টি দেশের বিবাদ নিরসনে বিষয়টি আন্তর্জাতিক আদালতে যায়।

বিচার্য বিষয় : এই মামলার বিরোধ নিষ্পত্তিতে ১৯৫৮ সালের কনভেনশনের অনু : ৬(২) এর বিধান না কি আন্তর্জাতিক প্রথা আইন গৃহীত হবে, কেননা তারা উভয়েই ১৯৮২ সালের কনভেনশনের স্বাক্ষরকারী দেশ।

রায় : আদালত এই ক্ষেত্রে সমদূরত্বের নীতির (Equidistance Principle) মাধ্যমে বিষয়টির নিষ্পত্তি করে।

তাই বলা যায়, মহীসোপানের সীমানা নির্দিষ্টকরণে বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আদালত যে কোন একটি নীতি অনুসরণ করতে পারে।

আন্তর্জাতিক আকাশ আইন

International Law of the Air

কোন দেশের ভূ-খণ্ড ও সমুদ্র সীমার উপর যেমন রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব আছে; তেমনি কর্তৃত্ব আছে আকাশ সীমার উপরও। এই কর্তৃত্ব নিরঙ্কুশ নয়। কোন দেশের ভূ-খণ্ড বরাবর আকাশই হচ্ছে সে দেশের এক্তিয়ারভুক্ত আকাশ সীমানা। বাণিজ্যিক কারণে অন্যান্য রাষ্ট্র কর্তৃক এই আকাশ সীমা যেসব নিয়ম-নীতির অধীনে ব্যবহৃত হয়, তাকেই বলে বিমান চলাচল আইন বা আকাশ আইন বা Aviation Law. আন্তর্জাতিক আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে এই আকাশ আইন। এই আইনের ক্রমবিকাশকে আমরা তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করতে পারি :

ক. ২০ শতকের শুরু থেকে ১ম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত

খ. ১ম ও ২য় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়

গ. ২য় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়

আকাশ আইনের ক্রমবিকাশের পর্যায়গুলো থেকে এটা দেখা যায় যে, এই আইনের শুরু খুব বেশি দিন আগে নয়। মানব সম্প্রদায়ের ইতিহাসে উড়োজাহাজ জায়গা করে নেয়ার পরই কেবল আন্তর্জাতিক আইনের এই গুরুত্বপূর্ণ শাখাটি বিকাশ লাভ করে। ক্রমবিকাশের প্রথম পর্যায়ে আকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকৃত হতো। তখন পর্যন্ত রাষ্ট্রসমূহ আকাশ সীমাকে ব্যবহার করে কোন আক্রমণের শিকার হয় নি। ফলে আকাশ সীমা সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তাও তেমনভাবে অনুভূত হয় নি। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরপরই দৃশ্যপটের আমূল পরিবর্তন হলো। রাষ্ট্রসমূহ ধারণা পোষণ করলো যে ভূ-খণ্ডের মত আকাশ সীমাতেও নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে হবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত এই মত টিকে থাকলো। বিজ্ঞানের প্রভূত অগ্রগতির ফলে যুদ্ধের মাধ্যম হিসেবে আকাশ সীমাকে ব্যবহারের প্রবণতা বৃদ্ধি পেল, অপর দিকে বাণিজ্যের প্রয়োজনে সময় সঙ্কোচনের তাগিদে আকাশ সীমায় নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্বের ধারণায় পরিবর্তন আনাটা জরুরি বলে বিবেচিত হলো।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আকাশ সীমা ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি আন্তর্জাতিক নীতিমালা গ্রহণের তাগিদ অনুভূত হয়। এটি হলো ক্রমবিকাশের তৃতীয় পর্যায়। এখানে মূলতঃ প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে বিদ্যমান ধারণার একটি সমন্বয় সাধিত হয়। বলা হলো, কোন দেশের আকাশ সীমার উপর সে দেশের পূর্ণ সার্বভৌম এক্তিয়ার থাকবে, কিন্তু শান্তির সময়ে বেসামরিক বিমান চলাচলের ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম নীতি সাপেক্ষে অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহও এই আকাশসীমা ব্যবহার

করতে পারবে। আকাশের এই স্বাধীনতা (Freedom of Air) নিশ্চিত করাটা প্রত্যেক রাষ্ট্রের বাধ্যবাধকতা হয়ে দাঁড়ায়। বর্তমানে যে সব চুক্তি দ্বারা আকাশ আইন পরিচালিত হচ্ছে, সেগুলো হলো :

- Paris Convention for the Regulation of Aerial Navigation, 1919.
- Warsaw Convention for the Unification of the Certain Rules Relating to the International Carriage by Air (Warsaw Convention), 1929.
- Chicago Convention on Civil Aviation, 1944.
- Hague Protocol to the Warsaw Convention, 1955.
- Montreal Agreement of 1966.
- Guatemala Protocol of 1971.
- Montreal Protocol of 1975.

আকাশের স্বাধীনতা : আকাশের স্বাধীনতা বা Freedom of Air বলতে বুঝায় এক দেশ কর্তৃক আরেক দেশের আকাশ সীমা ব্যবহার। এই স্বাধীনতা কোন সামরিক কাজে ব্যবহার করা যায় না। শুধুমাত্র বেসামরিক বিমান চলাচলের ক্ষেত্রেই এই স্বাধীনতাগুলো প্রযোজ্য। বেসামরিক বিমান চলাচলের জন্য নিম্নোক্ত শর্তগুলো পূরণ করতে হবে :

ক. এটা নির্ধারিত (scheduled) বা অনির্ধারিত (Unscheduled) উড্ডয়ন হবে।

খ. দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে উড্ডয়নটি হবে।

গ. এটা শুধুমাত্র যাত্রী, পণ্য, ডাকবহন এবং সমগোত্রীয় উদ্দেশেই পরিচালিত হবে।

ঘ. এই পরিবহন অবশ্যই অর্থের বিনিময়ে হবে।

কেবল উপরোক্ত শর্তগুলো পূরণ করলেই আকাশের স্বাধীনতা ভোগ করা যাবে, অন্যথায় নয়। এবার দেখা যাক আকাশের স্বাধীনতা কোনগুলো। আকাশের স্বাধীনতাগুলো নির্দিষ্ট করার জন্য ১৯৪৪ সালে Chicago-তে দু'টি আন্তর্জাতিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি দু'টিতেই স্বাধীনতাগুলো বর্ণিত হয়েছে। চুক্তি দু'টি হলো :

ক. Two Freedoms Convention বা Transit Rights Convention.

খ. Five Freedoms Convention বা Traffic Rights Convention.

ক. দু'টি অধিকারের প্রথমটি হলো

কোন দেশের উড়োজাহাজ (Flag State) অনুমোদন দানকারী রাষ্ট্রের (Grantor State) আকাশ সীমা ব্যবহার করে তৃতীয় কোন রাষ্ট্রে যেতে পারবে। উদাহরণ: বাংলাদেশ বিমান যদি ঢাকা থেকে উড্ডয়ন করে ভারতের মাদ্রাজের উপর দিয়ে উড়ে শ্রীলংকায় অবতরণ করে, তাহলে বাংলাদেশ বিমান ভারতের কাছ থেকে দ্বৈত স্বাধীনতা কনভেনশনের প্রথম স্বাধীনতাটি ভোগ করছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ হচ্ছে পতাকা রাষ্ট্র (Flag State) আর ভারত হচ্ছে অনুমোদনকারী রাষ্ট্র (Grantor State).

দ্বিতীয় অধিকারটি হলো : অনুমোদনকারী রাষ্ট্র যদি পতাকা রাষ্ট্রের কোন উড়োজাহাজকে শুধুমাত্র কারিগরী (Technical Purpose) যেমন: জ্বালানী, যান্ত্রিক সমস্যা ইত্যাদি কারণে তার দেশে অবতরণ করতে দেয়, তবে এটা দ্বিতীয় স্বাধীনতা।

খ. পঞ্চ-স্বাধীনতা কনভেনশনের প্রথম দু'টি স্বাধীনতা, দ্বৈত স্বাধীনতা কনভেনশনের দু'টি স্বাধীনতার অবিকল।

তৃতীয় স্বাধীনতাটি হলো : পতাকা রাষ্ট্র হতে যাত্রী, মালামাল এবং চিঠিপত্র অনুমোদনকারী রাষ্ট্রে আকাশ পথে নামানোর স্বাধীনতা।

চতুর্থ স্বাধীনতাটি হলো : তৃতীয় স্বাধীনতাটি ভোগ করার পর আবার যাত্রী, মালামাল, চিঠিপত্র ইত্যাদি নিতে আনুমোদনকারী রাষ্ট্র হতে পতাকা রাষ্ট্রে ফিরে আসার স্বাধীনতা।

পঞ্চম স্বাধীনতাটি হলো : তৃতীয় অধিকারটি ভোগ করে চতুর্থ স্বাধীনতা ব্যবহার না করে নতুন যাত্রী, মালামাল, চিঠিপত্র ইত্যাদি নিয়ে তৃতীয় কোন রাষ্ট্রে গমনের স্বাধীনতা। এখানে উল্লেখ্য যে, চতুর্থ স্বাধীনতা অনুমোদন করলেও অধিকাংশ রাষ্ট্র পঞ্চম অধিকারটি অনুমোদন করতে চায় না।

উপরোক্ত পাঁচটি অধিকার ছাড়াও আরও কিছু অধিকার বা স্বাধীনতা আছে, যেগুলো কোন কনভেনশনে লিপিবদ্ধ না হলেও রাষ্ট্রসমূহ প্রয়োজনের তাগিদে ব্যবহার করে থাকে। এগুলো হলো :

ষষ্ঠ স্বাধীনতা : অনুমোদনকারী রাষ্ট্র চতুর্থ স্বাধীনতা অনুমোদন করলেও পঞ্চম স্বাধীনতা অনুমোদন করছে না। সেক্ষেত্রে পতাকা রাষ্ট্র বিকল্প উপায়ে পঞ্চম অধিকার ভোগ করলে তাকে ষষ্ঠ স্বাধীনতা বলে। ধরা যাক, বাংলাদেশ বিমানকে ভারত চতুর্থ স্বাধীনতা অনুমোদন করেছে কিন্তু পঞ্চম স্বাধীনতা অনুমোদন করে নি। সেক্ষেত্রে বিমান দিল্লী থেকে

নিউইয়র্কগামী যাত্রীগণকে বাংলাদেশে এনে, এখান থেকে নিউইয়র্কের উদ্দেশে যাত্রা করতে পারে।

সপ্তম স্বাধীনতা : পতাকা রাষ্ট্রের উড়োজাহাজ যদি অনুমোদনকারী রাষ্ট্র হতে পরিচালিত হওয়ার সুবিধা ভোগ করে, তাকে সপ্তম স্বাধীনতা বলে। উদাহরণ: বাংলাদেশ বিমান ল্যাটিন আমেরিকার রাষ্ট্রসমূহের মাঝে ফ্লাইট পরিচালনা করে। সেক্ষেত্রে, বিমান যদি নিউইয়র্কে স্টেশন হিসাবে ব্যবহার করে এই কাজটি করতে পারে, তাহলে বিমান সপ্তম স্বাধীনতা ভোগ করছে।

অষ্টম স্বাধীনতা : যখন কোন দেশ তার অভ্যন্তরীণ রুটে অন্য কোন দেশের বিমান পরিচালিত হওয়ার অনুমতি দেয়, তাকে অষ্টম স্বাধীনতা বলে। উদাহরণ : ভারত তার অভ্যন্তরীণ রুটে বাংলাদেশ বিমানকে পরিচালিত হওয়ার সুযোগ দিল, বাংলাদেশ বিমান সেক্ষেত্রে অষ্টম স্বাধীনতা ভোগ করবে।

আকাশ সীমা রক্ষায় রাষ্ট্রের অধিকার : আগেই বলা হয়েছে, ভূ-খণ্ডের মত আকাশ সীমানাতেও রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব বিস্তৃত। শুধুমাত্র বেসামরিক বিমান চলাচলের ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশ কিছু স্বাধীনতা ভোগ করে থাকে; তাও অনুমোদন সাপেক্ষে। নিম্নে আলোচিত কতক মামলা থেকে এতদসংক্রান্ত রাষ্ট্রের অধিকার বোঝা যাবে। তবে বিভিন্ন সময়ে এই ধারণার পরিবর্তন এসেছে।

মামলা : Aerial Incidence Case; এরিয়াল ইন্সিডেন্স কেস; (Israel Vs. Bulgaria, ICJ, 1955)

মামলায় প্রতিষ্ঠিত নীতি : একটি রাষ্ট্রের আকাশসীমা রক্ষায় পূর্ণ অধিকার আছে এবং যে কোন অনধিকার প্রবেশ (Intrusion) মোকাবেলায় রাষ্ট্র যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

মামলার ঘটনা : ১৯৫৫ সালের ২৭ জুলাই EL AL Israel Airlines Ltd.-এর একটি বাণিজ্যিক বিমান লন্ডন থেকে প্যারিস হয়ে ইসরায়েলে উড্ডয়ন করে। যাত্রা পথে এটি বুলগেরিয়ার আকাশ সীমায় প্রবেশ করলে এই অনধিকার প্রবেশের ঘটনা তদন্ত করতে বুলগেরিয়া যুদ্ধ বিমান পাঠায় এবং যুদ্ধ বিমানের হামলায় বাণিজ্যিক বিমানটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এতে বিমানের ৭ জন ক্রু এবং ৫১ জন যাত্রী নিহত হয়।

কূটনৈতিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে ইসরায়েল ক্ষতিপূরণ দাবি করে ১৬ অক্টোবর ১৯৫৭ সালে আন্তর্জাতিক আদালতে আবেদন করে। ইসরায়েল যুক্তি দেখায় যে, এই অনুপ্রবেশ ইচ্ছাকৃত ছিল না, যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে এটি ঘটে। উপরন্তু এটি ছিল একটি বেসামরিক বিমান। অপর

পক্ষে বুলগেরিয়া আদালতের এখতিয়ারই অস্বীকার করে। আরও দাবি করে যে, তার আকাশ সীমা রক্ষার সকল অধিকার তার আছে।

সিদ্ধান্ত : আদালত বুলগেরিয়ার যুক্তি মেনে নেয়। পরবর্তীতে অবশ্য বুলগেরিয়া নিহতদের পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণ হিসাবে ১,৯৫,০০০ মার্কিন ডলার পরিশোধ করতে সম্মত হয়।

মামলা : U-2 Case; ইউ-টু কেস; (1960)

প্রতিষ্ঠিত নীতি : আকাশসীমায় সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রাখা যে কোন দেশের অধিকার এবং বিশেষত একটি সামরিক বিমানের অনুপ্রবেশের বিপরীতে রাষ্ট্র যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

ঘটনা : U-2 ছিল একটি অত্যাধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ মার্কিন সামরিক গোয়েন্দা বিমান। এর চালক ছিলেন কর্নেল ফ্রান্সিস জি. পাওয়ারস। তিনি ছিলেন একজন CIA এজেন্ট। তিনি ইউ-টু বিমানের সাহায্যে CIA' এর জন্য রাশিয়ার এলাকা থেকে তথ্য জোগাড় করতে উদ্যত হন। সমগ্র বিষয়টি তদারক করত CIA. মি. পাওয়ারস দীর্ঘদিন ধরেই কাজটি করে আসছিলেন, কিন্তু অজ্ঞাত ভাবে ১৯৬০ সালের ১ লা মে ইউ-টু সোভিয়েত আকাশ সীমানায় ঢুকে গেলে সোভিয়েত ইউনিয়ন মিগ ২৯ প্রেরণ করে এবং ইউ-টু'কে অবতরণ করতে সংকেত পাঠায়। তথাপি ইউ-টু অবতরণ না করায় ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে ইউ-টু'কে ভূপাতিত করা হয় এবং এর চালক মি. পাওয়ারস প্যারাসুটের সাহায্যে অবতরণ করতে সক্ষম হয়। অবতরণের পরপরই সোভিয়েত বাহিনী মি. পাওয়ারসকে গ্রেফতার করে এবং সোভিয়েত আদালতে তার বিচার করা হয়।

সিদ্ধান্ত : সোভিয়েত আদালত সোভিয়েত বাহিনীর এই কাজকে যথার্থ বিবেচনা করে এবং মি. পাওয়ারস্ কে দোষী সাব্যস্ত করে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে তাকে সাইবেরিয়ায় পাঠিয়ে দেয়া হয়। এই মামলা থেকে এই নীতিই প্রতিষ্ঠিত হয় যে, রাষ্ট্র তার আকাশ সীমায় সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রাখতে যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। এর সত্যতা প্রমাণিত হয় এই ঘটনা থেকে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এসব সোভিয়েত কর্মকাণ্ডের কোন বিরোধিতা করে নি।

মামলা : The Libyan Airline Tragedy; লিবিয়ান এয়ারলাইন ট্রাজেডি; (1973)

প্রতিষ্ঠিত নীতি : আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে কোন বেসামরিক বিমানের উপর বল প্রয়োগ সমর্থনযোগ্য নয় এবং এটা শুধুমাত্র এই কারণেই অনুমতি পাওয়ার যোগ্য নয় যে,

অবতরণের আদেশ দেয়া হয়েছে; কারণ এই আদেশ চালক কর্তৃক বোধগম্য না-ও হতে পারে।

মামলার ঘটনা : ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৩-এ ইসরায়েলি সামরিক বিমান তাদের অধিকৃত সিনাই পর্বতের আকাশ সীমায় লিবিয়ার একটি বাণিজ্যিক বিমান গুলি করে ধ্বংস করে। এতে মোট ১০৬ জন যাত্রী মারা যান। আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান সংস্থা (ICAO)-এর এক রিপোর্টে দেখা যায়, বিমানটি অনিচ্ছাকৃতভাবেই ঐ অঞ্চলে প্রবেশ করেছিল। ইসরায়েল জানায়, উত্তেজনাপূর্ণ সামরিক পরিস্থিতির কারণেই তারা ভেবেছিল বিমানটি ধ্বংসাত্মক কাজে ব্যবহৃত হতে পারে। তারা আরও জানায়, বিমানটি অবতরণ করানোর জন্য একাধিকবার সংকেত প্রেরণ করা হয়েছিল।

অভিমত : ICAO রিপোর্টের উপসংহারে উল্লেখ করা হয় যে, পরিস্থিতি যাই হোক, কোন অবস্থাতেই বেসামরিক বিমানের উপর হামলা অনুমোদন পাওয়ার যোগ্য নয়। এটি অবশ্যই আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন।

মামলা : The Korean Airline Tragedy; কোরিয়ান এয়ারলাইন ট্রাজেডি, (1983)

প্রতিষ্ঠিত নীতি : এই দুঃখজনক ঘটনার পর ICAO কাউন্সিল সর্বসম্মতভাবে একটি রেজ্যুলেশন গ্রহণ করে, যার ৩য় অনুচ্ছেদে বলা হয়– বেসামরিক বিমানের বিরুদ্ধে কোন অবস্থাতেই অস্ত্র ব্যবহার করা যাবে না, বা শক্তি প্রয়োগ করা যাবে না। যদি না তা জাতিসংঘ সনদের ৫১ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে সমর্থন যোগ্য হয়।

মামলার ঘটনা : ১৯৮৩ সালে কোরিয়ান এয়ারলাইনস্ এর বোয়িং ৭৪৭ একটি বিমান আলাস্কা থেকে দক্ষিণ কোরিয়ার উদ্দেশে যাত্রা করে। বিমানটি সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের একটি সংবেদনশীল সামরিক অঞ্চলের কাছাকাছি চলে এলে রাশিয়ান মিগ যুদ্ধ বিমান দ্বারা বোয়িং-টিকে ভূপাতিত করা হয়। ১৬৯ জন যাত্রী ও ক্রু'দের সকলেই নিহত হন। জীবন ও সম্পদের ক্ষতিপূরণের জন্য সোভিয়েত বরাবরে দাবি উত্থাপিত হয়। বৃটেন একাই তার নাগরিকদের মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ বাবদ দুই মিলিয়ন পাউন্ড দাবি করে।

সিদ্ধান্ত : সোভিয়েত ইউনিয়ন যুক্তি দেখায় যে, তার অধিকার আছে তার দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার। এছাড়াও বোয়িং-এ হামলা করার আগে একাধিকবার সতর্কতামূলক সংকেত পাঠানো হয়েছিল। ICAO রিপোর্টে দেখা যায়, এই অনুপ্রবেশের ঘটনাটি ঘটেছিল ক্রু'দের অবহেলার কারণে। তথাপি, ICAO রিপোর্টে সোভিয়েত আচরণের তীব্র নিন্দা জানানো হয়। বাস্তবিক ঘটনা এই যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন তাদের সর্বশেষ আবিষ্কার আকাশ থেকে

আকাশে নিক্ষেপণযোগ্য মিসাইলের কার্যকারিতা পরীক্ষা করেছিল। পরবর্তী পর্যায়ে সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট গর্বাচেভ কোরিয়াকে বিপুল অংকের ক্ষতিপূরণ প্রদান করেন এবং কোরিয়ার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

ক্ষতিপূরণের দায়বদ্ধতা

বিমানে চলাচলের সময় যাত্রীদের বা মালামালের কোন ক্ষতি হলে, এই ক্ষতিপূরণের দায়-দায়িত্ব কার উপর বর্তাবে, তা-নিয়ে প্রায়শই বিতর্কের সৃষ্টি হয়। কেউ মনে করেন দায়িত্ব এয়ারলাইন্স কর্তৃপক্ষের, আবার অনেকে ভাবেন বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের। একাধিক মামলার রায়ে এই সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, যে মুহূর্তে যাত্রীদের চেক্ ইন সম্পন্ন হয়, তখন থেকেই এয়ারলাইন কর্তৃপক্ষের দায়বদ্ধতা শুরু, এটি শেষ হয় যাত্রীদের ডিসএম্বারকেশনের (Disembarcation) পর।

মামলা : Dey-Et-El Vs. T.W.A; দে-এট-এল বনাম টি,ডব্লিউ, এ.; (1975)

মামলার ঘটনা : দে এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণ TWA এর যাত্রী ছিলেন। এথেন্স এয়ারপোর্টে তাদের চেকইন সম্পন্ন হওয়ার পর তারা যাত্রী লাউঞ্জে অপেক্ষা করছিলেন। এই সময়ে এয়ারপোর্টে একটি সন্ত্রাসী হামলা হয়। এতে তিন যাত্রী মারা যান এবং ৪০ জন আহত হন। দে তাদের একজন। তিনি এবং অন্যান্য যাত্রীরা TWA-এর কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করে। TWA এ বলে, এটা বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব।

সিদ্ধান্ত : এই মামলায় সিদ্ধান্ত হয় যে, ক্ষতিপূরণের জন্য TWA দায়বদ্ধ থাকবে। কারণ, যে মুহূর্তে যাত্রীদের চেক ইন সম্পন্ন হয়, তখন থেকেই এয়ারলাইন কর্তৃপক্ষের দায়-দায়িত্ব শুরু।

মামলা : Harnandez Vs. Air France; হার্নান্দেজ বনাম এয়ার ফ্রান্স, (1976)

মামলার ঘটনা : মি. হার্নান্দেজ ছিলেন এয়ার ফ্রান্সের একজন যাত্রী। বিমানটি প্যারিসের চার্লস দ্য গাল এয়ারপোর্টে অবতরণের পর তিনি ডিসএম্বার্কেশন সম্পন্ন করে এয়ারপোর্টে তার মালপত্রের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এ সময়ে এয়ারপোর্টে একটি সন্ত্রাসী হামলা হয়, এবং মি. হার্নান্দেজ গুরুতর আহত হন। তিনি এয়ার ফ্রান্সের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করেন।

বিচার্য বিষয়

ডিসএম্বার্কেশন সম্পন্ন হয়েছিল কি-না?

২. যদি প্রথম প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, তবে এয়ার ফ্রান্স ক্ষতিপূরণ দানে বাধ্য হবে কি-না?

সিদ্ধান্ত : মামলায় এই সিদ্ধান্ত দেয়া হয় যে, ডিসএম্বার্কেশন সম্পন্ন হয়েছিল এবং এর সাথেই এয়ার ফ্রান্সের দায়িত্বের সমাপ্তি ঘটেছে। কাজেই এয়ার ফ্রান্স ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য নয়।

মামলা : Turkish Airline Tragedy; টার্কিশ এয়ারলাইন ট্রাজেডি;

মামলার ঘটনা : আমেরিকার তৈরি একটি টার্কিশ এয়ারলাইন্সের বিমান তুরস্ক থেকে প্যারিসের উদ্দেশে যাত্রা করে। এটা যখন প্যারিসের উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল, তখন এটি ভূ-পাতিত হয় এবং এর ৩০০ যাত্রীর সকলেই নিহত হন। মৃত বৃটিশ যাত্রীদের আত্মীয়-স্বজন ক্ষতিপূরণ চেয়ে আমেরিকার বিরুদ্ধে মামলা করে।

বিচার্য বিষয় : আমেরিকার বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ দাবি যুক্তিযুক্ত কি-না?

সিদ্ধান্ত : সিদ্ধান্ত দেয়া হয় যে, যেহেতু বিমানটি আমেরিকায় প্রস্তুতকৃত, কাজেই আমেরিকা দায়বদ্ধ এবং আদালত আমেরিকাকে ৩০০,০০০ মার্কিন ডলার ক্ষতিপূরণ দিতে আদেশ দেন।

এই মামলায় 'ক্লাশ একশন' নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল; অর্থাৎ, যদি একজন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ পান, তাহলে বাকি সকল ক্ষতিগ্রস্ত বিনা মামলাতেই একই পরিমাণ ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী হবেন।

চুক্তি আইন
Law of Treaties

আন্তর্জাতিক আদালত সংবিধির অনুচ্ছেদ ৩৮ এ বর্ণিত আন্তর্জাতিক আইনের ৫টি আনুষ্ঠানিক (formal) উৎসের মধ্যে চুক্তি অন্যতম।

চুক্তি হচ্ছে দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ঐকমত্য যা চুক্তি রাষ্ট্র দুটি বা তাদের মধ্যে দায় দায়িত্ব এবং অধিকার সৃষ্টি করে। চুক্তি শুধু রাষ্ট্রের সাথে রাষ্ট্রেরই নয় বরং আন্তর্জাতিক সংগঠনের বা সংগঠনসমূহের মধ্যেও সম্পাদিত হতে পারে। সুতরাং বলা চলে চুক্তির মধ্য দিয়ে পক্ষসমূহের আইনগত বাধ্যবাধকতার সূত্রপাত ঘটে। সাধারণত চুক্তি লিখিত হওয়া শ্রেয়। তবে চুক্তি মৌখিকও হতে পারে। আন্তর্জাতিক আইনে চুক্তি সংক্রান্ত বিধানগুলো লিখিত চুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

চুক্তি আইনের উৎস ও ইতিহাস

মানব সভ্যতার শুরু থেকেই চুক্তির অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল– আন্তর্জাতিক আইনের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। চুক্তির বিষয়গুলো যুগের পর যুগ ধরে প্রথাভিত্তিক আন্তর্জাতিক আইনের বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। তাই আন্তর্জাতিক আইনের উৎসের বিবর্তনে প্রথাকেই চুক্তির জনক বললে অত্যুক্তি হবে না।

১৯৬৯ সালের পূর্বে চুক্তি সম্পাদন, গ্রহণ, অনুসমর্থন, সত্যায়ন, বলবৎকরণ, বর্জন বা বাতিলকরণ প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কিত নিয়মাবলি আন্তর্জাতিক প্রথা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। আন্তর্জাতিক আইন কমিশন ১৯৬৬ সালে উহার অষ্টাদশ অধিবেশনে চুক্তি সংক্রান্ত প্রথা নিয়ম-কানুনগুলি বিধিবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে চুক্তি সম্পর্কিত আইনের খসড়া বিধানাবলী (Draft Articles) প্রস্তুত করে। এই খসড়ার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক কনভেনশন গ্রহণের উদ্দেশ্যে জাতিসংঘ ১৯৬৮ ও ১৯৬৯ সালে পরপর দুটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান করে। 'চুক্তি সংক্রান্ত আইন বিষয়ক জাতিসংঘ সম্মেলন' (United Nations Conference on the Law of Treaties) এর দ্বিতীয় অধিবেশনটি ১৯৬৯ সালের ৯ এপ্রিল হতে ২২ মে পর্যন্ত ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত হয় যাতে একশ'রও বেশি রাষ্ট্র যোগদান করে এবং ২২ মে ১৯৬৯ তারিখেই কনভেনশনটি আন্তর্জাতিক বিধিবদ্ধ আইনে রূপ লাভ করে, যদিও ১৯৮০ সাল থেকে এটি কার্যকর হয়েছে। তবে ভিয়েনা কনভেনশনটি শুধু লিখিতভাবে এবং রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আন্তর্জাতিক সংগঠনের অংশগ্রহণে সম্পাদিত বা রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বিদ্যমান কোন মৌখিক চুক্তির ক্ষেত্রে কনভেনশনটি প্রযোজ্য নয়। আলোচ্য কনভেনশনটি শুধু প্রচলিত রীতিনীতির সংহতি বা বিধিবদ্ধকরণ নয়। কোনো

কোনো ক্ষেত্রে ইহা নতুন নিয়ম সৃষ্টি করে আন্তর্জাতিক আইনের উন্নয়ন সাধন করেছে। তারপরও ভিয়েনা কনভেনশনকে চুক্তি সংক্রান্ত একটি পূর্ণাঙ্গ বিধি ব্যবস্থা (Code) বলা যায় না। কনভেনশনের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, চুক্তি সংক্রান্ত যেসব বিষয় এই কনভেনশন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় সে সব বিষয় আন্তর্জাতিক আইনের প্রথাগত নিয়ম কানুন দ্বারা পরিচালিত বা নিয়ন্ত্রিত হবে।

চুক্তি কেন গুরুত্বপূর্ণ

চুক্তি আইনের গুরুত্বপূর্ণ বিধান হচ্ছে **চুক্তি অবশ্যই পালনীয়** (Pacta Sunt Servanda)। চুক্তির অবশ্য পালনীয় নীতিটি পক্ষদ্বয়কেই অবাধ সম্মতি ও সরল বিশ্বাসে (good faith) বাস্তবায়ন করতে হবে। কোন রাষ্ট্র চুক্তিতে বর্ণিত চুক্তিবদ্ধ বিষয়গুলোর সুযোগ সুবিধা ভোগ করে বলেই চুক্তির অবশ্য পালন অত্যাবশ্যকীয়। পুরাতনকালে চুক্তি ছিল একটি পবিত্র অঙ্গীকার। তাই ধর্মীয় অনুশাসন হিসেবে চুক্তি পালন করা হত। তৎকালীন সময়ে চুক্তির পবিত্রতা ও অলঙ্ঘনীয়তা রক্ষার জন্য চুক্তির বিষয়বস্তু পাথরে খোদাই করে বা বিশেষ পত্রে লিপিবদ্ধ করে উপাসনালয়ে সংরক্ষিত হত, যাতে চুক্তিটি দেবতাদের হেফাজতে থাকে। কিন্তু আন্তর্জাতিক ইতিহাসে চুক্তি লঙ্ঘনের দৃষ্টান্ত থাকায় চুক্তির অলঙ্ঘনীয়তা ও অবশ্য পালনীয়তা সার্বজনীনভাবে গ্রহণ যোগ্যতা লাভ করেছে এবং এটি একটি স্বীকৃত নীতিতে পরিণত হয়েছে। যার ফলে বছরের পর বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে নীতিটি সারা বিশ্বে প্রায় সব রাষ্ট্র কর্তৃক চুক্তির ক্ষেত্রে অনুসৃত হবার দরুণ বর্তমানে এটি একটি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত প্রথা আইনের রূপ পরিগ্রহ করেছে। তাই Pacta Sunt Servanda অর্থাৎ চুক্তি অবশ্যই পালনীয় যা সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত আন্তর্জাতিক প্রথা আইনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধান।

ভিয়েনা কনভেনশনের অনু: ২ (১) ক তে চুক্তির সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। কনভেনশন অনুসারে– চুক্তি বলতে বুঝায় একাধিক রাষ্ট্রের মধ্যে লিখিত আকারে সম্পাদিত এবং আন্তর্জাতিক আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যে কোনো শিরোনামযুক্ত আন্তর্জাতিক ঐক্যমত যা একটি কিংবা দুটি অথবা ততোধিক পরস্পর সম্পর্কযুক্ত দলিলে আবদ্ধ।

চুক্তির শ্রেণী বিভাগ (Classification of Treaties)

সাধারণত চুক্তি দুই প্রকার। যথা –

১. **দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি (Bi-Lateral Treaty) :** দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি কেবল দুটি পক্ষের মধ্যেই হয়ে থাকে; যেখানে রাষ্ট্র দুটির পারস্পরিক দায় দায়িত্বের উদ্ভব ঘটে।

২. **বহু পাক্ষিক চুক্তি (Multi-Lateral Treaty) :** এই ধরনের চুক্তি অনেকগুলো রাষ্ট্রের মধ্যে মতৈক্যের ভিত্তিতে সম্পাদিত হয়। বহু পাক্ষিক চুক্তিকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয় –

ক. **সার্বজনীন চুক্তি (Universal Treaty) :** যেসব বহু পাক্ষিক চুক্তিগুলি সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত এবং সকল রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বা উন্মুক্ত তাদেরকে সার্বজনীন চুক্তি বলে। যেমন– জাতিসংঘ সনদ (UN Charter).

খ. **আঞ্চলিক চুক্তি (Regional Treaty) :** এই ধরনের বহু পাক্ষিক চুক্তিগুলো আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে সম্পাদিত হয়। অর্থাৎ বিশ্বের একই অঞ্চলভুক্ত কতিপয় রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি। যেমন– সার্ক সনদ (Saarc Charter)।

কিন্তু বিভিন্ন দিক বিচার বিশ্লেষণে আন্তর্জাতিক চুক্তিকে মাত্র দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

১. **আইন প্রণয়নকারী চুক্তি** (Law making Treaty)

২. **কন্ট্রাক্ট চুক্তি** (Treaty Contract)

১. **আইন প্রণয়নকারী চুক্তি :** এ চুক্তির বিধানগুলো আন্তর্জাতিক আইনের প্রত্যক্ষ উৎস। এই ধরনের চুক্তি পক্ষভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের জন্য নতুন ও মৌলিক আচরণবিধি ও নীতির উদ্ভব ঘটায়। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য সময় থেকেই আইন প্রণয়নকারী চুক্তির অবিশ্বাস্য উন্নয়ন ঘটতে থাকে। তবে আন্তর্জাতিক প্রথার অভাবে আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাধারণ স্বার্থ (Common Interest) মেটানোর জন্য আন্তর্জাতিক আইন অপর্যাপ্ত ছিল। ব্যবসায়িক এবং অর্থনৈতিক কারণে আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় চুক্তির অনিবার্যতা সারা বিশ্বে অনভূত হয়। আইন প্রণয়নকারী চুক্তিগুলো আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করে। এই ধরনের চুক্তি সব সময়ই সার্বজনীনভাবে প্রয়োগ সিদ্ধ আন্তর্জাতিক আইনের প্রকৃতি ধারণ করে না। তাই আমরা আইন প্রণয়নকারী চুক্তিকে দুটি ভাগে ভাগ করতে বাধ্য হই –

ক. সার্বজনীন আন্তর্জাতিক আইনের নীতি সমৃদ্ধ আইন প্রণয়নকারী চুক্তি। যেমন, UN Charter.

খ. সাধারণ অথবা স্বচ্ছ সাধারণ নিয়ম প্রদানকারী চুক্তি (Laying down general or fairly general rules).

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সম্পাদিত বহুপাক্ষিক কনভেনশনসমূহ যেমন, ১৯৬৯ সালের চুক্তি আইন সংক্রান্ত ভিয়েনা কনভেনশন, ১৯৬১ সালের কূটনৈতিক সম্পর্ক সংক্রান্ত ভিয়েনা কনভেনশন, ১৯৪৯ সালের যুদ্ধ সংক্রান্ত জেনেভা রেডক্রস কনভেনশনসমূহ, প্রভৃতি কনভেনশনসমূহ আইন প্রণয়নকারী চুক্তির পর্যায়ভুক্ত।

২. **কন্ট্রাক্ট চুক্তি :** এই ধরনের চুক্তি আন্তর্জাতিক প্রথা আইনের প্রত্যক্ষ উৎস নয়। শুধুমাত্র পক্ষদ্বয়ের মধ্যেই একটি নির্দিষ্ট নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করে। তবে কন্ট্রাক্ট চুক্তি প্রথা নিয়মের

উন্নয়নের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক আইনের রূপ পরিগ্রহ করে। তবে ইহা নিম্নলিখিতভাবে আন্তর্জাতিক আইনে পরিণত হয়–

ক. বছরের পর বছর ধরে একই ধরনের নিয়ম যখন চুক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যখন ঐ একই নিয়মের চুক্তি পরবর্তীতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যেও সম্পাদিত হয়– তখন ধরে নেওয়া হয় যে, তা আন্তর্জাতিক প্রথায় পরিণত হয়েছে অর্থাৎ ঐ কন্ট্রাক্ট চুক্তিটি সার্বজনীন রূপ লাভ করেছে।

খ. এই ধরনের চুক্তি বাস্তবিকপক্ষে কতিপয় পক্ষদ্বয়ের মধ্যে সম্পাদিত হওয়ার পর ঐচ্ছিক বা অনুকরণের মাধ্যমে পরবর্তীতে অন্য কোন পক্ষ ঐ একই নিয়মে কোন চুক্তি সম্পাদন করলে সেই চুক্তিটি একটা সাধারণ প্রকৃতি লাভ করে। আর এভাবে বার বার একই ধরনের চুক্তি সম্পাদিত হলে, আন্তর্জাতিক প্রথা আইনের উদ্ভব ঘটে। অর্থাৎ গান Norm creating character-এর কন্ট্রাক্ট চুক্তি আন্তর্জাতিক আইন। কোন লেনদেন বা বিনিময় চুক্তি কন্ট্রাক্ট চুক্তি। ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে এই ধরনের চুক্তি দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পাদিত হয়। তবে রাষ্ট্রের কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তিও কন্ট্রাক্ট চুক্তির অন্তর্ভুক্ত। যদিও কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কোন চুক্তি সম্পাদন হলে তা আন্তঃরাষ্ট্রীয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত নয় তারপরও চুক্তির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রকে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ নিতে হয়। তাই বলা যায় সব ধরনের চুক্তিই অবশ্যপালনীয়।।

শুধু চুক্তিই নয় আন্তর্জাতিক আইনের সব বিষয়ই প্রাচীনকালে প্রথা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। তবে এখন চুক্তি দ্রুত প্রথার স্থান দখল করছে। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রথার উপর ভিত্তি করে নতুন নতুন বিষয়ে বিভিন্ন চুক্তি সম্পাদিত হচ্ছে শুধু তাই নয়, চুক্তিগুলো নিয়ন্ত্রণের জন্যও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আইন তৈরি হচ্ছে। আর এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আইনের বিকাশে চুক্তি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বিশ্ব পরিমণ্ডলে পারস্পরিক আদান প্রদান, নির্ভরশীলতা, সহযোগিতা, যোগাযোগ, আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক প্রভৃতি কার্যক্রম চুক্তির মাধ্যমেই সম্পাদিত হচ্ছে। সুতরাং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মূল ভিত্তি হচ্ছে চুক্তি।

চুক্তির নামকরণ (Variety of Names of Treaties)

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে চুক্তিকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয় চুক্তি সম্পাদনের পদ্ধতি ও আনুষ্ঠানিকতার বিভিন্নতা ও গুরুত্বের ভিত্তিতে। তাই চুক্তিকে চুক্তি (Treaty) ছাড়াও নিম্নলিখিত নামে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। যথা :

১. কনভেনশন (Convention)

২. প্রোটকল (Protocol)

৩. মতৈক্য (Agreement)

৪. বন্দোবস্ত (Arrangement)

৫. প্রোসেস ভারবাল (Process Verbal)

৬. স্টেটিউট (Statute)

৭. ঘোষণা (Declaration)

৮. মোডাস ভাইভেনডি (Modus Vivendi)

৯. নোট বা পত্রবিনিময় (Exchange of Notes or Letters)

১০. চূড়ান্ত দলিল (Final Act)

১১. সাধারণ দলিল (General Act)

উপরোক্ত নামগুলোর প্রত্যেকটিই শান্তি, ঐক্য অথবা ভূ-খণ্ড সমর্পণ অথবা অন্যান্য মৌলিক বিষয়ের ক্ষেত্রে চুক্তি সম্পর্কিত আনুষ্ঠানিক মতৈক্যের নীতি প্রতিষ্ঠা করে।

১. **কনভেনশন :** কোন আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ বহু পাক্ষিক চুক্তির ক্ষেত্রে সাধারণত এ নামটি ব্যবহার করা হয়। আন্তর্জাতিক সংস্থার অঙ্গসংগঠনের দ্বারা সম্পাদিত কোন দলিলের নামকরণে কনভেনশন শব্দটি ব্যবহার করা হয়, উদাহরণস্বরূপ আন্তর্জাতিক লেবার কনফারেন্স (International Labour conference) এবং আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান সংস্থা (International Civil Aviation Organisation)।

২. **প্রোটকল :** প্রোটকল মূলত চুক্তি (Treaty) এবং কনভেনশনের চেয়ে কম আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন হয় এবং সাধারণত কোন প্রোটকল কোন রাষ্ট্র প্রধান পর্যায়ে সম্পাদিত হয় না। ইহা মূল চুক্তি বা কনভেনশনের অতিরিক্ত অংশ, সংযোজনী বা সম্পূরক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এ ধরনের চুক্তির ক্ষেত্রে মূল চুক্তি বা কনভেনশনের স্বাক্ষরকারীগণও স্বাক্ষর করতে পারেন। মূলচুক্তির অনুসমর্থন (Ipso facto) প্রোটকলের অনুসমর্থন বোঝাবে।

কোন কনভেনশনের সম্পূরক দলিল স্বাধীন প্রকৃতির এবং তার আলাদা অনুসমর্থন প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ ১৯৩০ সালের হেগ প্রোটকলস (The Hague Protocols of 1930 on Statelessness) একই সময় ১৯৩০ সালেই The Hague Convention of 1930 on the Conflict of Nationality Laws স্বাক্ষরিত হয়।

৩. **মতৈক্য :** মতৈক্যও (agreement) চুক্তি বা কনভেনশনের চেয়ে কম আনুষ্ঠানিকতায় সম্পাদন হয় এবং সাধারণত রাষ্ট্র প্রধান পর্যায়ে স্বাক্ষরিত হয় না। সাধারণ কনভেনশনের তুলনায় কম সংখ্যক পক্ষ এবং সীমিত পরিধির চুক্তির ক্ষেত্রে এই

নামটি ব্যবহৃত হয়। সরকারের বিভিন্ন বিভাগের প্রতিনিধিদের দ্বারা স্বাক্ষর করানো হয় এবং কারিগরী ও প্রশাসনিক চরিত্রের চুক্তির ক্ষেত্রে এই নাম ব্যবহার হয় তবে এই ক্ষেত্রে কোন অনুসমর্থনের প্রয়োজন হয় না।

৪. বন্দোবস্ত : এই ধরনের চুক্তিও অনেকটাই মতৈক্যের মতই। তবে এটি সাধারণত অন্তর্বর্তীকালীন বা অস্থায়ী লেনদেনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।

৫. প্রোসেস ভারবাল : এই নামটি কোন কূটনৈতিক সম্মেলনের কার্যপদ্ধতি ও উপসংহারের সার সংক্ষেপ বর্ণনায় ব্যবহার হয় কিন্তু এখন পক্ষ সমূহের মধ্যকার কতিপয় মতৈক্যের রেকর্ড বোঝায়। যেমন: ১৮৯২ সালে ইতালি ও সুইজারল্যান্ডের প্রতিনিধিদের দ্বারা জুরিখে স্বাক্ষরিত প্রোসেস ভারবাল যাতে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে ব্যবসায়িক চুক্তির বিধানগুলো রেকর্ড করা হয়। ইহা বিনিময় অথবা সংরক্ষণের অনুসমর্থনের রেকর্ড হিসেবে ব্যবহৃত হয় তবে সাধারণত প্রোসেস ভারবাল কোন অনুসমর্থনের অধীন নয়।

৬. স্টেট্যুট (Statute) : আন্তর্জাতিক সংগঠনের কার্যাবলী সংক্রান্ত সর্ববিধিবদ্ধ নিয়মনীতির সমষ্টিকে এই নামে অভিহিত করা হয়। উদাহরণ- The Statute of the International Court of Justice.

৭. ঘোষণা :

ক. পূর্ণাঙ্গ চুক্তি ঘোষণা নামে অভিহিত হয় যেমন প্যারিস ঘোষণা, ১৮৫৬।

খ. কোন চুক্তি বা কনভেনশনের অনানুষ্ঠানিক দলিল সংযুক্তি যা কনভেনশনের নিয়মনীতির ব্যাখ্যা করে।

গ. ক্ষুদ্র পরিসরের বিষয় সম্পর্কিত কোন অনানুষ্ঠানিক এগ্রিমেন্ট।

ঘ. কূটনৈতিকগণ কর্তৃক সম্পাদিত কোন রেজ্যুলেশন (Resolution) যা কিছু নিয়মনীতির ব্যাখ্যা সম্বলিত এবং সকল রাষ্ট্র যার পর্যবেক্ষণ করবে- সে সমস্ত Resolution এর নাম ঘোষণা হিসেবে অভিহিত হয়। উদাহরণস্বরূপ-The Declaration on the Prohibition of Military, Political or Economic Coercion in the Conclusion of Treaties, adopted by the Vienna Conference of 1968-69 on the Law of Treaties. তবে ঘোষণার ক্ষেত্রে অনুসমর্থনের প্রয়োজন হতেও পারে আবার নাও পারে।

৮. মোডাস ভাইভেন্ডি : একটি অস্থায়ী অথবা অন্তর্বর্তীকালীন ঐকমত্য যা পরবর্তীতে একটি স্থায়ী এবং বিস্তারিত বন্দোবস্ত দ্বারা স্থলাভিষিক করার লক্ষ্যে স্থির করা হয়।

ইহা সাধারণত অনানুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়, কখনই অনুসমর্থনের প্রয়োজন হয় না।

৯. নোট বা পত্র বিনিময় : নোট বা পত্র বিনিময় একটি অনানুষ্ঠানিক সম্পাদিত চুক্তির বিশেষ ফর্ম যা সম্প্রতি প্রায়শই ব্যবহৃত হচ্ছে যেখানে পক্ষ সমূহের কিছু সমঝোতা বা কতিপয় বাধ্যবাধকতার বর্ণনা থাকে যা পক্ষ রাষ্ট্র সমূহকে বাধ্য করে। কখনো কখনো সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের কূটনৈতিক অথবা মিলিটারি প্রতিনিধিদের মাধ্যমে প্রেরিত পত্র বা নোট কার্যকরী করা হয়। এক্ষেত্রে অনুসমর্থনের প্রয়োজন পড়ে না তবে পক্ষভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের ইচ্ছার বিনিময় হলে অনুসমর্থনের প্রয়োজন আছে। বহু পাক্ষিক নোট বা পত্র বিনিময়ের দৃষ্টান্ত কিছু ক্ষেত্রে রয়েছে। ১৯৮৮ সালে শ্রীলংকার তামিল সমস্যা সমাধানে শ্রীলংকার রাষ্ট্রপতি জুলিয়াস জয়বর্দ্ধন ও ভারতের প্রধান মন্ত্রী রাজীব গান্ধীর মধ্যে এ ধরনের একটি পত্র বিনিময় হয় যা চুক্তির মর্যাদাপ্রাপ্ত ছিল।

১০. চূড়ান্ত দলিল : কোন বিষয়ে কনভেনশন প্রণয়নের লক্ষ্যে আহূত সম্মেলনের কর্মপদ্ধতি লিপিবদ্ধ করে যে দলিল প্রকাশ করা হয় তাই চূড়ান্ত দলিল। উদাহরণস্বরূপ ১৯৬৮-৬৯ সালের চুক্তি সংক্রান্ত ভিয়েনা কনভেনশন সম্মেলন সংক্রান্ত চূড়ান্ত দলিল এবং অতি সাম্প্রতিক ১৯৮২ সালের ১০ ডিসেম্বর মন্টেগো বে জ্যামাইকা সম্পাদিত সমুদ্র আইন বিষয়ক তৃতীয় সম্মেলন। সম্মেলনের রেফারেন্স, পক্ষ রাষ্ট্র, প্রতিনিধি যারা আলোচনায় অংশ নেয়, উদ্দেশ্য, আদর্শ, কর্মপদ্ধতি সবকিছুই চূড়ান্ত দলিলে সার সংক্ষেপসহ স্ববিশেষ বর্ণনা করা থাকে। এতে রেজ্যুলেশন, ঘোষণা এবং অনুরোধও থাকে যা সম্মেলনের দ্বারা কনভেনশনের বিধান হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয় না। কোন কোন সময় আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পাদিত দলিলটির বিভিন্ন বিধানের ব্যাখ্যাও চূড়ান্ত দলিলের অন্তর্ভুক্ত থাকে। চূড়ান্ত দলিল অবশ্যই স্বাক্ষরিত হয় তবে অনুসমর্থন বাধ্যতামূলক নয়।

১১. সাধারণ দলিল : সাধারণ দলিল বিশেষ প্রকৃতির হোক আর না হোক প্রকৃত পক্ষেই এটি একটি চুক্তি। Pacific Settlement of International Disputes সংক্রান্ত সাধারণ দলিল যাতে League of Nations এই নামটি ব্যবহার করে যা ১৯২৮ সালে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত হয়, যার আর একটি পুনঃসম্পাদন হয় ২৮ এপ্রিল ১৯৪৯ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক।

চুক্তি সম্পাদনকারী পক্ষ

আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে রাষ্ট্রসমূহ আন্তর্জাতিক চুক্তির প্রধান পক্ষ। প্রত্যেক রাষ্ট্র চুক্তি সম্পাদন করার ক্ষমতা রাখে। রাষ্ট্র কর্তৃক প্রেরিত কোন প্রতিনিধিও কোন চুক্তি সম্পাদন করতে পারে তবে তাকে অবশ্যই রাষ্ট্র কর্তৃক পূর্ণক্ষমতাপ্রাপ্ত হতে হবে। তবে রাষ্ট্র প্রধান,

সরকার প্রধান ও পররাষ্ট্র মন্ত্রিগণ তাদের কার্যকালে পদাধিকার বলে এবং পূর্ণক্ষমতা উপস্থাপন না করেও রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবে বিবেচিত হবে। এছাড়াও কূটনৈতিক মিশনের প্রধানগণ এবং কোন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বা আন্তর্জাতিক সংগঠন বা কোন সংস্থার কোন চুক্তির মূল লিপি পরি গ্রহণ বা সম্মতি দানের জন্য কোন রাষ্ট্র কর্তৃক উপযুক্ত পরিচয়পত্র সহ প্রেরিত ব্যক্তিগণও ঐ প্রেরিত রাষ্ট্রের প্রতিনিধি বলে গণ্য হবেন।

তবে চুক্তিটি যদি এমন কোন ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত হয় যাকে সে উদ্দেশ্যে আসলে প্রেরণ করা হয় নি সেক্ষেত্রে রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদনের পরই চুক্তিটি কার্যকারী হবে অন্যথায় নয়।

আন্তর্জাতিক চুক্তির গঠন ও বাধ্যবাধকতা (Making of International Treaty and its bindings)

বিশ্বের সব স্বাধীন রাষ্ট্রই আন্তর্জাতিক চুক্তি বা সন্ধি সম্পাদনের অধিকারী। মূলত কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তির সম্পাদন রাষ্ট্রসমূহের ইচ্ছাধীন ও পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট। তবে আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদনের জন্য কিছু বিশেষ পদ্ধতির অবলম্বন করতে হয়। সর্বশেষে চুক্তিভুক্ত রাষ্ট্র সমূহের মধ্যে সম্মতি প্রদান অন্তে চুক্তিটি কার্যকরীতা লাভ করে।

পদ্ধতিসমূহ

১. **প্রতিনিধির উপর পূর্ণ ক্ষমতা অর্পণ (Accrediting and Full Powers of Representatives):** আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রত্যেক রাষ্ট্রই নিজ নিজ দেশের একজন প্রতিনিধিকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পূর্ণক্ষমতা প্রদান করে।

২. **আলাপ আলোচনা ও সম্মতি (Negotiations and consent) :** কোন চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে অবশ্যই রাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধিবর্গ আলাপ আলোচনা করে নেয় অর্থাৎ চুক্তিটি তাদের দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক কতটুকু উন্নত করবে। অর্থাৎ রাষ্ট্রগুলোর নিজেদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় অবশ্যই বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে চুক্তিটি সম্পাদন করতে সম্মতি দেয়।

৩. **স্বাক্ষর দান (Signature) :** একটি চুক্তি সম্পাদনের জন্য আলাপ আলোচনা শেষে যখন সর্বসম্মতিতে উপনীত হয় তখন চুক্তির চূড়ান্ত খসড়া প্রণয়ন করে উহা স্বাক্ষরের জন্য প্রেরণ করা হয়। স্বাক্ষর দানের মাধ্যমে চুক্তিটি চূড়ান্ত রূপ লাভ করে।

৪. **অনুসমর্থন (Ratification) :** কোন একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি স্বাক্ষর হওয়ার পরপরই সকল ক্ষেত্রে তা কার্যকর হয় না। কোন কোন ক্ষেত্রে চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর স্বাক্ষরকারী দেশসমূহের আইন সভার মাধ্যমে এই চুক্তির অনুমোদন লাভ করতে হয়। এই অনুমোদন ছাড়া চুক্তিটি উক্ত রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্যতা

হারায়। এই অনুমোদনকেই অনুসমর্থন বা Ratification বলে। সাধারণতঃ বৃটিশ উপনিবেশাধীন সকল রাষ্ট্রের অনুসমর্থন গ্রহণ বাধ্যতামূলক।

৫. **বিনিময় এবং অনুসমর্থনের দলিলাদি জমা দান (Exchange and Deposit of Instrument of Ratification) :** অনুসমর্থনের দলিলগুলো অবশ্যই পক্ষসমূহের মধ্যে বিনিময়যোগ্য হতে হবে এবং যতোক্ষণ পর্যন্ত দলিলগুলো তাদের নিকট বিনিময় না হবে ততোক্ষণ পর্যন্ত চুক্তিটি কার্যকর বলে বিবেচিত হবে না।

৬. **আনুষ্ঠানিকভাবে তৃতীয় কোন রাষ্ট্রের যোগদান (The formal entrance of a third state) :** কোনো তৃতীয় রাষ্ট্র সম্মতি প্রকাশের দ্বারা কোন চুক্তির পক্ষ হতে পারে। মূল পক্ষসমূহের সম্মতিক্রমেই একটি তৃতীয় রাষ্ট্র কেবল ঐ চুক্তির পক্ষ হিসেবে যোগদান করতে পারে।

৭. **শর্ত সংরক্ষণ (Reservation) :** কখনো কখনো এমন হতে পারে যে, চুক্তির কোন একটি পক্ষ, চুক্তির নীতি বা মূল বিষয়বস্তুর সাথে একমত হলেও চুক্তির কোন একটি বিষয়ে দায়বদ্ধতা এড়াতে চাচ্ছে। সে ক্ষেত্রে উক্ত রাষ্ট্র ঐ বিধানের উপর শর্ত সংরক্ষণ করতে পারে; অর্থাৎ এই বিধানটির উক্ত রাষ্ট্রের বিপরীতে কোন প্রয়োগযোগ্যতা নেই, তবে শর্ত থাকে যে বিধান সরাসরি চুক্তির মূলনীতির সাথে সম্পর্কিত অথবা যা চুক্তির মূল বিষয়কেই ধারণ করে, সেই বিধানের উপর শর্ত সংরক্ষণ করা যায় না।

৮. **চুক্তি প্রতিপালন (Observance of Treaty) :** যথাযথ ও সর্বাঙ্গীণভাবে প্রতিপালন করা হল চুক্তি সম্পন্ন করার বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেক বলবৎযোগ্য চুক্তি উহার পক্ষসমূহের জন্য অবশ্য পালনীয় এবং চুক্তিভুক্ত পক্ষসমূহ তা সরল বিশ্বাসে কার্যে পরিণত করবে।

৯. **নিবন্ধীকরণ ও প্রকাশনা (Registration & Publication) :** সর্বশেষে অনুসমর্থনের পর সন্ধি চুক্তিটি অবশ্যই আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের বা সংশ্লিষ্ট Depository-এর নিবন্ধনকৃত ও প্রকাশিত হতে হবে।

চুক্তির কার্যকারিতা লাভ

আলোচনা ও চুক্তির খসড়া চূড়ান্তভাবে গৃহীত হবার পর চুক্তিটির কার্যকারিতা লাভ পক্ষরাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক নির্ধারিত হবে। তবে শর্তাবলী সাধারণত চুক্তির টেক্সটেই বর্ণিত থাকে। কোনো একটি চুক্তি সম্পাদনের জন্য আলোচনার পক্ষগণের সম্মতি সাপেক্ষে একটি চূড়ান্ত খসড়া প্রস্তুত শেষে স্বাক্ষর দানের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। তবে স্বাক্ষর দানের পর অনুসমর্থনের মাধ্যমেই চুক্তিটির কার্যকারিতা আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকর হয়। তবে স্বাক্ষর দান করার পরই ধরে নেওয়া হয় যে এতে পক্ষগণের সদিচ্ছা বিদ্যমান।

স্বাক্ষর দানের পর অনুসমর্থন চুক্তির শর্তে উল্লেখ না থাকলে সেক্ষেত্রে চুক্তিটি স্বাক্ষর দানের পরই কার্যকরী হয়। তবে কোন রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ সব চুক্তির ক্ষেত্রে অনুসমর্থনের শর্ত রাখা হয়। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ে চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে পারস্পরিক স্বার্থ রক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি অনুসমর্থনের অপেক্ষা না করে অনতিবিলম্বে কার্যকর করা যায়। এক্ষেত্রে প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে ১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী পর্যায়ে স্বাক্ষরিত গঙ্গার পানি বন্টন চুক্তি যা স্বাক্ষরের সাথে সাথেই কার্যকারিতা লাভ করে।

অনুসমর্থন (Ratification)

চুক্তির অনুমোদন বলতে একাধিক রাষ্ট্রের মধ্যে লিখিত আকারে সম্পাদিত কোন চুক্তির আনুষঙ্গিক স্বীকারোক্তিকে বুঝায়। চুক্তির অনুসমর্থন সম্পর্কে ১৯৬৯ সালের ভিয়েনা কনভেনশনের অনুচ্ছেদ ২ এ বর্ণনা করা হয়েছে যে, অনুসমর্থন, গ্রহণ, যোগদান, অনুমোদন এদের প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে অনুরূপ নামের এমন এক আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদনকে বুঝায় যার দ্বারা একটি রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক স্তরে উক্ত চুক্তি দ্বারা বাধিত হওয়ার সম্মতি প্রদান করে। এরূপ অনুমোদনের মাধ্যমে চুক্তিভুক্ত রাষ্ট্রসমূহ সম্পাদিত চুক্তিটি চূড়ান্তভাবে অনুসমর্থন করা মাত্রই কার্যকর হয়।

অনুসমর্থনের প্রয়োজনীয়তা (Necessity of Ratification)

কোন একটি চুক্তি কার্যকরী করার জন্য অনুসমর্থনের প্রয়োজন আছে কিনা তা চুক্তিভুক্ত পক্ষসমূহই নির্ধারণ করে থাকে। তাদের এ সংক্রান্ত কোন ইচ্ছা চুক্তির টেক্সটে বা আলাদা ঘোষণার দ্বারা প্রকাশ করে। এমনকি রাষ্ট্রের পক্ষ হয়ে কে চুক্তিটি অনুসমর্থন করবে তা রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারাই নির্ধারিত হয়ে থাকে। তবে সাধারণত: রাষ্ট্র প্রধান এই কাজটি করে থাকেন। কোন কোন রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের আগে আইন সভা চুক্তিটি অনুসমর্থন করে। যেমন ইংল্যান্ডের রাজা বা রাণী অনুসমর্থনের কাজটি করেন। তবে চুক্তিতে যদি এমন শর্ত থাকে যেখানে জনগণের অধিকার খর্ব হতে পারে বা সরকারি তহবিলের ব্যয় সংক্রান্ত সেক্ষেত্রে চুক্তিটি অবশ্যই মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রে সিনেটের অনুমোদন প্রেসিডেন্টের অনুমোদনের আগে অবশ্যই প্রয়োজন।

তবে দক্ষিণ এশীয় অনেক দেশে কোন চুক্তির অনুসমর্থনের জন্য পার্লামেন্টের অনুমোদনের প্রয়োজন হয় না। মন্ত্রি পরিষদের উপদেশে রাষ্ট্রপতি অনুমোদনের কাজটি চূড়ান্ত করেন। বাংলাদেশ সংবিধানের ১৪৫ ক অনুচ্ছেদ চুক্তির অনুসমর্থন সংক্রান্ত। এই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে বিদেশের সাথে সম্পাদিত সব চুক্তি রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হবে এবং রাষ্ট্রপতি তা সংসদে পেশ করবেন।

চুক্তির অনুসমর্থনের প্রয়োজনীয়তা চুক্তির মর্যাদা ও গুরুত্বের খাতিরেই দেখা দেয়। কেননা কোন রাষ্ট্রের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হলে তা দেশের জন্য কতটুকু উপকারে আসবে বা ক্ষতিকর কি না অর্থাৎ জনগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় জড়িত থাকায় বিষয়টি অনুসমর্থনের

তাৎপর্য বহন করে। কেননা বিশ্বে অনেক রাষ্ট্র আছে যারা কোন চুক্তি সম্পাদনের পর তার অনুসমর্থন থেকে বিরত থেকেছে বলে চুক্তিটি কার্যকারীতা লাভ করে নি। চুক্তির অনুসমর্থন প্রয়োজন কারণ -

১. একটি দেশের স্বার্থ বিরোধী চুক্তির জন্য ঐ দেশের সরকার পরিবর্তন হতে পারে। তাই বিষয়টি অনুসমর্থনের পূর্বে আলোচনা পর্যালোচনা এবং পুনঃনিরীক্ষণ করা প্রয়োজন।

২. চুক্তির বিষয়বস্তু যদি রাষ্ট্রীয় স্বার্থের পরিপন্থী হয় তবে তা অনুসমর্থন না করাই শ্রেয়।

৩. গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে জনগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো সম্বন্ধে জনগণের অভিমত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা যদি এমন এক ধরনের চুক্তি সম্পাদিত হল যা জনগণের অধিকারকে ক্ষুণ্ন করে তবে সেটি অনুসমর্থন করা থেকে রাষ্ট্রের বিরত থাকা উচিত।

অনুসমর্থন প্রয়োজন কখন (When Ratification is needed)

যদি কোন একটি চুক্তির মধ্যে এমন কোন আবশ্যকীয় শর্ত থাকে যে, অনুসমর্থনের পরই চুক্তিটি কার্যকারীতা লাভ করবে তখন অনুসমর্থন আবশ্যিক হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ চুক্তিভুক্ত পক্ষসমূহ যদি তাদের সম্মতিতে অনুসমর্থনের বিষয়টি রাখে তবে অনুসমর্থন অবশ্য প্রয়োজনীয়। চুক্তির অনুসমর্থন হল এমন একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে চুক্তিটি স্বাক্ষরের পর কোন না কোন ভাবে সংশ্লিষ্ট পক্ষভুক্ত রাষ্ট্র কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ। যেক্ষেত্রে অনুসমর্থন একটি আবশ্যিক শর্ত সেক্ষেত্রে চুক্তিটি আনুষ্ঠানিকভাবে অনুসমর্থন না করা পর্যন্ত কার্যকর হয় না। তবে অনুসমর্থনের পরেও আরো একটি আনুষ্ঠানিকতা বাকি থাকে চুক্তিটি কার্যকরী হওয়ার ক্ষেত্রে, আর তা হল অনুসমর্থন সংক্রান্ত দলিলপত্র পক্ষদ্বয়ের মধ্যে বিনিময়। আর বহুপাক্ষিক চুক্তিতে অনুসমর্থনের দলিলপত্র নির্ধারিত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে জমা দিলেই চুক্তিটি কার্যকারিতা লাভ করে। কোন রাষ্ট্রের নিজেদের ভূ-খণ্ডে চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে সে রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অনুসমর্থন সংক্রান্ত দলিল জমা দেওয়া হয় কিন্তু জাতিসংঘের অধীনে কোন চুক্তির ক্ষেত্রে তা কনভেনশনসমূহের অনুসমর্থন সংক্রান্ত দলিলপত্র জাতিসংঘ সচিবালয়ে মহাসচিবের অফিসে জমা দিতে হয়।

চুক্তিতে যোগদানকরণ (Accession)

যখন কোন একটি নতুন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তখন সেই একই সময়ে যে সমস্ত পক্ষরাষ্ট্রসমূহ দ্বারা চুক্তিটি সম্পাদিত, স্বাক্ষরিত এবং অনুসমর্থিত হয় তারা চুক্তিটির প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্র। অন্য কোন রাষ্ট্র যদি ঐ চুক্তিতে স্বাক্ষর দানের সময় উপস্থিত হতে না পারে; এমনকি চুক্তিটি কার্যকরী হওয়ার পরও নতুন রাষ্ট্র সেই চুক্তির পক্ষ হতে পারবে। সে জন্য প্রয়োজনীয় ঘোষণার মাধ্যমে এবং আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে যোগদানকরণের (accession) মাধ্যমে

যোগদানকারী রাষ্ট্র পক্ষরাষ্ট্র হিসেবে চুক্তির সমমর্যাদার পক্ষ হতে পারে। তবে কোন রাষ্ট্রের যোগদানকরণে চুক্তিটি সম্পাদনকারী প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রসমূহের সম্মতি থাকতে হবে, অন্যথায় যোগদানকরণের মাধ্যমে কোন চুক্তির পক্ষ হওয়া সম্ভব নয়। আর এই মাধ্যমে বা পদ্ধতিতে কোন একটি সম্পাদিত চুক্তির পক্ষ হওয়া বহু মাত্রিক চুক্তির ক্ষেত্রে কনভেনশনে যোগদানকরণ সংক্রান্ত বিধানের ভিত্তিতে এবং প্রয়োজনীয় শর্ত পালনের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

শর্ত সংরক্ষণ (Reservation)

১৯৬৯ সালের ভিয়েনা কনভেনশনের দ্বিতীয় বিভাগে অনুচ্ছেদ ১৯ হতে ২৩ পর্যন্ত কোন চুক্তির শর্ত সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিধান বর্ণিত হয়েছে। কোন রাষ্ট্র চুক্তিতে স্বাক্ষর দান উহা অনুসমর্থন, গ্রহণ, অনুমোদন অথবা উহাতে যোগদান করার সময় যদি চুক্তিতে শর্ত সংরক্ষণ নিষিদ্ধ না হয় তবে শর্ত সংরক্ষণ করতে পারে। শর্ত সংরক্ষণ অবশ্যই লিখিত হতে হবে এবং চুক্তিটির পক্ষ হওয়ার যোগ্য সকল রাষ্ট্রকে তা জানাতে হবে। অর্থাৎ শর্ত সংরক্ষণটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রচারিত হতে হবে। শর্ত সংরক্ষণের সময় আপত্তিকর কোন শর্ত প্রত্যাহার করা হলে তা অবশ্যই লিখিতভাবে ব্যক্ত করতে হবে। তবে চুক্তিতে কোন ভিন্নরূপ বিধান না থাকলে, যে বিধানের উপর আপত্তি প্রকাশ করে শর্ত সংরক্ষণ করা হয়েছিল, যে কোন সময় তার উপর থেকে 'শর্ত সংরক্ষণ' প্রত্যাহার করা যাবে।

১৮৫৬ সালের প্যারিস ঘোষণা (Declaration of Paris) এরূপ একটি শর্ত সংরক্ষণমূলক ঘোষণা চুক্তি ছিল যার দ্বারা আন্তর্জাতিক নদী দানিয়ুবের উপর উপকূলবর্তী রাষ্ট্রগুলোর একচেটিয়া (Monopoly) অধিকারের বিলুপ্তি ঘোষণা করা হয়। এই প্যারিস চুক্তির মাধ্যমেই দানিয়ুব নদীর উপর সর্বপ্রথম অন্য সব রাষ্ট্রের স্বাধীন নৌ চলাচলের অধিকার স্বীকার করা হয়। পৃথিবীর অনেক দেশ এই ঘোষণায় সম্মতি জ্ঞাপনের মাধ্যমে এবং শর্ত সংরক্ষণ সাপেক্ষে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়।

কোন চুক্তির শর্ত সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ঐ শর্তগুলো পক্ষরাষ্ট্র কর্তৃক স্পষ্টভাবে অনুমোদিত হতে হবে। তাছাড়া চুক্তিটির সামগ্রিক প্রয়োগ নিশ্চিত করণের জন্য সব পক্ষরাষ্ট্র কর্তৃক শর্ত সংরক্ষণ গৃহীত হতে হবে। যদি কোন চুক্তি কোন আন্তর্জাতিক সংগঠনের সাংবিধানিক দলিল হয়, তবে সেই সংগঠনের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চুক্তির শর্ত সংরক্ষণ গৃহীত হতে হবে। নতুন কোন চুক্তিকারী রাষ্ট্র কর্তৃক সংশ্লিষ্ট চুক্তির শর্ত সংরক্ষণ গৃহীত হলে শর্ত সংরক্ষণের রাষ্ট্রটি সেই নতুন রাষ্ট্র সম্পর্কে চুক্তির একটি পক্ষে পরিণত হবে। কোন শর্ত সংরক্ষণের বিরুদ্ধে অপর কোন চুক্তিকারী রাষ্ট্র আপত্তি উত্থাপন করলে তা ঐ রাষ্ট্র ও শর্ত সংরক্ষণকারী রাষ্ট্রের মধ্যে চুক্তিটি বলবৎ করার পূর্বেই তা ব্যাহত করবে না যতক্ষণ না আপত্তিকারী রাষ্ট্র কোন বিপরীত ইচ্ছা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে। কোন চুক্তিকারী রাষ্ট্র চুক্তির সংরক্ষণের পর চুক্তিটির দ্বারা বাধিত হবার সম্মতি প্রকাশের তারিখ থেকে বার মাসের মধ্যে অথবা পরবর্তী কোন নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে যদি রাষ্ট্রটি সেই শর্ত সংরক্ষণের ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন না করে তবে সে ঐ শর্ত সংরক্ষণ গ্রহণ করেছে বলে বিবেচিত হবে।

কোন চুক্তির উদ্দেশ্য, আদর্শ ও মূল বিষয়ের সাথে অসামঞ্জস্য হলে শর্ত সংরক্ষণ গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে, শর্ত সংরক্ষণ চুক্তির পরিপন্থী কি না এটি নির্ণয়ের কোন মানদণ্ড নেই ফলে সমস্যার উদ্ভব হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

১৯৪৮ সালের গণহত্যা কনভেনশনে শর্ত সংরক্ষণ সংক্রান্ত আপত্তি উত্থাপন ও অধিক সংখ্যক রাষ্ট্রের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণের প্রশ্নে অনেক জটিলতা দেখা যায়। আর তা নিরসনে অর্থাৎ শর্ত সংরক্ষণের গ্রহণযোগ্যতা, তার ফলাফলের ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপনের প্রশ্নে আন্তর্জাতিক আদালত রাষ্ট্রসমূহের শর্ত সংরক্ষণের অধিকারকে প্রাধান্য দেয়। তবে ১৯৫১ সালে আন্তর্জাতিক আইন কমিশন চুক্তির অখণ্ডতা ও বিশুদ্ধতার উপর জোর মত দেন এবং শর্ত সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অন্য রাষ্ট্রগুলোর সম্মতি প্রদান অপরিহার্য বলে মত দেয়।

কোন চুক্তির শর্ত সংরক্ষণে বহুমাত্রিক চুক্তির ক্ষেত্রেই বেশি জটিলতা পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু কম সংখ্যক রাষ্ট্রের মধ্যে শর্ত সংরক্ষণ অনেকটা সহজ। শর্ত সংরক্ষণের এসব জটিলতা থাকায় সম্প্রতি কোন কোন রাষ্ট্র স্বাক্ষর দান, অনুসমর্থন বা চুক্তিতে যোগদানের মাধ্যমে শর্ত সংরক্ষণ না করে চুক্তির কোন বিশেষ বিধান সম্পর্কে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে ব্যাখ্যা দ্বারা ঐ চুক্তি নিজস্ব রাষ্ট্রে প্রয়োগ করতে চায়।

চুক্তি নিবন্ধকরণ ও প্রকাশনা (Registration & Publication)

১৯৬৯ সালের ভিয়েনা কনভেনশনের ৮০ অনুচ্ছেদে চুক্তির নিবন্ধীকরণ ও প্রকাশনা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, কোন চুক্তি বলবৎ হবার পর ক্ষেত্র মতো নিবন্ধীকরণ অথবা নথিভুক্তকরণ ও লিপিবদ্ধকরণ ও প্রকাশনার জন্য জাতিসংঘের সচিবালয়ে উহা প্রেরণ করতে হবে। তবে জাতিসংঘ সনদে (UN Charter) চুক্তি সংক্রান্ত একটি নতুন বিধি যোগ হয়েছে। সনদের ১০২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সদস্য রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক সম্পাদিত সব আন্তর্জাতিক চুক্তি যথাসম্ভব শীঘ্র জাতিসংঘের সচিবালয়ে রেজিস্ট্রি বা নিবন্ধন করতে হবে। সচিবালয় নিবন্ধনকৃত সব চুক্তির প্রকাশনার ব্যবস্থা করবে। চুক্তি নিবন্ধন না হলে এই অনুচ্ছেদ অনুসারে চুক্তির পক্ষ রাষ্ট্রসমূহ জাতিসংঘের কোন অঙ্গ বা অঙ্গ সংস্থায় যেমন–আন্তর্জাতিক আদালত, সাধারণ পরিষদ বা নিরাপত্তা পরিষদে আত্মপক্ষ সমর্থনের সময় চুক্তির কোন উদ্ধৃতি বা রেফারেন্স দিতে পারবে না। তবে চুক্তির নিবন্ধন বা প্রকাশনা না হলে যে চুক্তিটি বাতিল বা এর কার্যকারীতা নষ্ট হবে তা নয়। জাতিসংঘের অঙ্গ সংগঠন ব্যতীত অন্য যে কোন ফোরামে পক্ষ রাষ্ট্রগুলো চুক্তির উদ্ধৃতি বা রেফারেন্স দিতে পারবে।

চুক্তি ও তৃতীয় পক্ষ (Treaty & Third State)

কোন চুক্তি কোন তৃতীয় রাষ্ট্রের সম্মতি ছাড়া সেই রাষ্ট্রের জন্য কোন বাধ্যবাধকতা অথ অধিকার সৃষ্টি করে না। তবে তৃতীয় কোন রাষ্ট্রের বাধ্যবাধকতা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যখন রাষ্ট্রসমূহ সম্মতি প্রদান করে এবং তৃতীয় রাষ্ট্রও লিখিত আকারে স্পষ্টভাবে উক্ত বাধ্যবা

স্বীকার করলেই তৃতীয় রাষ্ট্রের উপর চুক্তিটির বিধান বাধ্যকর হবে। আন্তর্জাতিক আইনে Pacta tertis nec nocent nec prosunt এই ল্যাটিন প্রবচনটি আন্তর্জাতিক প্রথা আইনে সুপ্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ কোনো চুক্তি কোনো তৃতীয় রাষ্ট্রের সম্মতি ব্যতীত সেই রাষ্ট্রের জন্য কোনো বাধ্যবাধকতা অথবা অধিকার সৃষ্টি করে না। এই নীতিটি ১৯৬৯ সালের জেনেভা কনভেনশনের চতুর্থ বিভাগে অনু : ৩৪ হতে ৩৮ পর্যন্ত বর্ণনা করা হয়েছে।

কোনো চুক্তির পক্ষসমূহের উদ্দেশ্য যদি চুক্তিটির বিধান দ্বারা তৃতীয় রাষ্ট্র বা তৃতীয় রাষ্ট্র যে রাষ্ট্রগোষ্ঠীর সদস্য সেই রাষ্ট্র গোষ্ঠীকে বা সব রাষ্ট্রকে অধিকার প্রদান করা হয় এবং এতে যদি তৃতীয় রাষ্ট্র সম্মতি প্রদান করে তবে চুক্তিটির সেই বিধান হতে অনুরূপ কোন তৃতীয় রাষ্ট্রের অধিকারের উদ্ভব ঘটবে। তবে তৃতীয় রাষ্ট্রের চুক্তির কোন বাধ্যবাধকতা বা অধিকার অন্য সব পক্ষরাষ্ট্রসমূহের ঐকমত্যে অর্থাৎ সম্মতির মাধ্যমেই তা প্রত্যাহার করা হয়। অনু: ৩৮ অনুসারে আন্তর্জাতিক প্রথার মাধ্যমে কোন তৃতীয় রাষ্ট্রের জন্য কোনো চুক্তির বিধি বাধ্যতামূলক। অর্থাৎ যে সমস্ত বহুপাক্ষিক চুক্তি প্রথাভিত্তিক আন্তর্জাতিক আইনের বিধান প্রতিফলন বা ধারণ করে তা অবশ্যই তৃতীয় পক্ষের জন্যও বাধ্যতামূলক। তাহলে বলা যায় চুক্তি দ্বারা নয় বরং প্রথা দ্বারাই তৃতীয় কোনো পক্ষ বাধ্য। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক প্রথা- যা অনেক সংখ্যক রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত, তৃতীয় কোন রাষ্ট্র তার বাইরে নয়। ১৯২৮ সালের প্যারিসে সম্পাদিত যুদ্ধ নিষিদ্ধকারী ব্রায়ান্ড কেলগো প্যাকট (প্যারিস প্যাকট) একটি বহুপাক্ষিক চুক্তি যেখানে আন্তর্জাতিক আইনের নতুন বিধান তৈরির উদ্দেশ্যে প্রণীত হয় যা তৃতীয় পক্ষের উপরও প্রযোজ্য বলে বিবেচিত হয়। ১৯৪৬ সালে নূরেমবার্গ ট্রাইবুনালে যে রায় দেওয়া হয় এটি সবার জন্যই বাধ্যতামূলক বিবেচিত হয়েছে। অতএব আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বিভিন্ন সময়ে বহুপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে যা সার্বজনীনভাবে সবার জন্য বাধ্যতামূলক। এক্ষেত্রে প্রথমেই উল্লেখ করা যায় জাতিসংঘ সনদের কথা।

চুক্তির ব্যাখ্যা (Interpretation of Treaty)

চুক্তির ব্যাখ্যা একটি অপরিহার্য বিষয় কেননা ব্যাখ্যার মাধ্যমেই চুক্তির প্রকৃত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিরূপণ করা সম্ভব। অর্থাৎ কোনো চুক্তি কোন ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি দ্বারা সম্পাদিত হয়েছিল, কি পরিস্থিতিতে তা সম্পাদিত হয়- সেক্ষেত্রে চুক্তির বিধানগুলোতে প্রতিনিধিগণ প্রকৃতপক্ষে কি বোঝাতে চেয়েছেন, সেজন্যই চুক্তিটির ব্যাখ্যা আবশ্যক।

চুক্তি হচ্ছে রাষ্ট্রের ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ, কিন্তু সব ইচ্ছাই স্পষ্ট নয়। তাই বিভিন্ন কারণে চুক্তির ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। যেমন-

১. ভাষার অস্পষ্টতা দূরীকরণের জন্য;

২. চুক্তির ধারাসমূহের মধ্যে অসংগতি রোধ করার জন্য;

৩. একই ধরনের সমস্যা নিয়ে একাধিক চুক্তির মধ্যে সংঘাত বা জটিলতা রোধ কল্পে;

৪. ভাষার অসম্পূর্ণতা ও অনির্দিষ্টতা ও চুক্তির কোন নির্দিষ্ট বিষয় প্রয়োগজনিত অসুবিধা দূরীকরণের জন্য;

৫. ভাষার বহুমাত্রিক ব্যবহারে অর্থাৎ একই শব্দের দেশ ভেদে বিভিন্ন ব্যবহার ও বিভিন্ন ভাষায় সম্পাদিত চুক্তির ধারাগুলোর মধ্যে অর্থের সমন্বয় করে স্বচ্ছতা আনয়নের প্রয়োজনে;

৬. যখন বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে চুক্তির বিষয়বস্তু বা বিধান নিয়ে জটিলতার সৃষ্টি হয় তা নিরসনের জন্য ব্যাখ্যার প্রয়োজন।

তবে উপরের কারণগুলো পর্যাপ্ত নয়। চুক্তির সঠিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য এবং চুক্তিটি সর্বজনগ্রাহ্য হবে- এই আশায় চুক্তির বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যা অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়ে। যদিও ১৯৬৯ সালের ভিয়েনা কনভেনশনের অনুচ্ছেদ ৩১ হতে ৩৩ চুক্তির ব্যাখ্যা সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন পরিলক্ষিত হয় কিন্তু একে চুক্তির ব্যাখ্যার সুনির্দিষ্ট নীতি ও পদ্ধতি সমন্বিত কোন দলিল বলা যায় না। তারপরও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিভিন্ন রাষ্ট্র চুক্তি ব্যাখ্যার জন্য যে পদ্ধতি ও নীতি অনুসরণ করে তার মধ্যে যথেষ্ট মিল রয়েছে। অর্থাৎ চুক্তির বিভিন্ন পক্ষ একই নীতির ভিত্তিতে চুক্তিটি ব্যাখ্যা করে যা যুগ যুগ ধরে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বিকশিত হয়েছে এবং আরো হবে। এক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ আইনের ব্যাখ্যা ও আন্তর্জাতিক চুক্তির ব্যাখ্যার প্রকৃতির যদিও কিছুটা মিল থাকে তারপরও দু'ধরনের ব্যাখ্যা এক রূপ নয়।

কে চুক্তি ব্যাখ্যা করবে

কোনো চুক্তি কে ব্যাখ্যা করবে তা পক্ষরাষ্ট্রসমূহই নির্ধারণ করবে। চুক্তির পক্ষসমূহের নির্ধারিত পদ্ধতির ব্যাখ্যাই নির্ভরযোগ্য এবং তা বাধ্যতামূলক। তবে রাষ্ট্র কোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকে কোন চুক্তি ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা অর্পণ করতে পারে তবে এক্ষেত্রে রাষ্ট্র কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা সংস্থার ব্যাখ্যা বাধ্যতামূলক নয় বরং মতবাদমূলক (doctrinal) ব্যাখ্যা বলা যেতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ- জাতিসংঘের কোন চুক্তির ব্যাখ্যা ICJ (আন্তর্জাতিক আদালতের কাছ থেকে পাওয়া যেতে পারে। আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের (IMF) এর ক্ষেত্রে কোন চুক্তির ব্যাখ্যা Board of Directors করে থাকেন। চুক্তির বিষয়বস্তুর পরিবর্তন ঘটতে পারে তবে সেক্ষেত্রে চুক্তির ব্যাখ্যারও প্রয়োজন হতে পারে। অর্থাৎ সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে চুক্তির ব্যাখ্যাও প্রয়োজনীয়।

চুক্তির প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যার জন্য চুক্তিভুক্ত রাষ্ট্রসমূহ বিভিন্ন পথের আশ্রয়গ্রহণ করতে পারে। যৌথ ঘোষণা দ্বারা বা ব্যাখ্যা সংক্রান্ত কোন প্রোটোকল (Protocol) সই করে তা চুক্তির সংযোজনী হিসেবে যুক্ত করতে পারে। তবে পক্ষসমূহ তাদের প্রতিনিধিদের ব্যাখ্যাও গ্রহণ করতে পারে তবে কোন পক্ষের সম্মতি ছাড়া অন্য পক্ষের ব্যাখ্যা আরেকজনের উপর

বাধ্যকর নয়। জাতিসংঘের সাধারণ ও নিরাপত্তা পরিষদ জাতিসংঘ সনদের ব্যাখ্যা করে যা জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলো মানতে বাধ্য।

চুক্তি ব্যাখ্যার নীতিসমূহ

চুক্তি ব্যাখ্যা করার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রসমূহের দীর্ঘ দিনের ব্যবহারের ভিত্তিতে বিভিন্ন নীতি উদ্ভাবিত হয়েছে যেগুলোর প্রকৃতি অভিন্ন। এমন সব নীতির কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হল :

১. চুক্তির ব্যাখ্যা অবশ্যই আন্তর্জাতিক আইনের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ হবে না। এই ব্যাখ্যা আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

২. চুক্তির ব্যাখ্যা সৎ ও সরল বিশ্বাসে (Utmost good faith) করতে হবে।

৩. চুক্তির সময় চুক্তির যে অর্থ বা ব্যাখ্যা প্রকাশ পায় ব্যাখ্যার সময়ও চুক্তির অর্থ অভিন্ন হতে হবে।

৪. চুক্তির ব্যাখ্যা এমন হবে যা মূল বিষয়বস্তুর থেকে ভিন্নতর যেন না হয় এবং ব্যাখ্যা যেন অপর রাষ্ট্রের অধিকারকে ক্ষুণ্ন না করে।

৫. চুক্তির এমন ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয় যা অসম্ভব এবং অবাস্তব ফলাফল সৃষ্টি করে কোন চুক্তি অকার্যকর করে ফেলে।

৬. চুক্তির কোন ধারার অর্থের স্পষ্টতা আনয়নের জন্য ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে পক্ষসমূহের মধ্যে পূর্বে সম্পাদিত অন্য কোন চুক্তি বা একটি পক্ষের সাথে তৃতীয় কোন পক্ষের সম্পাদিত চুক্তির রেফারেন্স দেয়া যাবে।

৭. কোন চুক্তিতে ভাষাগত বিকল্প থাকলে অর্থাৎ মাত্র একটি বা একাধিক ভাষায় অনুবাদ করে ব্যাখ্যা করার বিধান না থাকলে চুক্তিটি অন্য ভাষায় ব্যাখ্যা করা যাবে না। যেমন – UN Charter ৬টি ভাষায় অনুদিত হয় যা সংবিধিবদ্ধ। সুতরাং জাতিসংঘ সনদকে ব্যাখ্যা করার জন্য ঐ ৬টি স্বীকৃত ভাষায়ই (ইংরেজি, রুশ, আরবি, ফরাসি, স্পেনিশ, চাইনিজ) ব্যাখ্যা করতে হবে।

তরাং চুক্তিসমূহের ব্যাখ্যায় উপরোল্লিখিত নীতিগুলো সাধারণ বুদ্ধির বহিঃপ্রকাশ। চুক্তি ব্যাখ্যার জন্য কোন নীতি আন্তর্জাতিক দলিলে লিপিবদ্ধ নেই। কিন্তু যুগে যুগে বিভিন্ন ট্রসমূহের দ্বারা উল্লেখিত নীতিগুলো চুক্তির ব্যাখ্যায় প্রয়োগ হওয়ায় তা আজ সর্বজনগ্রাহ্য।

ব্যাখ্যার পদ্ধতি

চুক্তির ব্যাখ্যার জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্র তাদের নিজস্ব ভঙ্গিমায় যদিও কাজটি সম্পন্ন করে থাকে

তারপরও চুক্তিকে ব্যাখ্যা করার নিম্নলিখিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি রয়েছে। সেগুলো হল :

১. **আক্ষরিক ব্যাখ্যা (Grammatical or Literal Interpretation) :** আক্ষরিক বা ব্যাকরণিক ব্যাখ্যা মূলত চুক্তির টেক্সটে যা লিপিবদ্ধ থাকে তার ব্যাখ্যাকে বুঝায়। মূলত চুক্তি যে ভাষায় রচিত হয়– সেই ভাষার সুন্দর ও সাবলীল অর্থ উদ্ভাবন একান্ত জরুরি। চুক্তিটি সঠিক অর্থে ব্যাখ্যা করার জন্য চুক্তিতে ব্যবহৃত শব্দ, বাক্যগুলোর সুন্দর ও সঠিক বিশ্লেষণ দরকার–এর বাইরে (টেক্সটের) যাওয়ার প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ যেহেতু চুক্তি হচ্ছে পক্ষ রাষ্ট্রের ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ তাই চুক্তিটিতে ব্যবহৃত শব্দ, বাক্য বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যাই চুক্তির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উদ্ঘাটনে পর্যাপ্ত, এর বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

২. **ভাবগত ব্যাখ্যা (Subjective Interpretation) :** আন্তর্জাতিক চুক্তির ক্ষেত্রে ভাবগত ব্যাখ্যার প্রবক্তা হচ্ছে আন্তর্জাতিক আইনের প্রবর্তক হুগো গ্রোসিয়াস (Hugo Grotius)। এই ধরনের ব্যাখ্যার মূল লক্ষ্য হচ্ছে চুক্তিভুক্ত পক্ষসমূহের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটানো। সে জন্য চুক্তির টেক্সটের বাইরে গিয়ে কোন চুক্তিকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। যদিও বলা হয় ভাষার মাধ্যমে সবকিছু প্রকাশ করা যায় কিন্তু চুক্তিতে যে ভাষা থাকে তাতে চুক্তির অর্থ সম্পূর্ণ রূপে প্রতিফলিত নাও হতে পারে। তাই চুক্তির টেক্সটের বাইরের উৎসও প্রয়োজন। ভাবগত ব্যাখ্যায় যারা বিশ্বাসী তাদের মতে চুক্তির টেক্সট ছাড়াও চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তুতিমূলক কাগজপত্র (Travaux preparatoire), চুক্তি সম্পাদনের পর পক্ষসমূহের আচরণ, সংশ্লিষ্ট কোন ঘটনা, আন্তর্জাতিক আইনের বিভিন্ন বিধানের সঙ্গে সাদৃশ্য, চুক্তির প্রাথমিক উদ্দেশ্য ইত্যাদি চুক্তির ব্যাখ্যার জন্য অপরিহার্য উপাদান। ভাবগত ব্যাখ্যার সাম্প্রতিক প্রবক্তা হচ্ছেন এইচ. লটারপ্যাক্ট। তিনি চুক্তির প্রস্তুতিমূলক কাগজপত্রের উপরই বেশি নির্ভর করতে চান। তার মতে চুক্তির কোন ব্যাখ্যার জন্য প্রস্তুতিমূলক কাগজপত্র ব্যবহার করে একটি স্পষ্ট অর্থ বের করে আনার জন্য ভাবগত ব্যাখ্যা বাধ্যতামূলক। আন্তর্জাতিক আদালত এমনকি ভিয়েনা কনভেনশনের অনু: ৩২ travaux preparatoires এর উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে।

৩. **উদ্দেশ্যগত ব্যাখ্যা (Teleological Interpretation) :** এই ধরনের ব্যাখ্যার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে গতিশীলতা অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে চুক্তিটি ফলপ্রসূ ও কার্যকরভাবে প্রয়োগ করার উপরই উদ্দেশ্যগত ব্যাখ্যা জোর দেয়। কেননা সময়ের সাথে সাথে চুক্তির টেক্সটের প্রাথমিক উদ্দেশ্যের সাথে বর্তমান সাধারণ উদ্দেশ্যের বৈপরীত্য দেখা দিতে পারে। এই পদ্ধতির ব্যাখ্যায় অবাধ স্বাধীনতা রয়েছে যা সব সময় শুভ নাও হতে পারে। উদ্দেশ্যগত ব্যাখ্যার প্রবক্তা বলা চলে আন্তর্জাতিক

আদালতের প্রাক্তন বিচারপতি আলভারেজ ও আসেভেদো। তাঁদের মতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক দ্রুত পরিবর্তনশীল, গতিশীল এবং পরিস্থিতি দ্রুত পাল্টাচ্ছে। এ অবস্থায় ব্যাখ্যাকারীগণ টেক্সটের ক্রীতদাস হয়ে থাকবে না। অর্থাৎ দ্রুত পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সাথে সঙ্গতি রেখে চুক্তির সাধারণ ও চূড়ান্ত লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য ব্যাখ্যাকে যথাসম্ভব উদারনৈতিক করতে দিতে হবে।

৪. **যৌক্তিক ব্যাখ্যা (Logical Interpretation) :** প্রত্যেকটি কাজের জন্যই যুক্তি অত্যাবশ্যকীয়, কিন্তু যুক্তি অবশ্যই যৌক্তিক হতে হবে। কোন চুক্তির ব্যাখ্যা তখনই যৌক্তিক হবে যখন ব্যাখ্যাটি হবে বাস্তব সম্মত, দূরদর্শী এবং প্রগতিশীল। যৌক্তিক ব্যাখ্যা কোন একটি চুক্তির অসামঞ্জস্যতা পরিহারের জন্যও প্রয়োজন। আইন বিশারদ রাদার ফোর্ড ও ফিলিমোর মনে করেন, প্রথমে পক্ষসমূহের অভিপ্রায় চুক্তির টেক্সটেই খুঁজতে হবে। তবে টেক্সটে অস্পষ্টতা থাকলে চুক্তির বিভিন্ন অংশের সঙ্গে তুলনা শুধু নয় বরং চুক্তি সম্পাদনের পরিস্থিতি, চুক্তির সাধারণ লক্ষ্য, চুক্তির সাধারণ বিধি ব্যাখ্যার সাধারণ নীতি ইত্যাদি সব নীতি বা পদ্ধতির আশ্রয় নিয়ে যৌক্তিক ব্যাখ্যায় উপনীত হতে হবে। ভিয়েনা কনভেনশনের চুক্তির ব্যাখ্যা সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ (৩১-৩৩) মূলত যৌক্তিক ব্যাখ্যার দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রতিফলন।

চুক্তির বৈধতা (Validity of Treaty)

আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদিত হয় যার উদ্দেশ্য থাকে চুক্তিটির বৈধতার জন্য এবং তা কার্যকারীতা লাভ করে সেই লক্ষ্যেই। তবে চুক্তিটি অবশ্য আইন সম্মত হতে হবে। কোনো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ চুক্তি যেমন বিভিন্ন কারণে বাতিল হয় তেমনি আন্তর্জাতিক চুক্তিও অবৈধ ও বাতিল ঘোষিত হতে পারে। এক্ষেত্রে চুক্তিভুক্ত পক্ষসমূহ চুক্তিটি বাতিল বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার রাখে। তবে সবসময় রাষ্ট্রসমূহের দ্বারা অবৈধ ঘোষণার বা প্রত্যাখ্যানের প্রয়োজন পড়ে না, কেননা আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে চুক্তি অবৈধ হতে পারে যার দরুণ পক্ষসমূহ চাইলেও চুক্তিটির কোন কার্যকারিতা থাকবে না। ১৯৬৯ সালের ভিয়েনা কনভেনশনের দ্বিতীয় ভাগে (অনু: ৪৬-৫৩) চুক্তির অবৈধতার উপাদানসমূহের কথা বর্ণিত হয়েছে। তবে সেগুলো সম্পূর্ণ (exhaustive) নয়, অর্থাৎ চুক্তি অবৈধ হওয়ার আরও অনেক কারণ থাকতে পারে। চুক্তির অবৈধতার মূল কারণ সমূহ :

১. **চুক্তি সম্পাদনের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির ক্ষমতার অপব্যবহার (Ultra vires) :** কোন প্রতিনিধি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ আইনের বিধান লঙ্ঘন করে চুক্তি সম্পাদন করলে সাথে সাথেই চুক্তিটি বাতিল করা যাবে না। তবে ঐ চুক্তিতে যদি অভ্যন্তরীণ আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন দেখা যায় এবং যদি কোন মৌলিক অভ্যন্তরীণ আইনের লঙ্ঘন হয় তবে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র তা বাতিলের অধিকার রাখে।

যদি কোন রাষ্ট্র তাদের প্রতিনিধিদের উপর চুক্তি সম্পাদনের জন্য প্রদত্ত ক্ষমতার ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ আরোপ করে অর্থাৎ ক্ষমতার সীমা নির্ধারণ করে দেয় এবং সেই রাষ্ট্র যদি অন্যান্য আলোচনাকারী রাষ্ট্রকে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে তাদের প্রতিনিধিদের ক্ষমতার বিধি নিষেধ সম্পর্কে অবহিত করে, তবেই কেবল যদি প্রতিনিধিরা তাদের ক্ষমতার বাইরে কোন চুক্তি সম্পাদন করলে রাষ্ট্রটি চুক্তির সম্মতি বাতিল করতে পারবে। তবে সীমা লঙ্ঘন করা সত্ত্বেও কোন রাষ্ট্র তার একক ইচ্ছার মাধ্যমে চুক্তিটি মেনে নিতে পারে।

২. **ভুল (Error) :** কোন পক্ষ রাষ্ট্র যদি ভুলবশত মনে করে যে, কোন ঘটনা অথবা পরিস্থিতি চুক্তির সময় বিদ্যমান আছে এবং ঐ ঘটনা বা পরিস্থিতি চুক্তিটিতে সম্মতি দানের মূলভিত্তি তবে রাষ্ট্রটি ঐ চুক্তির দায় থেকে মুক্ত হতে পারে। তবে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রটি যদি নিজের আচরণ দ্বারাই ভুলটির ক্ষেত্রে অবদান যুগিয়ে থাকে অথবা অবস্থা এমন ছিল যে, সম্ভাব্য ভুল সম্পর্কে অন্য পক্ষদের অবহিত করা তার উচিত ছিল সেক্ষেত্রে চুক্তির দায় থেকে সেই রাষ্ট্র তার সম্মতি বাতিল করবে, অধিকার লাভ করবে না। কোন চুক্তির মূললিপিতে শুধুমাত্র শব্দগত ভুল থাকার জন্য চুক্তিটির বৈধতা ব্যাহত হবে না বরং অনু: ৭৯-এর বিধান অনুযায়ী ভুল সংশোধনের নীতি প্রযোজ্য হবে।

৩. **প্রতারণা (Fraud) :** যদি কোন রাষ্ট্র অপর কোন আলোচনাকারী রাষ্ট্রের প্রতারণামূলক আচরণ দ্বারা কোন চুক্তি সম্পাদনে সম্মত হয় তবে রাষ্ট্রটি সেই প্রতারণা সম্পর্কে অবগত হলে চুক্তিতে তার সম্মতি প্রদান বাতিল ঘোষণা করতে পারে।

৪. **দুর্নীতি (Corruption) :** যদি কোনো রাষ্ট্রের প্রতিনিধিকে অপর কোন আলোচনাকারী রাষ্ট্র প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত করে চুক্তিতে সম্মতি আদায় করে তবে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র দুর্নীতির জন্য চুক্তিটি বাতিল করতে পারে।

৫. **অবৈধ বল প্রয়োগ (Coercion) :** কোনো রাষ্ট্রের প্রতিনিধিকে জোরপূর্বক বা হুমকির মাধ্যমে অপর কোন রাষ্ট্র কোন চুক্তি সম্পাদনে বাধ্য করে তবে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র চুক্তির সম্মতি অবৈধ ঘোষণা করার অধিকারী। জাতিসংঘের সনদের অন্তর্ভুক্ত আন্তর্জাতিক আইনের নীতিসমূহ লঙ্ঘন করে বল প্রয়োগের হুমকি অথবা সরাসরি বল প্রয়োগ দ্বারা কোন চুক্তি সম্পাদিত হলে সেই চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে।

৬. **আন্তর্জাতিক আইনের মূলনীতির (Jus Cogens) সঙ্গে বিরোধ :** কোন চুক্তি সম্পাদন যদি সাধারণ আন্তর্জাতিক আইনের অবশ্যপালনীয় বিধানের সাথে বিরোধপূর্ণ হয় তবে তা প্রথম হতেই বাতিল (void ab initio) ও অবৈধ বলে গণ্য হবে। তবে কিছু ক্ষেত্রে পক্ষ রাষ্ট্র ইচ্ছা করলে চুক্তিটি গ্রহণ করতে পারবে কিন্তু

আন্তর্জাতিক আইনের মূলনীতির (Jus Cogens) পরিপন্থী কোন চুক্তি সরাসরি বাতিল। তবে ভিয়েনা কনভেনশনের উদ্দেশ্য সাধন কল্পে সাধারণ আন্তর্জাতিক আইনের অবশ্যপালনীয় নিয়ম বলতে সমগ্র আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রসমাজ কর্তৃক গৃহীত ও সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত নিয়মকে বুঝায় যা থেকে কোন বিচ্যুতি চলবে না কিন্তু একই প্রকৃতির আন্তর্জাতিক আইনের কোন সর্বজনগ্রাহ্য নিয়ম পরবর্তী নিয়ম দ্বারা পরিবর্তন করা যাবে।

আন্তর্জাতিক আইনে এমনি কয়েকটি Jus Cogens গুলো হল :

১. Pacta Sunt Servanda
২. জাতিসংঘ সনদের অনু: ২
৩. চুক্তি সম্পাদনে কোনো রকম বল প্রয়োগ করা যাবে না
৪. মানবাধিকার (Human Rights), বিশেষ করে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ইত্যাদি।

চুক্তির অবসান (Termination)

কোন একটি চুক্তি সম্পাদিত হয় নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বা কতিপয় বিশেষ উদ্দেশ্য পূরণের প্রত্যাশায়। সেক্ষেত্রে চুক্তিটিতে বর্ণিত সময় শেষ হলে বা চুক্তির উদ্দেশ্যপূরণ সম্পূর্ণ হলে চুক্তিটির এমনিতেই অবসান ঘটে। তারপরও নিম্নের বর্ণিত কতিপয় কারণ ও পদ্ধতিতে একটি চুক্তির অবসান ঘটতে পারে :

১. **কোন চুক্তির বিধানাবলীর দ্বারা (By Operation of Law) :** কোন চুক্তিতে যদি লিখিত কোন বিধান থেকে থাকে যে নির্দিষ্ট সময়, উদ্দেশ্য পূরণ বা কতিপয় বিশেষ অবস্থার উল্লেখ থাকে যার উদ্ভব ঘটলে চুক্তিটির পরিসমাপ্তি ঘটবে তাহলে সেই সময় অন্তর বা উদ্দেশ্য সাধিত হওয়ার পর বা চুক্তিতে উল্লেখিত ঐ সমস্ত বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটলে চুক্তিটির আইন দ্বারাই পরিসমাপ্তি ঘটবে।

২. **পক্ষসমূহ দ্বারা (By act of Parties) :** কোন চুক্তি সম্পাদন যেমন পক্ষরাষ্ট্রসমূহের ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ তেমনি সম্পাদিত একটি চুক্তির অবসান তাদের ইচ্ছাতেও সম্ভব। অর্থাৎ এক্ষেত্রে পক্ষরাষ্ট্রসমূহ তাদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করে সব রাষ্ট্রের সর্বসম্মতির মাধ্যমে চুক্তির অবসান ঘটাতে পারে।

৩. **চুক্তি স্থগিতকরণ দ্বারা (By Suspension of Operation of Treaty):** যদি কোন কারণে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যেক্ষেত্রে চুক্তিটির কার্যকারিতা স্থগিত হয়ে পড়ে সেক্ষেত্রে চুক্তিটির পরিসমাপ্তি ঘটতে পারে। যেমন চুক্তিভুক্ত পক্ষসমূহের মধ্যে যদি যুদ্ধ বেঁধে যায় তবে স্বভাবতঃই চুক্তিটি তাদের মধ্যে কার্যকারিতা হারায় কিন্তু চুক্তির কার্যকারিতা স্থগিত মানেই চুক্তির পরিসমাপ্তি নয়—যুদ্ধের সমাপন ঘটলে

পক্ষরাষ্ট্রসমূহ আবার পূর্বের চুক্তিটিকে কার্যকরী করতে পারে। তবে যুদ্ধপক্ষসমূহের মধ্যে কোন রাজনৈতিক বা মৈত্রী ও সহযোগিতা চুক্তি হলে তা স্বাভাবিকভাবেই বাতিল হবে। অনুরূপভাবে অনাক্রমণ চুক্তির অবসান ঘটবে। ভূ-খণ্ড হস্তান্তর বা সীমানা নির্ধারণ সংক্রান্ত চুক্তি যুদ্ধের জন্য বাতিল হয় না। যুদ্ধের নিয়মনীতি সম্পর্কিত চুক্তি যেমন ১৯৪৯ সালের জেনেভা কনভেনশন সমূহ যুদ্ধের সময় কার্যকর থাকবে। প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধের সময়ই এই সমস্ত চুক্তির কার্যকারিতার বাস্তব প্রয়োগ দেখা যায়। যুদ্ধের সময় বহিঃসমর্পণ সংক্রান্ত বহুপাক্ষিক চুক্তি থাকলে তা স্থগিত হয়ে যায়।

৪. **চুক্তির বৈধতার মেয়াদ (By the expiration of the validity of Treaty) :** চুক্তিতে উল্লেখিত বৈধতার মেয়াদ শেষ হলে চুক্তিটির পরিসমাপ্তি ঘটে। তবে যদি পক্ষসমূহ ইচ্ছা পোষণ করে যে চুক্তিটির মেয়াদ বৃদ্ধি করবে তবে সর্বসম্মতিতে তা বৃদ্ধি করতে পারবে।

৫. **চুক্তির মূল বিষয়বস্তুর উদ্দেশ্য সাধন :** কোন চুক্তিতে যে সমস্ত মূল বিষয়বস্তু বা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের আকাঙ্ক্ষা থাকে সেগুলো যদি যথাযথভাবে সম্পন্ন হয় তবে চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটবে কিন্তু এক্ষেত্রে স্পষ্ট বিধান থাকবে যে, ঐ সমস্ত লক্ষ্য অর্জনের সঙ্গে সঙ্গেই চুক্তিটির অবসান ঘটবে।

৬. **চুক্তি ভঙ্গের ফলে :** ভিয়েনা কনভেনশনের ৬০ অনুচ্ছেদে চুক্তি ভঙ্গের দরুণ চুক্তির অবসানের বিধান লিপিবদ্ধ রয়েছে। কোন দ্বি-পক্ষীয় চুক্তির কোন একটি পক্ষ যদি চুক্তির বস্তুগত লঙ্ঘন ঘটায় তবে অপর পক্ষ ঐ চুক্তিটির পরিসমাপ্তি ঘটানোর অধিকার রাখে। আবার বহু পাক্ষিক চুক্তির ক্ষেত্রে কোন একটি পক্ষরাষ্ট্র কর্তৃক চুক্তির লঙ্ঘন ঘটলে অন্য পক্ষসমূহ সর্বসম্মতিতে চুক্তিটি বাতিল করতে পারে।

৭. **সাধারণ আন্তর্জাতিক আইনের (Jus Cogens) পরিপন্থী হলে :** ভিয়েনা কনভেনশনের ৬৪ অনুচ্ছেদ অনুসারে যদি কোন চুক্তি সাধারণ আন্তর্জাতিক আইনের কোনো নতুন সুনিশ্চিত নিয়মের পরিপন্থী হয় তবে চুক্তিটি বাতিল হয়ে যাবে এবং উহার পরিসমাপ্তি ঘটবে।

৮. **অবস্থার পরিবর্তনে চুক্তি পালনের দায়িত্বের অবসান (Rebus Sic Stantibus) :** Rebus Sic Stantibus নীতিটি রোমান আইন হতে উদ্ভূত যা আন্তর্জাতিক আইনে স্ববিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই নীতির ভিত্তিতে চুক্তির অত্যাবশ্যকীয় কোন মৌলিক অবস্থার পরিবর্তন বা অবসান ঘটলে চুক্তিটি তখনই বাতিলযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। এটি একটি মতবাদ যার মূল কথা হল কোন সম্পাদিত চুক্তির স্থিতাবস্থা সর্বক্ষেত্রেই অপরিবর্তনীয় অর্থাৎ সম্পাদিত এরূপ সব ধরনের চুক্তির ক্ষেত্রে এমন একটি অব্যক্ত বা অপ্রকাশিত শর্ত বলবৎ থাকে এবং চুক্তিটি ঐ অবস্থার

প্রেক্ষিতেই সম্পাদিত হয়েছে সেক্ষেত্রে সেই অবস্থার কোন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটবে না। মতবাদটির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, যে সব পরিস্থিতির ভিত্তিতে চুক্তিটি সম্পাদিত এবং অনুমোদিত, অনুরূপ পরিস্থিতির মৌলিক কোন পরিবর্তন সাধিত হলে চুক্তিটি বাতিল হবে এবং ঐ চুক্তির সমস্ত বাধ্যবাধকতা ও দায় দায়িত্বের অবসান ঘটবে।

তবে অবস্থার পরিবর্তনে চুক্তি সর্বদাই বাতিল হবে না যদি চুক্তিটিতে কোন রাষ্ট্রীয় সীমানা নির্দেশ করা থাকে এবং চুক্তির যে পক্ষ মৌলিক পরিবর্তনকে কারণ হিসেবে ব্যবহার করতে চায় যদি সেই পক্ষ দ্বারা চুক্তির অধীনে কোন দায়িত্ব অথবা চুক্তির অপর কোন পক্ষের প্রতি অন্য কোন আন্তর্জাতিক দায়িত্ব লঙ্ঘনের ফলে অনুরূপ পরিবর্তন ঘটে। এক্ষেত্রে চুক্তিটির কার্যকারিতা স্থগিত থাকতে পারে।

কোন চুক্তি যখন করা হয় তখন ধরেই নেওয়া হয় যে, চুক্তিতে বিশেষ অব্যক্ত শর্ত থাকে যে, যে অবস্থার ভিত্তিতে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে সে অবস্থা অব্যাহত থাকলেই শুধু চুক্তি কার্যকর থাকবে। এই রূপ অব্যক্ত মতবাদ সম্পর্কে যদি চুক্তিভুক্ত পক্ষগণের মধ্যে কোন মতবিরোধ দেখা দেয় তবে মতবাদটি সেক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে কি না, তা জাতিসংঘের নির্বাহী সংস্থা কিংবা আন্তর্জাতিক আদালতের রায় দ্বারা নির্ধারিত হবে। চুক্তি সম্পর্কিত এই মতবাদগুলি ১৯৬৬ সালের চুক্তি সম্পর্কিত খসড়া আইনের (Law of Treaties) দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে।

এই নীতিটি সব ধরনের চুক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কি না

Rebus Sic Stantibus নীতিটি নিম্নে বর্ণিত পরিবর্তিত অবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে–

১. **রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন (Changes of Political Condition) :** কোন একটি রাষ্ট্রের সহিত অপর কোন রাষ্ট্রের সংযোজন ঘটলে বা অপর কোন রাষ্ট্রের আশ্রিত হয়ে পড়লে অথবা কোন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সার্বিক পরিবর্তন সাধিত হলে ঐ রাষ্ট্রের কোন অঞ্চলের রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন সাধিত হয়েছে বলে বিবেচিত হবে এবং এক্ষেত্রে নীতিটি প্রযোজ্য।

২. **চুক্তির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য পরিবর্তনের ক্ষেত্রে (Changes Affecting Specific Objects of the Treaty) :** কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় পরিস্থিতির এমন পরিবর্তন সাধিত হয়েছে যা চুক্তির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলীর উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। যেমন, নদ নদীর পানি বণ্টন সংক্রান্ত চুক্তির ক্ষেত্রে– কোন নদীর প্রবাহ বা গতিপথ যদি পরিবর্তিত হয়ে যায় অথবা কোন কারণে যদি নদীর স্রোতধারা শুকিয়ে যায় অথবা নদী ভরাট হয়ে যায় তবে সেক্ষেত্রে চুক্তিটির পালন অসম্ভব হয়ে পড়ে, বিধায় চুক্তির প্রয়োগ ও কার্যকারিতা লোপ পাবে। এক্ষেত্রে এই মতবাদটি প্রযোজ্য হবে।

৩. **সরকারের রাজনৈতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন (Changes in the Form of Government.) :** বিশেষ কোন রাজনৈতিক মতাদর্শজনিত কারণে সরকারি কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাঠামো যদি পরিবর্তিত হয় তবে সেক্ষেত্রে বলা যায় মৌলিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। তাই চুক্তিটির পালন অসম্ভব। সুতরাং মতবাদটি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে অর্থাৎ চুক্তিটির পরিসমাপ্তি ঘটতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৯৬৯ সালের ভিয়েনা কনভেনশনের অনুচ্ছেদ ৬২ তে এই মতবাদটির প্রতিফলন ঘটেছে।

৪. **বাতিল নোটিশ (Denunciation) :** বাতিল নোটিশের মাধ্যমেও কোন চুক্তিভুক্ত পক্ষ স্বেচ্ছায় চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটাতে পারে। বাতিল নোটিশের বিধান চুক্তিতে উল্লেখ না থাকলে পক্ষসমূহের সম্মতিতে কোন পক্ষ রাষ্ট্র এই অধিকার প্রয়োগ করতে পারে। বহু পাক্ষিক চুক্তিসমূহ বা কনভেনশনে বাতিল নোটিশ অনুচ্ছেদ থাকে এবং ইহা প্রদানের নির্দিষ্ট সময় (সাধারণতঃ এক বছর) পরে কার্যকর হয়। তবে কোন চুক্তি বাতিল নোটিশের মাধ্যমে অবসান ঘটাতে হলে অবশ্যই পক্ষরাষ্ট্রসমূহের সম্মতি প্রয়োজন। কিন্তু অনেকে এমন মতামত পোষণ করেছেন যে, চুক্তির কোন পক্ষের দ্বারা চুক্তির গুরুতর ও ব্যাপক লঙ্ঘন ঘটলে অন্য পক্ষ তা বাতিল করার অধিকারী হবে।

কোন চুক্তি করা, যেমন পক্ষসমূহের ইচ্ছার প্রতিফলন তেমনি চুক্তিবদ্ধ পক্ষসমূহ তাদের সর্বসম্মত মতে কোন চুক্তির স্থগিতকরণ, অবসান, সংযোজন, বিয়োজন কিংবা সংশোধন করার অধিকারী।

বাংলাদেশ সংবিধান ও আন্তর্জাতিক চুক্তি (Bangladesh Constitution and International Treaty)

একটি রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় সব আইন সেই রাষ্ট্রের সংবিধানের অধীন। সংবিধান হচ্ছে একটি জাতির আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। তাই রাষ্ট্র যে ধরনের আইন প্রণয়ন করে সে সমস্ত আইন যদি সংবিধানের সাথে অসামঞ্জস্য পূর্ণ হয় তবে তা বাতিল হবে।

বাংলাদেশের সংবিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আন্তর্জাতিক চুক্তিই কার্যকরী হবে, অসামঞ্জস্যপূর্ণ হলে সেই চুক্তিটি বাতিল হবে। বাংলাদেশ সংবিধানের ২৬ (২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে– ংলাদেশের সংবিধানের পরিপন্থী কোন আইন গ্রহণ বা প্রণয়ন করা যাবে না এবং নুরূপভাবে প্রণীত কোন আইন সংবিধানের সাথে যতটুকু অসামঞ্জস্যপূর্ণ হবে, ততটুকু াতিল বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ বাংলাদেশ সংসদ সংবিধানের পরিপন্থী কোন আইন গ্রহণ

বা প্রণয়ন করতে পারবে না। ঠিক একইভাবে বাংলাদেশের সংবিধানের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি ও দেশের সংসদ অনুমোদন বা গ্রহণ করবে না।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সংবিধানের প্রস্তাবনায় (Preamble) যা বলা হয়েছে তা হচ্ছে, '... মানব জাতির প্রগতিশীল আশা আকাঙ্ক্ষার সাথে সংগতি রক্ষা করে, আমাদেরকে আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে পূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে, সেইজন্য বাংলাদেশের জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তি স্বরূপ সংবিধানের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে।' তাই লক্ষ্য করা যায় যে, বাংলাদেশ সংবিধান সব আন্তর্জাতিক চুক্তি বা চুক্তিতে অংশগ্রহণ করার বা ভূমিকা পালনের তাগিদ দিয়েছে, তবে ঐ চুক্তিতে জাতীয় স্বার্থ ও সংবিধানের উদ্দেশ্যের প্রতিফলন থাকতে হবে। বাংলাদেশ সরকার অবশ্যই আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘ সনদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করবে এবং অন্য রাষ্ট্রের সাথে জাতীয় স্বার্থে চুক্তি সম্পাদন করতে পারবে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৫ এ কথাই বলে।

আবার সংবিধানের ১৪৫ ক অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, বিদেশী কোন রাষ্ট্রের সাথে কোন চুক্তি সম্পাদন করলে অবশ্যই রাষ্ট্রপতির কাছে সেটির জমা দিতে হবে এবং রাষ্ট্রপতি প্রয়োজন মত তা সংসদে উপস্থাপন করবেন। তবে এ ক্ষেত্রে সংসদে উপস্থাপনের উদ্দেশ্য কী, তা আদৌ স্পষ্ট নয়।

কূটনৈতিক ও কনস্যুলার আইন
Diplomatic & Consular Law

কূটনৈতিক আইনের ঐতিহাসিক পটভূমি

বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক রক্ষা করা প্রত্যেক রাষ্ট্রের জন্যই অত্যন্ত প্রয়োজন। রাষ্ট্রসমূহ তাদের স্ব স্ব দেশের কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের সাহায্যেই এই কাজটি সম্পন্ন করে থাকে। আন্তর্জাতিক আইনের অতীব গুরুত্বপূর্ণ এই শাখাটি অতি প্রাচীন ধারণা থেকে এসেছে।

রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে কূটনৈতিক প্রতিনিধি বিনিময়ের প্রথা অতি প্রাচীন। একই ভূ-খণ্ডে পাশাপাশি বিভিন্ন স্বাধীন রাজ্য সৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথেই কূটনীতির প্রয়োজন দেখা দেয়, কেননা তারা অনুভব করে যে কূটনীতির মাধ্যমেই বিভিন্ন স্বাধীন রাজ্যের পক্ষে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব। প্রাচীন যুগে গ্রীসের বিভিন্ন নগর রাষ্ট্রের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। ঐতিহাসিক থুসিডিড (Thucydide) এর লেখায় সেই সম্পর্কের বিবরণ পাওয়া যায়। আধুনিক যুগের মত স্থায়ীভাবে দূত বিনিময়ের প্রথা তখন প্রচলিত ছিল না বটে, কিন্তু বিশেষ কারণে প্রয়োজন হলেই গ্রীসের বিভিন্ন নগর রাষ্ট্রের মধ্যেও এই ধরনের দূত বিনিময়ের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। চৈনিক সভ্যতা, ভারতীয় সভ্যতা এমনকি কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও কূটনৈতিক ব্যবস্থার প্রমাণ পাওয়া গেছে। মধ্য যুগের শেষের দিকে ইতালিতে যে সব স্বাধীন নগরের সৃষ্টি হয় তারা পরস্পরের মধ্যে দূত বিনিময় করে নিজেদের ভিতর কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতো।

জাতীয়তাবাদ ও বিভিন্ন জাতি-রাষ্ট্র সৃষ্টির সাথে সাথে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রথম স্থায়ীভাবে রাষ্ট্রদূত বিনিময়ের প্রথা ইউরোপের প্রায় সব রাষ্ট্রই গ্রহণ করে। কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের অধিকার, কর্তব্য, বিমুক্তি অথবা বিশেষ সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে ব্যাপক রীতিনীতি গড়ে ওঠে। কূটনৈতিক সম্পর্ক সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক রীতিনীতির বিধিবদ্ধকরণের প্রথম প্রয়াস ঘটে ১৮১৫ সালের ভিয়েনা কংগ্রেসে। কিন্তু 'ভিয়েনা রেগুলেশন' কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের শ্রেণী বিভাগ ও অগ্রগামিতার ক্রম (Order of precedence) নির্ধারণের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল। ১৮১৫ সালের ভিয়েনা কংগ্রেসে কূটনৈতিক দিগকে কয়েকটি শ্রেণী ও র‍্যাঙ্কে (Rank and classification) বিভক্ত করা হয়, এজন্য কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের এই উন্নয়নকে ১৮ শতকের ইউরোপের সম্মতি (Consent of Europe) বলে।

আধুনিক যুগে শিল্প বিপ্লব, বিজ্ঞানের উন্নতি এবং গণতন্ত্র প্রসারের ফলে কূটনীতি পরিচালনার পদ্ধতি, প্রক্রিয়া, রীতিনীতি এবং আন্তর্জাতিক ভূমিকা অনেক পরিবর্তিত হয়। অনেক দেশে রাজতন্ত্রের পরিবর্তে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করতে থাকে, আবার অনেক দেশে

রাজতন্ত্র বজায় থাকলেও রাজার ক্ষমতা হ্রাস পায় যেমন ব্রিটেন। আধুনিক যুগে বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক, যাতায়াতের সুবিধা, সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের ফলে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক অধিকতর নিবিড় হতে থাকে এবং যার ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রদূতদের ভূমিকার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিংশ শতাব্দীতে কূটনীতি এক গণতান্ত্রিক রূপ লাভ করে যাকে বলা হয় প্রকাশ কূটনীতি (Open) যা মধ্য যুগে রাজাদের সময় গোপনে পালিত হতো। চর্তুদশ থেকে অষ্টাদশ শতক ইউরোপে রেঁনেসার (নবজাগরণের) সময় যখন আন্তর্জাতিক আইনের গোড়াপত্তন হয় এবং এ সময়েই সর্বাধিকভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে কূটনৈতিক মিশন বা দূতাবাস স্থায়ী প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। নব জাগরণের কয়েক শতকের মধ্যে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কূটনীতির বিভিন্ন রীতিনীতি ও বিধি-বিধান গড়ে ওঠে যা বর্তমান কূটনৈতিক আইনের ভিত্তি গড়েছে। কাজেই কূটনৈতিক গুরুত্ব বৃদ্ধির ফলে প্রথম ১৮১৫ সালে কূটনৈতিকদের সম্পর্কিত ভিয়েনা কংগ্রেস করা হয়। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হওয়ার ফলে বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী বছরগুলোয় অনেক নতুন নতুন সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্মের পর বিশ্ব রাজনৈতিক সম্পর্ক ও শান্তি রক্ষার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রচলিত প্রথা ও নব নব বিধানের প্রয়োজনের ভিত্তিতে কূটনৈতিকদের সম্পর্কিত সার্বজনীন সংবিধিবদ্ধ কনভেনশন প্রণয়ন অপরিহার্য হয়ে ওঠে। ১৯৬১ ও ১৯৬৩ সালে ভিয়েনায় যথাক্রমে কূটনৈতিক সম্পর্ক সংক্রান্ত ও কনস্যুলার সম্পর্ক সংক্রান্ত দুটি কনভেনশন সম্পাদিত হয় যা বর্তমানে কূটনৈতিক ও কনস্যুলার আইনের মূল দলিল।

বর্তমানে কূটনৈতিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের জন্য আরো কনভেনশন ও চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে এবং তা বর্তমানে কার্যকরী রয়েছে। যেমন– ১৯৬৯ সালের বিশেষ মিশন সংক্রান্ত কনভেনশন, ১৯৭৩ সালের কূটনৈতিক প্রতিনিধিবৃন্দসহ আন্তর্জাতিকভাবে রক্ষিত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে অপরাধের প্রতিকার ও শাস্তি বিধান সংক্রান্ত কনভেনশন; ১৯৭৫ সালের সার্বজনীন আন্তর্জাতিক সংগঠনের রাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধিত্ব সংক্রান্ত ভিয়েনা কনভেনশন ইত্যাদি।

আন্তর্জাতিক সংগঠনের দায়মুক্তি ও সুবিধাদির শর্তাবলী সাধারণত সংশ্লিষ্ট সংগঠনের সনদেই উল্লেখ থাকে। তবে জাতিসংঘ ও তার বিশেষায়িত সংস্থার ক্ষেত্রে ১৯৪৬ সালের জাতিসংঘের সুবিধা ও দায়মুক্তি সংক্রান্ত কনভেনশন ও ১৯৪৭ সালের জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থার সুবিধা ও দায়মুক্তি সংক্রান্ত কনভেনশন নামে দুটি আলাদা কনভেনশন রয়েছে। তাছাড়াও যে সব রাষ্ট্রে জাতিসংঘ ও তার বিশেষায়িত সংস্থার কার্যালয় আছে সে সব রাষ্ট্রের সঙ্গে সুবিধা ও দায়মুক্তির ক্ষেত্রে জাতিসংঘ ও রাষ্ট্রগুলোর সাথে দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি রয়েছে। আবার আঞ্চলিক সংগঠনসমূহের দায়মুক্তি ও সুবিধার জন্য আঞ্চলিক চুক্তি রয়েছে। তবে মূলত আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক আইনের মূল উৎস হল ১৯৬১ ও ১৯৬৩ সালের কনভেনশন দুটি, যেগুলি আন্তর্জাতিক প্রথার ভিত্তিতে প্রণীত হয়েছে। কিন্তু কূটনৈতিক ও কনস্যুলার সংক্রান্ত যেসব বিধিবিধান কনভেনশনসমূহে নেই সেসব বিষয়গুলো আন্তর্জাতিক প্রথা দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়।

কূটনীতির অর্থ ও সংজ্ঞা

কূটনীতি'র ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Diplomacy' উদ্ভব ঘটেছে সেই প্রাচীন কালে, প্রাচীন গ্রীসে যখন এক রাষ্ট্র হতে আরেক রাষ্ট্রে কোন প্রতিনিধি যেতেন, তখন তিনি তার পরিচয় খোদাই করা একটি কাঠের টুকরো গ্রাহক রাষ্ট্রের প্রধানের কাছে হস্তান্তর করতেন। এই কাঠের খণ্ডটিকেই বলা হত 'Diplom'. ধারণা করা হয়, এই Diplom শব্দটি হতেই Diplomacy শব্দের উদ্ভব।

কূটনীতি হচ্ছে শান্তিপূর্ণভাবে কোন রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিচালিত সরকারি কার্যক্রম। অর্থাৎ কূটনীতি হচ্ছে শান্তিপূর্ণ উপায়ে কোন রাষ্ট্রের প্রতিনিধি দ্বারা অন্য কোন রাষ্ট্রে পরিচালিত কর্মকাণ্ড। আর কূটনৈতিক আইন হচ্ছে প্রথাগত ও চুক্তিগত সেসব নিয়মকানুন যা বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক সৃষ্টি করে, কূটনৈতিক প্রেরণ, তাদের দায়মুক্তি, কার্যাবলী, অপসারণ প্রভৃতি সংক্রান্ত সার্বিক বিষয়াদি নিয়ন্ত্রণ করে।

১৯৬১ ও ১৯৬৩ সালের কূটনৈতিক ও কনস্যুলার সম্পর্কিত কনভেনশনই বর্তমানে আন্তর্জাতিকভাবে কূটনৈতিক আইনের মূল উৎস। কিন্তু যে সব বিষয়ে কনভেনশনে কোন বিধান নেই সে সব বিষয় আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রথা দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়।

কূটনীতিক শ্রেণীবিভাগ (Classification of Diplomats)

১৮১৫ সালের ভিয়েনা কংগ্রেসে কূটনীতিকদেরকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। যথা:

১. রাষ্ট্রদূত (Ambassador);

২. বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন মন্ত্রী ও বিশেষ কূটনৈতিক প্রতিনিধি (Minister plenipotentiary and envoys extraordinary);

৩. চার্জ দ্যা এ্যাফেয়ার্স (Chargede affairs).

পরবর্তীতে ১৮১৮ সালের Aix-La-Chapelle সম্মেলনে আবাসিক মন্ত্রী (Ministers Resident) নামে আর একটি নতুন শ্রেণী সংযোজন করা হয় এবং এই শ্রেণীকে উপরের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যবর্তী মর্যাদা দেওয়া হয়।

তবে ১৯৬১ সালের কনভেনশনের অনুচ্ছেদ ১৪ অনুযায়ী কূটনীতিক মিশন প্রধানদেরকে কিছু সমন্বয় সাপেক্ষে নিম্নের তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যথা–

১. রাষ্ট্রদূত (Ambassador) এবং পোপের দূত (Nuncio), যারা রাষ্ট্র প্রধানদের নিকট প্রেরিত হন এবং সমমর্যাদা সম্পন্ন অন্যান্য মিশন প্রধানগণ;

২. উপরাষ্ট্রদূত (envoy), কূটনৈতিক মন্ত্রী (Minister) এবং পোপের উপদূত (Internuncio), যারা রাষ্ট্র প্রধানদের নিকট প্রেরিত হন;

৩. চার্জ দ্যা এ্যাফেয়ার্স (Charge affairs), যারা পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের নিকট প্রেরিত হন।

আনুষ্ঠানিক অগ্রগামিতা এবং সাধারণ শিষ্টাচার ব্যতীত অন্য কোনো ক্ষেত্রে বিভিন্ন শ্রেণীর মিশন প্রধানদের মধ্যে কোনো তারতম্য নেই।

কূটনৈতিক মিশন, কূটনীতিকবর্গ ও তাদের কার্যাবলী

বর্তমানে বিশ্বের প্রায় প্রত্যেক রাষ্ট্রেই স্থায়ীভাবে কূটনৈতিক মিশন রয়েছে। স্থায়ী কূটনৈতিক মিশন হলো অন্য রাষ্ট্রে অবস্থিত প্রেরক রাষ্ট্রের দ্বারা প্রেরিত কূটনীতিক প্রতিনিধির অফিস, যেখান থেকে কূটনৈতিক প্রতিনিধি–সেই রাষ্ট্রের সঙ্গে যাবতীয় কূটনৈতিক সম্পর্ক পরিচালনা করেন। ঐতিহাসিকভাবে রাষ্ট্রদূতের নেতৃত্বে দূতাবাস এবং উপরাষ্ট্রদূত বা স্থায়ী চার্জ দ্যা এ্যাফেয়ার্স এর নেতৃত্বে লিগ্যাশন (Legation)– এই দুই ধরনের কূটনৈতিক মিশন আছে। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে দূতাবাস বেশি মর্যাদাসম্পন্ন হলেও বাস্তব ক্ষমতার ক্ষেত্রে এদের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই। বর্তমানে লিগ্যাশনের সংখ্যা কমে গেছে। রাষ্ট্রসমূহ দূতাবাসের মাধ্যমেই তাদের কূটনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করে। কূটনৈতিক মিশন স্থায়ীভাবে স্থাপিত হয় দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে চুক্তির মাধ্যমে এবং মিশনসমূহই ঐ রাষ্ট্রের সাথে সব ধরনের কার্যক্রমের প্রতিনিধিত্ব করে। কূটনৈতিক মিশন গ্রহীতা রাষ্ট্রে অবস্থিত অন্যান্য রাষ্ট্রের মিশনসমূহের নিকটও নিজ রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন। কূটনৈতিক মিশন প্রধান, মিশনের সদস্য, মিশনের কর্মচারীবর্গ (মিশনের কূটনৈতিক কর্মচারী, প্রশাসনিক কর্মচারী, কারিগরি কর্মচারী এবং সেবক কর্মচারী) প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গ মিশনের কাজে নিয়োজিত হন প্রেরক রাষ্ট্রের কর্মচারী রূপে। কিন্তু ব্যক্তিগত ভৃত্য প্রেরক রাষ্ট্রের কর্মচারী নন (অনু : ১ ভিয়েনা কনভেনশন ১৯৬১)।

কূটনৈতিক মিশনের কার্যাবলী

১৯৬১ সালের ভিয়েনা কনভেনশনের অনুচ্ছেদ ৩ এ কূটনৈতিক মিশনের কার্যাবলী লিপিবদ্ধ রয়েছে। সেগুলো হল–

১. গ্রাহক রাষ্ট্রে (Receiving state) প্রেরক রাষ্ট্রের (Sending state) প্রতিনিধিত্ব করা;

২. আন্তর্জাতিক আইনের দ্বারা স্বীকৃত সীমার মধ্যে থেকে গ্রাহক রাষ্ট্রে প্রেরক রাষ্ট্রের ও উহার নাগরিকদের স্বার্থ রক্ষা করা;

৩. গ্রাহক রাষ্ট্রের সরকারের সাথে বিভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করা;

৪. আইন সম্মত সব উপায়ে গ্রাহক রাষ্ট্রের অবস্থা ও ঘটনা প্রবাহ নিরূপণ করা এবং সেগুলি সম্পর্কে প্রেরক রাষ্ট্রের নিকট রিপোর্ট করা;

৫. প্রেরক রাষ্ট্র ও গ্রাহক রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়ন করা এবং উহাদের মধ্যে অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক সম্পর্কের উন্নয়ন সাধন করা।

এছাড়াও কূটনৈতিক মিশন কনস্যুলার তথা বাণিজ্য সংক্রান্ত কার্যাবলীও সম্পাদন করে তবে সেজন্য কূটনৈতিক মিশনে কনস্যুলার শাখা থাকে।

মিশন প্রধানের নিয়োগ

প্রেরক রাষ্ট্র কোন ব্যক্তিকে উহার কূটনৈতিক মিশনের প্রধান হিসেবে কোন রাষ্ট্রে প্রেরণ করার পূর্বে তাকে গ্রাহক রাষ্ট্র গ্রহণ করতে সম্মত কি না সে সম্পর্কে প্রেরক রাষ্ট্র নিশ্চিত হবে। কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের নিয়োগ, গ্রহীতা রাষ্ট্রে তাদের কার্যক্রম, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদান ইত্যাদি শিষ্টাচারমূলক নানা আনুষ্ঠানিকতায় ভরপুর। মিশন প্রধান রাষ্ট্রদূত যখন কোনো গ্রাহক রাষ্ট্রে তার দায়িত্ব পালনের উদ্দেশে আসেন তখন তিনি তার পরিচয়পত্র (Credentials) বহন করেন যা বিশেষ আনুষ্ঠানিকতায় গ্রাহক রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধানের নিকট পেশ করতে হয়। তবে এক্ষেত্রে একটি সার্বজনীন রীতি হল– রাষ্ট্রদূত অবশ্যই গ্রাহক রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অথবা কোনো স্বীকৃত মন্ত্রণালয়ে তার আগমন সম্পর্কে নোটিশ প্রদান করবেন এবং তার পরিচয়পত্রের অবিকল প্রতিলিপি উপস্থাপিত করবেন। গ্রহীতা রাষ্ট্র প্রেরক রাষ্ট্রের প্রেরিত কোন রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রহণে অসম্মতি জানাতে পারে এবং গ্রহণ না করার কারণ ব্যাখ্যা করতেও গ্রাহক রাষ্ট্র বাধ্য হয়। তাই এ বিষয়ে সম্ভাব্য অপ্রীতিকর পরিস্থিতি যথাসম্ভব এড়ানোর জন্য কোনো ব্যক্তিকে রাষ্ট্রদূত নিয়োগের পূর্বেই গ্রহীতা রাষ্ট্রের সম্মতির বিধান অনুঃ ৪, ভিয়েনা কনভেনশনে ১৯৬১ তে গৃহীত হয়েছে। এই সম্মতিকে আনুষ্ঠানিকভাবে Agreement বলা হয়। তবে গ্রাহক রাষ্ট্র কর্তৃক রাষ্ট্রদূত হিসেবে কোন ব্যক্তিকে গ্রহণের পর যে কোন সময় ঐ রাষ্ট্রদূতকে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি (Persona non grata) হিসেবে ঘোষণা করা যায়।

একাধিক রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব (Cumulative Diplomatic Representation)

গ্রহীতা রাষ্ট্রে রাষ্ট্রদূত হিসেবে অবস্থানরত একজন কূটনৈতিক মিশন প্রধান অথবা কূটনৈতিক কর্মচারীকে অন্যান্য একাধিক রাষ্ট্রের কূটনৈতিক প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ দেয়া যেতে পারে তবে এক্ষেত্রে ঐ সব গ্রাহক রাষ্ট্রগুলিকে তাদের সম্মতির জন্য নোটিশ প্রদান করতে হবে। নোটিশ প্রদানের পর যদি সেই সমস্ত গ্রাহক রাষ্ট্রগুলি সুস্পষ্টভাবে কোনো আপত্তি উত্থাপন না করে তবে একই মিশন প্রধানকে এবং ক্ষেত্র বিশেষে একই কূটনৈতিক কর্মচারীকে একাধিক রাষ্ট্রের কূটনৈতিক প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া যাবে। যদি কোন প্রেরক রাষ্ট্র একই মিশন প্রধানকে একাধিক রাষ্ট্রের জন্য নিয়োগ দেন তবে যে সব রাষ্ট্রে উক্ত মিশন প্রধান স্থায়ীভাবে থাকেন না সেই সব রাষ্ট্রে উহার একজন অন্তঃর্বর্তীকালীন চার্জ দ্যা এ্যাফেয়ার্স (Charge d affairs ad interim)-এর অধীনে কূটনৈতিক মিশন স্থাপন করতে পারেন। একই ব্যক্তি যেমন একাধিক রাষ্ট্রে নিজ রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন তেমনি গ্রহীতা রাষ্ট্রের সম্মতি সাপেক্ষে একই ব্যক্তি গ্রহীতা রাষ্ট্রে একাধিক রাষ্ট্র অর্থাৎ নিজ রাষ্ট্রের পাশাপাশি অন্য তৃতীয় কোন রাষ্ট্রেরও প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন যা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে কদাচ হয়ে থাকে।

কূটনৈতিক কোর (Diplomatic Corps)

গ্রাহক রাষ্ট্রে অবস্থানরত বিভিন্ন প্রেরক রাষ্ট্রের কূটনৈতিক মিশন প্রধানদের নিয়ে কূটনৈতিক কোর গঠিত। কূটনৈতিক প্রধানদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন ও রক্ষা এবং বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা পালনের মাধ্যম হলো এই কূটনৈতিক কোর। শুধুমাত্র মিশন প্রধানগণই এই কোরের অন্তর্ভুক্ত নয়, কূটনৈতিক মিশনের কর্মকর্তা কর্মচারী, তাদের পরিবারের সদস্যবর্গও এর অন্তর্ভুক্ত। কূটনৈতিক কোরের নেতৃত্ব দিবেন সবচেয়ে আগে যে কূটনৈতিক প্রধান হিসেবে গ্রাহক রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত হয়েছেন তিনি, যিনি কূটনৈতিক কোরের ডীন হিসেবে পরিচিত। অর্থাৎ কূটনৈতিক কোরের ডীন হবেন সেই মিশন প্রধান যিনি ঐ গ্রাহক রাষ্ট্রে সবার আগে কূটনৈতিক মিশন প্রধান হিসেবে কার্যভার গ্রহণ করেছেন।

মূলত কূটনৈতিক কোরের কাজ আনুষ্ঠানিক যেমন- কোন বিশেষ দিনে গ্রাহক রাষ্ট্রকে অভিনন্দন জানানো। তবে এই কোরের অন্যতম কাজ হচ্ছে তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় অর্থাৎ আনুষ্ঠানিকতা পালনের পাশাপাশি তাঁদের যেকোন সমস্যা সবার সম্মিলিত প্রয়াসে সমাধান করেন। এর সার্বিক কার্যক্রম পরিচালিত হয় ডীনের মাধ্যমে। ডীন গ্রাহক রাষ্ট্র ও কোরের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করেন। গ্রাহক রাষ্ট্রের নিকট কোরের পক্ষ থেকে যৌথ বক্তব্য তিনিই প্রদান করেন। তিনিই কূটনৈতিক কোরের কোন সদস্যের সুযোগ সুবিধা ও দায়মুক্তির ব্যাপারে গ্রাহক রাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা করেন। ডীনের আরো একটি উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব হচ্ছে কোরের ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করা। নব নিযুক্ত কোন রাষ্ট্রদূত সর্বপ্রথম গ্রহীতা রাষ্ট্রে এসে দেশটির স্থানীয় রীতিনীতি সুযোগ সুবিধা, সার্বিক সমস্যা সংক্রান্ত তথ্য কূটনৈতিক কোরের ডীনের কাছ থেকেই জানতে পারেন।

কূটনৈতিক মিশনে কর্মরত ব্যক্তিবর্গ

কূটনৈতিক মিশনকে কর্মকর্তা বা কর্মচারীর দিক থেকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায়-

১. কূটনীতিক (Diplomat)

২. অকূটনীতিক (Nondiplomat)

কূটনীতিক পর্যায়ে মিশন প্রধান এবং কূটনৈতিক পদমর্যাদার যেকোন কর্মকর্তা যেমন ১ম, ২য়, ৩য় সেক্রেটারিগণ, বিভিন্ন বিষয়ের কাউন্সিলর ও এ্যাটাসে (Attache) যেমন- মিলিটারি এ্যাটাসে, শিক্ষা এ্যাটাসে প্রভৃতি। কূটনৈতিক পদ মর্যাদার কর্মকর্তাগণ কূটনৈতিক প্রতিনিধি (Diplomatic agent) নামে পরিচিত। আবার অকূটনীতিক শ্রেণীতে আছে সহায়ক কর্মচারীরা। প্রশাসনিক কর্মচারী যেমন হিসাব রক্ষক, প্রশাসনিক সহকারী, কারিগরিমূলক কর্মচারী যেমন- মুদ্রাক্ষরিক, অনুবাদক। তাছাড়াও রয়েছে সেবক কর্মচারীবর্গ যেমন- ড্রাইভার, পিয়ন, লিফটম্যান, দারোয়ান যারা গৃহ কাজে নিয়োজিত মিশনের কর্মচারী। উপরের কূটনীতিক ও অকূটনীতিক উভয় ধরনের ব্যক্তিবর্গই প্রেরক রাষ্ট্রের কর্মচারী। কিন্তু এ ছাড়াও ভিয়েনা কনভেনশনে ব্যক্তিগত ভৃত্য (Private Servant) নামে আরো একজন ব্যক্তির উল্লেখ আছে, যে মিশনের কাজে নিয়োজিত কোন

সদস্যের গৃহকাজে নিয়োজিত থাকে। সে প্রেরক রাষ্ট্রের কর্মচারী নয় বরং ঐ মিশন সদস্যের ব্যক্তিগতভাবে নিয়োগকৃত ব্যক্তি (অনু : ১ দ্রষ্টব্য)।

নীতিগতভাবে মিশনের কূটনৈতিক কর্মচারীগণ প্রেরক রাষ্ট্রের নাগরিক হবেন। তবে গ্রাহক রাষ্ট্রের সম্মতিতে গ্রাহক রাষ্ট্রের কোন নাগরিককে প্রেরক রাষ্ট্রের কূটনৈতিক মিশনের কর্মচারী রূপে নিয়োগ দেয়া যাবে আবার এরূপ সম্মতি গ্রাহক রাষ্ট্র প্রত্যাহার করতে পারবে। যে সব ব্যক্তি কোন তৃতীয় রাষ্ট্রের নাগরিক এবং প্রেরক রাষ্ট্রের নাগরিক নন তাদের ক্ষেত্রেও গ্রাহক রাষ্ট্র একই রূপ অধিকার সংরক্ষণ করে অর্থাৎ তৃতীয় কোন রাষ্ট্রের নাগরিককে প্রেরক রাষ্ট্রের মিশনে কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রেও গ্রাহক রাষ্ট্রের সম্মতি লাগবে (অনু: ৮)।

কূটনৈতিক মিশন প্রধানের প্রতিনিধির মর্যাদার অবসান (Termination)

নিম্নলিখিত যে কোন কারণে কূটনৈতিক প্রতিনিধির কাজের অবসান ঘটতে পারে। যথা -

১. যখন প্রেরক রাষ্ট্র গ্রাহক রাষ্ট্রকে এই মর্মে নোটিশ প্রদান করে যে, তার কূটনৈতিক প্রতিনিধির কাজ শেষ হয়েছে।

২. যখন গ্রাহক রাষ্ট্র প্রেরক রাষ্ট্রকে এই মর্মে নোটিশ প্রদান করে যে, তারা কূটনৈতিক প্রতিনিধিকে মিশনের সদস্য হিসেবে স্বীকৃতি দিতে রাজি নয়;

৩. কূটনৈতিক প্রতিনিধি গ্রাহক রাষ্ট্রের স্বার্থের পরিপন্থী কোন কাজ করলে যেমন গুপ্তচর বৃত্তি, ঐ গ্রাহক রাষ্ট্র তাকে তখন অবাঞ্ছিত (Persona non grata) ঘোষণা করতে পারে এবং দেশ থেকে বহিষ্কারের আদেশ দিতে পারে। সেক্ষেত্রে ঐ কূটনৈতিক প্রতিনিধি আর তাঁর দায়িত্বে থাকেন না।

৪. যুদ্ধের কারণে গ্রাহক রাষ্ট্রের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্কের অবসান ঘটলেও কূটনৈতিক প্রধানগণ নিজ দেশে অর্থাৎ প্রেরক রাষ্ট্রে ফিরে যান। উদাহরণ স্বরূপ ফকল্যান্ড যুদ্ধের সময় বৃটেন ও আর্জেন্টিনার মধ্যে এরূপভাবে কূটনৈতিক সম্পর্কের অবসান ঘটেছিল।

৫. আন্তর্জাতিক আইনের বিষয়বস্তু (Subject) বা আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব হতে কোন রাষ্ট্র অবলুপ্ত হলে তখন আর ঐ অবলুপ্ত রাষ্ট্রের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক থাকে না।

৬. কূটনৈতিক প্রতিনিধি যদি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য নিয়োগ লাভ করে থাকেন, তাহলে ঐ মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার পর তিনি আর দায়িত্বে থাকেন না।

৭. কূটনৈতিক প্রতিনিধি যদি স্বেচ্ছায় তাঁর দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করেন, তাহলে তখন আর তিনি ঐ দায়িত্বে বহাল থাকেন না।

উপরোক্ত কারণগুলো ছাড়াও যদি প্রেরক রাষ্ট্র তার রাষ্ট্রদূতকে দেশে ফেরৎ ডেকে পাঠায় (recall) তবে তার অবসান ঘটে। এক্ষেত্রে দেশে ফেরৎ ডেকে পাঠানোর চিঠি গ্রহীতা

রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধান বা পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট অর্পণ করা হয়। এরপর প্রেরক রাষ্ট্র গ্রহীতা রাষ্ট্রের নিকট হতে এ চিঠির একটি স্বীকৃতি পত্র বা Letter de recreance লাভ করে। ফেরৎ ডেকে পাঠানোর চিঠি (Letter of recall) বিদায়ী বা নতুন যোগদানকারী রাষ্ট্রদূত যে কেউই গ্রহীতা রাষ্ট্রের নিকট অর্পণ করতে পারেন। তবে অনেক সময় দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কের অবনতি ঘটলে প্রেরক রাষ্ট্র তার অসন্তোষ প্রকাশ এবং সেটা গ্রহীতা রাষ্ট্রকে বিশেষভাবে জানিয়ে দেয়ার জন্য তার কূটনৈতিক প্রধানকে প্রত্যাহার করতে পারেন।

কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের অপসারণ সংক্রান্ত কয়েকটি কারণ ভিয়েনা ১৯৬১ সালের কনভেনশনের অনু : ৪৩ এ বর্ণিত রয়েছে।

কূটনৈতিক প্রতিনিধির সুযোগ সুবিধা ও দায়মুক্তি (Privileges & Immunities of Diplomatic Envoys/ Representatives)

কূটনৈতিক প্রতিনিধি হচ্ছে কোন প্রেরক রাষ্ট্রের প্রতিনিধি যিনি কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে অন্য কোনগ্রাহক রাষ্ট্রে নিয়োজিত থাকেন। আন্তর্জাতিক আইনে কূটনৈতিক মিশন, মিশন প্রধান ও মিশনের কর্মচারীবর্গকে গ্রাহক রাষ্ট্রে কিছু বিশেষ সুযোগ সুবিধা ও দায়মুক্তি প্রদান করা হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে মিশন ও মিশনে কর্মরত ব্যক্তিবর্গ যেন স্বাধীন ও বাধাহীনভাবে তাঁদের দায়িত্ব পালন করতে পারেন তা নিশ্চিত করা। প্রাচীন কালেও দূতগণ বিশেষ মর্যাদা ও নানান সুযোগ সুবিধা ও নিরাপত্তা লাভ করতেন। আন্তর্জাতিক আইনে এই বিশেষ অধিকারসমূহ ও দায়মুক্তির ব্যাপকভিত্তিক সংবিধিবদ্ধ হয়েছে ১৯৬১ সালের কনভেনশনে (অনু : ২০–৪১ পর্যন্ত)।

কূটনৈতিক অধিকার, সুযোগ সুবিধা ও দায়মুক্তি

কূটনৈতিক মিশন

ক. মিশন প্রধানের আবাসগৃহ, মিশনের অঙ্গনে এবং মিশন প্রধানের পরিবহন যানে প্রেরক রাষ্ট্রের পতাকা ও প্রতীক (emblem) ব্যবহার করার অধিকার মিশন ও মিশন প্রধানের থাকবে। গ্রাহক রাষ্ট্র উহার আইন অনুযায়ী উহার ভূ-খণ্ডে প্রেরক রাষ্ট্রের মিশন স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা লাভের ব্যাপারে সুবিধা প্রদান করবে অথবা অন্য কোনভাবে উহার স্থান লাভের ব্যাপারে সাহায্য করবে। প্রয়োজন হলে গ্রাহক রাষ্ট্র মিশনের সদস্যদের জন্য উপযুক্ত বাসস্থান লাভের ব্যাপারেও মিশনগুলিকে সাহায্য করবে।

খ. কূটনৈতিক মিশনের অঙ্গন (Premises) অলঙ্ঘনীয়। গ্রাহক রাষ্ট্রের কোন প্রতিনিধি (agent) মিশন প্রধানের সম্মতি ব্যতীত মিশনের অঙ্গনে প্রবেশ করবে না। এ সংক্রান্ত একটি উল্লেখযোগ্য আন্তর্জাতিক মামলা হলো–Sun Yat Sen Incident case-১৮৯৬।

মামলা : Sun Yat Sen Incident Case; সান ইয়াত সেন ইনসিডেন্ট মামলা; (China Vs. U.K, 1896)

ঘটনা : স্যানইয়াতসেন একজন চাইনীজ বিপ্লবী নেতা যিনি লণ্ডনে পলায়ন করেন এবং আশ্রয় গ্রহণ করেন। লণ্ডনে স্থাপিত চাইনিজ কূটনৈতিক মিশন থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং মিশনের অঙ্গনে তাকে আটক করা হয়। স্যানইয়াতসেনের একজন বন্ধু তার পক্ষে ইংল্যাণ্ডের আদালতে আটকের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ আদালতে হেবিয়াস করপাস (Habeas corpus) রিট করেন।

বিচার্য বিষয় : ইংল্যাণ্ড, চাইনিজ কূটনৈতিক মিশনের অভ্যন্তরীণ কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারবে কি না?

রায় : ব্রিটিশ আদালত রায় প্রদান করেন যে, ইংল্যান্ড একটি তৃতীয় পক্ষ হিসেবে চীনের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কোন হস্তক্ষেপ করতে পারে না।

যুক্তি : যদিও হেবিয়াস করপাস রিট করা হয় কিন্তু যেহেতু স্যান ইয়াতসেনকে চাইনিজ কূটনৈতিক মিশনে রাখা হয় তাই ব্রিটিশ আদালতের বিধান অনুযায়ী ব্রিটেন বিদেশী কোন কূটনৈতিক মিশনের অঙ্গনে বল প্রয়োগ করার ক্ষমতা রাখে না। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এমন প্রথা আছে যে, যতই বিপদজনক বা প্রয়োজনীয় ঘটনা ঘটুক না কেন- কোন ব্যক্তিই কূটনৈতিক মিশনের প্রধানের অনুমতি ব্যতীত মিশনের অঙ্গনে ঢুকতে পারবে না।

মিশনের অঙ্গনে কোন রূপ অনধিকার প্রবেশ অথবা উহার কোনরূপ অনিষ্টকরণ হতে মিশনের অঙ্গনকে রক্ষা এবং মিশনের শান্তি বিঘ্নিত করে অথবা মর্যাদা হানি করে এমন সব কাজ নিরোধের জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা গ্রাহক রাষ্ট্রের একটি বিশেষ দায়িত্ব। এ সংক্রান্ত একটি মামলা হলো :

মামলা : Iran Case; ইরান মামলা; (U.S.A. Vs. Iran, ICJ, 1980)

ঘটনা : ইরানের তেহরানে স্থাপিত যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক মিশনে শ'খানেক উত্তেজিত ছাত্র ও প্রায় পঞ্চাশ জন মিলিটারি ঢুকে পড়ে। তাদেরকে ইরানের প্রেসিডেন্ট খোমেনী অনুমতি দেন নি। তারা মিশনের অঙ্গনে ঢুকে কূটনৈতিক সমস্ত কাগজপত্রাদি এবং আর্কাইভগুলো জব্দ করে এবং কর্মকর্তা কর্মচারীকে জিম্মি করে রাখে। কিন্তু ইরানের কর্তৃপক্ষ তাদেরকে বাধা পর্যন্ত দেয় নি।

বিচার্য বিষয়

১. যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক মিশন অঙ্গন রক্ষা করার কোন বাধ্যবাধকতা ইরানের ছিল কি না?

২. ইরান যুক্তরাষ্ট্রের মিশনের ক্ষয়ক্ষতির জন্য দায়ী কি না?

রায় : আন্তর্জাতিক আদালত রায় প্রধান করেন যে, মিশনটির অঙ্গন রক্ষা করার বাধ্যবাধকতা ইরানের আছে। যেহেতু ইরান কর্তৃপক্ষ তা করে নি তাই তারা ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য।

যুক্তি : ১৯৬১ সালের ভিয়েনা কনভেনশনের অনু : ২২ (১) ও (২) এর লঙ্ঘন।

গ. মিশনের অঙ্গন, উহার আসবাবপত্র ও সেখানে অবস্থিত অন্যান্য সম্পত্তি এবং মিশনের পরিবহন যান তল্লাশী, অধিকার (requisition), ক্রোক (attachment) অথবা নির্দেশ নামা (execution) হতে বিমুক্ত থাকবে। মিশনের অঙ্গন নিজ মালিকানাধীন হোক আর ভাড়াটিয়া হোক, প্রেরক রাষ্ট্র এবং মিশন প্রধান সেই অঙ্গন সম্পর্কিত যাবতীয়, জাতীয়, আঞ্চলিক এবং পৌর মাসুল ও কর হতে অব্যাহতি পাবেন।

ঘ. কূটনৈতিক মিশনের সেরেস্তা ও দলিলপত্র (archieves & documents) অলঙ্ঘনীয়।

ঙ. গ্রাহক রাষ্ট্র মিশনকে সকল সরকারি প্রয়োজনে (official purpose) অবাধ যোগাযোগের অনুমতি দিবে এবং অনুরূপ যোগাযোগ সংরক্ষণ করবে। প্রেরক রাষ্ট্রের সরকার এবং যেকোন স্থানে অবস্থিত উহার অন্যান্য মিশন ও বাণিজ্য দূতাবাস (Consulate) এর সাথে যোগাযোগের জন্য মিশন কূটনৈতিক সংবাদ বাহক (diplomatic courier) অথবা সংক্ষিপ্ত গোপন সংকেত, অথবা অন্য যেকোন পদ্ধতির মাধ্যমে সংবাদ আদান প্রদান করতে পারে। তবে কেবল গ্রাহক রাষ্ট্রের সম্মতি ক্রমেই মিশন বেতার প্রেরক যন্ত্র স্থাপন ও ব্যবহার করতে পারবে।

চ. মিশনের সরকারি চিঠিপত্র (official correspondence) অলঙ্ঘনীয়।

ছ. কূটনৈতিক থলি (diplomatic bag) খোলা বা আটক করা যাবে না। এমন ঘটনার উদ্রেকও যদি হয় যে কূটনৈতিক ব্যাগের অপব্যবহার হচ্ছে বা সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ দেখা দেয়, তারপরও কূটনৈতিক ব্যাগের অলঙ্ঘণীয়তা বজায় থাকবে। এ সংক্রান্ত মামলা হচ্ছে –

মামলা : Dikko Incident Case; ডিকো ইনসিডেন্ট কেস; (1984)

ঘটনা : মিঃ ডিকো একজন নাইজেরিয়ান রাজনৈতিক নেতা যিনি লণ্ডনে পালিয়ে যান এবং সেখানে অবস্থান কালে নাইজেরিয়ার সামরিক সরকার বিরোধী বক্তৃতা দিতে থাকেন। লণ্ডনে নাইজেরিয়ার কূটনৈতিক মিশনের প্রতিনিধির মাধ্যমে তিনি আটক হন। পরবর্তীতে তাকে অধিক শক্তিশালী ঘুমের মাদক সেবন করে অজ্ঞান অবস্থায় কূটনৈতিক ব্যাগে করে নাইজেরিয়ায় পাচারের জন্য পাঠানো হয়, কিন্তু বিমান বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ব্যাগটি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। ব্যাগটি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিদর্শন করার পর ডিকোকে ঐ কূটনৈতিক ব্যাগের মধ্যে অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া যায়।

বিচার্য বিষয় : কূটনৈতিক ব্যাগটি বিমান বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক খোলা আদৌ যুক্তি যুক্ত কি না।

রায় : আদালত তার রায়ে বলেন যে, বিমান বন্দর কর্তৃপক্ষের কাজটি আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন নয় এবং কূটনৈতিক সুবিধার অপব্যবহার রোধে ইহা জরুরি।

কূটনৈতিক থলে (Diplomatic Bag) সংক্রান্ত আরো একটি মামলা হচ্ছে–

মামলা : The Crying Suitcase Case; ক্রন্দনরত সুটকেস মামলা; (Egypt Vs. Italy; (1964)

ঘটনা : ইতালির রোম বিমান বন্দরে মিশরের একজন কূটনৈতিক প্রতিনিধি একটি স্যুটকেস নিয়ে নিজের দেশে ফেরত যাচ্ছিলেন। বিমান বন্দরের কাস্টম অফিসিয়ালরা স্যুটকেসটির মধ্যে থেকে কান্নার শব্দ শুনতে পায়। ফলে তারা ব্যাগটি তল্লাশী করতে চায় কিন্তু মিশরের কূটনৈতিক অস্বীকার করে। তারপর স্যুটকেসটি জোর করেই তারা খোলে এবং দেখে যে, একজন ইসরাঈলী কূটনৈতিককে স্যুটকেসটির মধ্যে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। মিশরের কূটনীতিক বলেন যে, তারা ব্যাগটি খুলে ১৯৬১ সালের ভিয়েনা কনভেনশনের অনু : ২৭ (৩) বর্ণিত বিধানের লঙ্ঘন ঘটিয়েছে।

বিচার্য বিষয় : রোম বিমান বন্দর কর্তৃপক্ষের কাজটি আন্তর্জাতিক আইনের বা কূটনৈতিক সুযোগ সুবিধা ও দায় মুক্তির লঙ্ঘন কি না।

রায় : কর্তৃপক্ষের কাজটি আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন নয় বরং এরকম কাজ জরুরি।

যুক্তি : যদিও ১৯৬১ সালের ভিয়েনা কনভেনশনের অনু : ২৭ (৩) অনুযায়ী কোনো কূটনৈতিক ব্যাগ কোনো ক্রমেই খোলা যাবে না কিন্তু যখন মানুষের জীবন রক্ষার প্রশ্ন আসে সে ক্ষেত্রে ব্যাগটি বল প্রয়োগ করে খোলা আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন নয়। তবে কোনটি কূটনৈতিক থলি আর কোনটি নয়, এই বিষয় নিয়েই বিতর্কের অবতারণা হতে পারে। এমনই একটি মামলা হলো:

মামলা : The USSR Lorry Incident; ইউ.এস.এস.আর লরি ঘটনা; (1984)

১৯৮৪ সালে তদানীন্তন সোভিয়েত সরকার, তাদের জার্মানীস্থ দূতাবাসে একটি লরি প্রেরণ করে এবং এটিকে 'কূটনৈতিক ব্যাগ' হিসেবে চিহ্নিত করে। এই লরিটি পশ্চিম জার্মানীতে পৌছলে সেখানে এটিকে চ্যালেঞ্জ করা হয় এবং কাস্টমস্ কর্মকর্তারা এটি পরীক্ষা করতে চান। সোভিয়েত পক্ষ জোর দিয়ে বলে যে, এটি একটি কূটনৈতিক ব্যাগ; কাজেই কাস্টমস্ কর্তৃপক্ষ এটি খুলতে পারবে না। অপর পক্ষে, জার্মান কর্তৃপক্ষ যুক্তি দেখায়, একটি লরি কিছুতেই ব্যাগ হতে পারে না, শেষ পর্যন্ত তারা লরিটি খুলে এবং পরীক্ষা করে।

প্রতিষ্ঠিত নীতি : এই ঘটনার ফলশ্রুতিতে এই নীতি প্রতিষ্ঠিত হয় যে, যদিও একটি 'কূটনৈতিক ব্যাগ' এর আকৃতি বা প্রকৃতি সম্পর্কে কোন ধরা-বাধা নিয়ম নেই, তবুও 'কূটনৈতিক ব্যাগে'র আকৃতি অবশ্যই যুক্তি সঙ্গত হতে হবে।

উপরে আলোচিত ও বর্ণিত সুযোগ সুবিধা ও দায়মুক্তিগুলো কূটনৈতিক মিশন সংক্রান্ত।

কূটনীতিকের সুযোগ সুবিধা ও দায়মুক্তি

১. **ব্যক্তিগত দায়মুক্তি :** কূটনৈতিক প্রতিনিধি ব্যক্তি হিসেবে অলঙ্ঘনীয়, তাঁকে কোনো প্রকার গ্রেফতার বা আটক করা যাবে না। গ্রাহক রাষ্ট্র যথাযথ সম্মান সহকারে তাঁর সহিত আচরণ করবে এবং তার দেহ, স্বাধীনতা অথবা মর্যাদার উপর আক্রমণ রোধ করার উপযুক্ত সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। অর্থাৎ ফৌজদারি বা দেওয়ানী যে কোন প্রকার অপরাধের ক্ষেত্রে তিনি ব্যক্তিগতভাবে দায়মুক্ত হবেন। উদাহরণ স্বরূপ, এক সময় নিউ ইয়র্কে পাপুয়া নিউগিনির রাষ্ট্রদূতের গাড়ি দুর্ঘটনার মাধ্যমে অনেক মানুষ মারা যায়। ফলে যুক্তরাষ্ট্র ঐ রাষ্ট্রদূতকে অবাঞ্ছিত (Persona non grata) ঘোষণা করে। আইন অনুযায়ী তারপরও তাঁর দায়মুক্ত হওয়ার কথা। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র পাপুয়া নিউগিনির অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে রাষ্ট্রদূতের বিচার করে। যুক্তরাষ্ট্রের এ হেন বিচার যদিও আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন নয় তবে রাষ্ট্রীয় প্রথা বা প্র্যাকটিসের লঙ্ঘন।

২. কূটনীতিক প্রতিনিধির ব্যক্তিগত বাসস্থান মিশনের অঙ্গনের মত একই রূপ অলঙ্ঘণীয়তা ভোগ ও রক্ষণ লাভের অধিকারী। তার ব্যক্তিগত চিঠিপত্র ও কাগজপত্র সবকিছুই মিশনের কাগজপত্র ও দলিলপত্রের ন্যায় একই রূপ অলঙ্ঘণীয়।

৩. কূটনৈতিক প্রতিনিধি সকল প্রকার ফৌজদারি (criminal) এবং দেওয়ানী (civil) এখতিয়ার হতে বিমুক্তি (Inmunity) ভোগ করবেন। তবে শুধু নিম্নের ক্ষেত্র গুলিতে তার বিরুদ্ধে দেওয়ানী এখতিয়ার প্রয়োগ করা যাবে–

   (ক) গ্রাহক রাষ্ট্রে অবস্থিত প্রেরক রাষ্ট্রের মিশনের প্রয়োজন ব্যতীত তিনি যদি ব্যক্তিগত স্থাবর সম্পত্তি ধারণ করেন;

   (খ) প্রেরক রাষ্ট্রের পক্ষে নয় বরং নিজের স্বার্থে তিনি যদি বেসরকারি ব্যক্তি হিসেবে কোন সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক (executor), প্রশাসক, উত্তরাধিকারী (Successor) অথবা উত্তর দায় গ্রাহক (legattee) হন।

   (গ) গ্রাহক রাষ্ট্রে কূটনৈতিক প্রতিনিধি বেসরকারিভাবে পরিচালিত কোন পেশাদারী বা বাণিজ্যিক কারবারে নিযুক্ত হন।

৪. কূটনৈতিক প্রতিনিধিগণ কিছু কিছু ব্যতিক্রম সাপেক্ষে সকল ব্যক্তিগত অথবা বাস্তব জাতীয়, আঞ্চলিক অথবা পৌর কর ও মাসুল হতে অব্যাহতি পাবেন। (অনু : ৩৪ দ্রষ্টব্য)।

৫. গ্রাহক রাষ্ট্র উহার আইন ও নিয়ম কানুন অনুসারে নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি প্রবেশের অনুমতি দিবে এবং সেগুলিকে সকল আমদানি শুল্ক এবং গুদাম ভাড়া, পরিবহন ভাড়া ও অনুরূপ খরচ ব্যতীত অন্যান্য পাওনা হতে অব্যাহতি দান করবে:

   (ক) মিশনের সরকারি কাজে আনীত দ্রব্যাদি;

   (খ) কূটনৈতিক প্রতিনিধি অথবা তার গৃহস্থালীর অঙ্গীভূত কোনো পারিবারিক সদস্যের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য আনীত দ্রব্যাদি এবং তার সংস্থাপনের (establishment) এর জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি।

কূটনৈতিকের ব্যক্তিগত তল্পিতল্লাও তল্লাশি হতে অব্যাহতি লাভ করবে তবে যদি গ্রাহক রাষ্ট্রের আইন বিরুদ্ধ এমন কিছু ও উপরের (ক) ও (খ) তে বর্ণিত দ্রব্যাদির আওতাভুক্ত নয় তবে প্রতিনিধির দ্বারা বা তার সম্মতিক্রমে তার সম্মুখেই পরীক্ষণ পরিচালনা করা যাবে।

কোন কূটনৈতিকের তল্পিতল্লা তল্লাশির যথেষ্ট সন্দেহ প্রবণ কারণে করা হলে এবং তল্লাশির ফলাফল শূন্য হলে গ্রাহক রাষ্ট্র ক্ষমা প্রার্থনা করবে এটিই রাষ্ট্রীয় প্র্যাকটিস। কিন্তু যদি অবৈধ কিছু পাওয়া যায় তবে গ্রাহক রাষ্ট্র দ্রব্যাদি নিজেরা সীজ (seize) বা আটক (detain) না করে প্রেরক রাষ্ট্রের নিকট পাঠাবে।

কূটনৈতিক প্রতিনিধির সঙ্গে একই গৃহে বসবাসকারী তাদের গৃহস্থালীর অঙ্গীভূত পারিবারিক সদস্যগণ (অবশ্য তারা যদি গ্রাহক রাষ্ট্রের নাগরিক না হন তবে) অনু: ২৯ হতে ৩৬ পর্যন্ত বর্ণিত বিশেষ অধিকার ও বিমুক্তিগুলো (Inmunities) ভোগ করবেন।

কূটনৈতিক মিশনের কর্মচারীবর্গের সুবিধা ও দায়মুক্তি

মিশনের প্রশাসনিক ও কারিগরি কর্মচারীগণ এবং গৃহস্থালীর অঙ্গীভূত পারিবারিক সদস্যগণ, অবশ্য তারা যদি গ্রাহক রাষ্ট্রের নাগরিক না হন তবে ভিয়েনা কনভেনশনের অনু : ২৯–৩৫ পর্যন্ত বর্ণিত বিশেষ অধিকার ও দায়মুক্তি ভোগ করবেন। তবে দেওয়ানী ও ফৌজদারি এখতিয়ারের ক্ষেত্রে অনু : ৩১ (১)– তাদের দ্বারা কৃত সরকারি কাজের বহির্ভূত হলে দায়মুক্তি লাভ করবে না। তাঁরা প্রথম স্থাপনার (Installation) সময় যেসব দ্রব্যাদি আনবেন সেগুলোর ক্ষেত্রে অনু : ৩৬ (১) এ বর্ণিত বিশেষ সুবিধাও ভোগ করবেন।

মিশনের যেসব সেবক কর্মচারী গ্রাহক রাষ্ট্রের নাগরিক কিংবা সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা নন সেসব কর্মচারী তাদের সরকারি কর্তব্য পালন কালে সম্পাদিত কোন কাজের ক্ষেত্রে বিমুক্তি ভোগ করবেন। তার পারিশ্রমিকের কর ও অন্যান্য দেয় হতে অব্যাহতি পাবেন এবং সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও (অনু : ৩৩) বিমুক্তি ভোগ করবেন।

মিশনের সদস্যদের ভৃত্যদের ক্ষেত্রে তারা কর ও দেয় হতে অব্যাহতি পাবে না। বিমুক্তির ক্ষেত্রে গ্রাহক রাষ্ট্র যে রূপ মনে করবেন তাই হবে, তবে এক্ষেত্রে গ্রাহক রাষ্ট্রকে এমনভাবে ভৃত্য সংক্রান্ত কর্তৃত্ব প্রয়োগ করবে, যাতে মিশনের কার্যাবলী সম্পাদনে যেন কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না হয়।

কূটনৈতিক মিশন, মিশন প্রধান, কর্মচারী কর্মকর্তাবর্গের সুযোগ সুবিধা ও দায়মুক্তির সব অধিকার আন্তর্জাতিক আইন স্বীকৃত। তবে কূটনৈতিকদের কিছু দায়িত্ব থাকবে যদিও তা সংবিধিবদ্ধ নয়। যেমন–

১. গ্রাহক রাষ্ট্রে কূটনীতিক সেই দেশের আইন কানুন মেনে চলবে;

২. কূটনীতিককে অবশ্যই তার কার্যক্রম সম্পর্কে সচেতন হতে হবে অর্থাৎ কূটনীতিকরা গ্রাহক রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকবে।

৩. কূটনীতিকরা অবশ্যই তাদের দাপ্তরিক কাজ করবে। গ্রাহক রাষ্ট্রে এর বাইরে কোন কাজ করা ঠিক হবে না। যেমন– গ্রাহক রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ তথ্য ফাঁস করা।

৪. কূটনৈতিকরা তাদের সব ধরনের কার্যাবলী অবশ্যই কূটনৈতিক মিশনের দ্বারা পরিচালনা করবে।

৫. পরিশেষে কূটনীতিকবর্গ নিজেদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অর্থাৎ পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নে কাজ করবে।

বাণিজ্যিক দূত সংক্রান্ত আইন (Consular Law)

কোন রাষ্ট্র কর্তৃক অপর কোন রাষ্ট্রে প্রেরক রাষ্ট্রের বাণিজ্যিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় দেখাশুনার জন্য নিযুক্ত কূটনৈতিক প্রতিনিধিই বাণিজ্যিক দূত বা Consul। বাণিজ্যিক প্রতিনিধিগণ প্রেরক রাষ্ট্র ও গ্রাহক রাষ্ট্রের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের সম্পর্ক উন্নয়নের কাজে নিয়োজিত থাকেন।

শ্রেণী বিভাগ (Classification)

বাণিজ্যিক দূত দুই শ্রেণীর হতে পারে। যথা :

১. পূর্ণ সময়ের জন্য নিযুক্ত পেশাগত কন্সাল;

২. সাময়িক সময়ের জন্য নিয়োজিত কন্সাল। ব্যবসায়িক বিষয়ে দক্ষ ব্যক্তি বা আইনজ্ঞদেরকে এরূপ অপেশাদার বাণিজ্যিক দূত হিসেবে নিয়োগ করা হয়। পেশাদার কন্সালদের চেয়ে অপেশাদার কন্সাল সংখ্যায় বেশি হতে পারে। যেমন নরওয়ে ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশে সাময়িকভাবে নিয়োজিত কন্সালের সংখ্যা বেশি।

তবে পদমর্যাদার ভিত্তিতে কন্সালদেরকে নিম্নলিখিত চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। যথা:

১. কন্সাল জেনারেল (Consul General)

২. কন্সাল (Consul)

৩. ভাইস কন্সাল (Vice-Consul)

৪. কন্সাল এ্যাজেন্ট (Consul Agent)

কন্সালদের কার্যাবলী (Functions of Consuls)

বাণিজ্যিক দূতদের প্রধান কাজ হচ্ছে গ্রাহক ও প্রেরক রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক বাণিজ্যিক বিষয় দেখাশুনা করা। তবে ১৯৬৩ সালের বাণিজ্যিক দূত সম্পর্কিত ভিয়েনা কনভেনশনে তাদের কতিপয় কার্যাবলী লিপিবদ্ধ হয়েছে। যথা :

ক. কন্সাল বিদেশে নিজ রাষ্ট্রের নাগরিকদের অধিকার ও অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষার্থে আইনগত ভূমিকা রাখবে;

খ. অবস্থানকারী রাষ্ট্রের সাথে অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপন করবে;

গ. গ্রাহক রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আইনগত অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে তা নিজ রাষ্ট্রে প্রেরণ করবে।

তাছাড়াও কন্সাল নিজ রাষ্ট্রের নাগরিক ও প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বার্থ রক্ষা করবে। স্বদেশের জাহাজ ও বেসামরিক বিমান সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করবে। বিভিন্ন দলিলপত্রাদি সত্যায়ন সংক্রান্ত নোটারীয়াল (Notarial) দায়িত্ব, স্বদেশী নাগরিকদের বিবাহ, তালাক ইত্যাদি সংক্রান্ত কার্যক্রম এবং পাসপোর্ট, ভিসা ইস্যুকরণ বা তার মেয়াদ বৃদ্ধিকরণ সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন করবে।

কন্সাল নিয়োগ ও তার কাজের অবসান

আন্তর্জাতিকভাবে প্রেরক রাষ্ট্র কনস্যুলার প্যাটেন্ট প্রদানের মাধ্যমে কাউকে কন্সাল হিসেবে নিয়োগ দান করেন। লিখিত নিয়োগপত্রের মাধ্যমেই কন্সালগণ তার দায়িত্ব লাভ করেন। তবে যাকে কন্সাল হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হবে তাকে গ্রাহক রাষ্ট্রের কাছ থেকে সম্মতিসূচক পত্র (exequatur) পেতে হবে।

আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে কোন রাষ্ট্র অপর কোন রাষ্ট্রের কন্সালকে গ্রহণ নাও করতে পারে। তবে ব্যবসা বাণিজ্য ও সাধারণ পর্যায়ে পারস্পরিক স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশে বিদেশী রাষ্ট্র কর্তৃক নিযুক্ত এরূপ কন্সাল সব রাষ্ট্রই গ্রহণ করে থাকে। কন্সালগণ পরিচয়পত্র বহনকারী রাষ্ট্রদূতের ন্যায় বিশেষ অধিকার স্বাভাবিক নিয়মে দাবি করতে পারে না তবে পারস্পরিক কোন চুক্তির মাধ্যমে গ্রাহক রাষ্ট্র স্বীকার করে নিলে ঐ কন্সালগণ কূটনৈতিক বিশেষ মর্যাদা ও অধিকার লাভ করবেন।

কনস্যুলার প্রতিনিধির কাজের অবসান ঘটবে–

১. প্রেরক রাষ্ট্র যদি কন্সালকে দেশে ফেরত ডেকে পাঠান;

২. গ্রাহক রাষ্ট্র যদি কন্সালকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা (persona non grata) করে;

৩. কোন কনস্যুলেট যদি বন্ধ করে দেওয়া হয়; এবং

৪. প্রেরক ও গ্রাহক রাষ্ট্রের মধ্যে যদি কোন যুদ্ধ আরম্ভ হয়।

কন্সালদের সুযোগ সুবিধা ও দায়মুক্তি (Privileges and Immunities)

বাণিজ্যিক প্রতিনিধি বা দূতগণ আন্তর্জাতিক আইনের বিধান অনুসারে কতিপয় বিশেষ সুবিধা ও দায়মুক্তির অধিকার ভোগ করে থাকেন। বাণিজ্যিক প্রতিনিধিদের স্বার্থে এসব বিশেষ অধিকার প্রধানত প্রথার উপর ভিত্তি করে প্রেরক ও গ্রাহক রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক চুক্তি (Treaty) দ্বারা নির্ধারিত হয়। ১৯৬৩ সালের বাণিজ্যিক দূত সংক্রান্ত ভিয়েনা কনভেনশন (The Vienna Convention on Consular Relation, 1963) অনুযায়ী বাণিজ্যিক প্রতিনিধিগণ নিম্নলিখিত অধিকার ও দায়মুক্তি ভোগ করে থাকেন। যথা:

১. বাণিজ্যিক প্রতিনিধিগণ প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত কর হতে অব্যাহতি পান

২. সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির শর্ত অনুযায়ী বাণিজ্যিক প্রতিনিধিগণ ফৌজদারি ও দেওয়ানী মামলায় সাক্ষ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা হতে অব্যাহতি পেয়ে থাকেন

৩. সংশ্লিষ্ট উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির শর্ত অনুযায়ী কোন বাণিজ্যিক প্রতিনিধির দপ্তরের নথীপত্র তল্লাশি বা আটক করা যাবে না

৪. একই রূপে বাণিজ্যিক প্রতিনিধির দপ্তরে প্রবেশ অথবা এর অলঙ্ঘণীয়তা সম্পর্কেও চুক্তিতে শর্ত জুড়ে দেয়া যেতে পারে

৫. এতদ সত্ত্বেও বাণিজ্যিক প্রতিনিধি তাঁর জানমালের নিরাপত্তা লাভের অধিকারী।

সুতরাং বাণিজ্যিক প্রতিনিধিগণও রাষ্ট্রদূতের মতই বিশেষ অধিকার ও দায়মুক্তি ভোগ করেন। অনেক সময় দেখা যায় যে, কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হলেও বাণিজ্যিক সম্পর্ক টিকে থাকে। ১৯৬৩ সালের কনভেনশন ছাড়াও দ্বি-পাক্ষিক চুক্তির ভিত্তিতে এক রাষ্ট্র কর্তৃক অন্য রাষ্ট্রের বাণিজ্যিক প্রতিনিধিদের কিছু বাড়তি সুযোগ সুবিধা ও দায়মুক্তির প্র্যাকটিস আছে। যেমন ১৯৬৮ সালে যুক্তরাজ্য ও প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে স্বাক্ষরিত বাণিজ্যিক চুক্তির ভিত্তিতে দুটি দেশের কনস্যুলার কর্মকর্তা কর্মচারী ও তাদের পরিবারের সদস্যবর্গকে কূটনৈতিক প্রতিনিধি ও তার পরিবারের সদস্যদের মতই পূর্ণ দায়মুক্তি প্রদান করা হয়েছিল।

এখানে আরো উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সশস্ত্র বিরোধকালেও গ্রাহক রাষ্ট্র তার নাগরিক ব্যতীত অন্য যে সকল ব্যক্তি বিশেষ অধিকার ও দায়মুক্তি লাভের অধিকারী তাদের ও তাদের পরিবারের সদস্যগণ যাতে যথাসম্ভব শীঘ্রই তাদের নিজ দেশে ফেরত যেতে পারেন এবং তাদের সম্পদ সংরক্ষণ করতে পারেন, গ্রাহক রাষ্ট্র সে লক্ষ্যে অবশ্যই ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

আন্তর্জাতিক সংগঠন
International Organization

'এই পৃথিবী একটি পরিবার' এ মূলমন্ত্র ধারণ করে আন্তর্জাতিক সংগঠনের যাত্রা শুরু হয়। বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ থেকে আন্তর্জাতিক সংগঠনের ধারণার উৎপত্তি। বিংশ শতাব্দীতে প্রযুক্তির-অভাবনীয় উন্নতি আর শিল্পের বিকাশ জাতিসমূহকে পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল করে তুলেছে। ভৌগলিক কারণে এক দেশ অন্য দেশের তুলনায় অনেক দূরে অবস্থান করলেও এ দ্রুতগতির যুগে এ দূরত্ব মোটেই বিবেচ্য বিষয় নয়। অর্থনীতির রজ্জু বিশ্বের বিভিন্ন জাতিকে সমবেত করেছে আজ একই সাধারণ বাজারে; শুধু অর্থনৈতিকভাবেই নয় রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকেও জাতিসমূহ আজ পরস্পরের কাছাকাছি। এ পৃথিবীকে বসবাসের উপযোগী হিসাবে অক্ষুণ্ন রাখতে রাষ্ট্রসমূহের মাঝে সুসম্পর্ক একান্তই প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক সংগঠন এ সম্পর্ক স্থাপনের পথকে সুগম করেছে। জাতিসমূহের মাঝে যে কোন বিবাদের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা, বিভিন্ন বিপদ এড়ানো, পৃথিবীর অফুরন্ত সুযোগ আর সম্পদের সদ্ব্যবহারের তাগিদে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা সর্বজন স্বীকৃত। যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থার এ চরম উৎকর্ষতার যুগে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সাংগঠনিক কার্যক্রম সৃষ্টি ও প্রসারের ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। তাই দেখা যায়, শান্তি, নিরাপত্তা আর অধিকারের বাণীকে সমুন্নত করার প্রয়াস পেয়েছে আন্তর্জাতিক সংগঠন। বার বার যুদ্ধে বিধ্বস্ত পৃথিবীর মানুষকে যুদ্ধের ভয়াবহতা থেকে মুক্তি দেয়ার লক্ষ্যে জন্ম হয় জাতিপুঞ্জ আর জাতিসংঘের ন্যায় আন্তর্জাতিক সংগঠন।

আন্তর্জাতিক সংগঠনের পরিচয়

তিন বা ততোধিক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র নির্দিষ্ট দলিলে সম্মতি দেয়ার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সংগঠনের জন্ম হয়। এটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য নির্দিষ্ট কার্যালয় থেকে পরিচালিত হয়। আন্তর্জাতিক সংগঠন তার অধিনস্থ বিভাগ-উপবিভাগ শাখা-প্রশাখা, অপরাপর সহযোগী সংগঠনের মাধ্যমে এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে। সরকারি আন্তর্জাতিক সংগঠনের ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রীয় সরকারি প্রতিনিধিত্বের প্রয়োজন হয়, কিন্তু বেসরকারি আন্তর্জাতিক সংগঠনের ক্ষেত্রে তা অপ্রয়োজনীয়। আধুনিক কালে সরকারি এবং বেসরকারি উভয় ধরনের আন্তর্জাতিক সংগঠন বিদ্যমান রয়েছে।

পৃথিবীকে শাসন অথবা দার্শনিক বা আদর্শগত কোন ধারণা থেকে আন্তর্জাতিক সংগঠনের সৃষ্টি হয় নি বরং সহ অবস্থানের মৌলিক প্রয়োজন থেকে এর উৎপত্তি ঘটেছে।

বিগত শতাব্দীর প্রথম দিকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় যুদ্ধক্লান্ত পৃথিবীতে যুদ্ধের আইন প্রণয়ন করেছিল হেগ সম্মেলনে। যুদ্ধকে নিয়ন্ত্রণ করাই ছিল এসব আইন প্রণয়নের লক্ষ্য। আজকের পরিবর্তিত পৃথিবীতে মানুষ আর যুদ্ধ চায় না, তাই যুদ্ধমুক্ত পৃথিবী গড়তে একটি শক্তিশালী

আন্তর্জাতিক সংগঠনের অভ্যুদয় সময়ের বড় দাবি। বিশ্বায়নের এই যুগে দুর্বল রাষ্ট্রগুলোর স্বার্থকে সংরক্ষণ করতে এমন আন্তর্জাতিক সংগঠনের প্রয়োজন যেখানে সকল সদস্য রাষ্ট্র সমান প্রতিনিধিত্বের সুযোগ পাবে।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানবিক উদ্দেশ্যে যেমন সৃষ্টি হয়েছে জাতিসংঘের ন্যায় সংগঠন তেমনি আঞ্চলিক ক্ষেত্রেও একই উদ্দেশ্যে সৃষ্টি হয়েছে অনেক সংগঠন, যেমন আফ্রিকান ইউনিয়ন, আরব লীগ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, কমনওয়েলথ্ অব ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেটস্ ইত্যাদি। নির্দিষ্ট বিষয়ে কাজ করে এমন সংগঠনও রয়েছে যেমন আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, খাদ্য ও কৃষি সংস্থা। আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংগঠনের পাশাপাশি অসংখ্য বেসরকারি সংগঠনও রয়েছে যারা সার্বজনীন স্বার্থের জন্য কাজ করে, যেমন এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, আন্তর্জাতিক রেডক্রস কমিটি ইত্যাদি।

আন্তর্জাতিক সংগঠনের ইতিহাস

সভ্যতার সূচনালগ্নে 'বিশ্ব সরকারের' ধারনা মানুষের মনে সুপ্ত ছিল। গ্রীকদের Achean League, সীসেরোর Civitus Gentium আর দান্তে'র Monarchia বইতে World State-এর উল্লেখ তারই প্রমাণ বহন করে। একটি দেশের সাথে আরেকটি দেশের সম্পর্ক গড়ার জন্যই আন্তর্জাতিক সংগঠন। আদিকালে একাধিক রাষ্ট্রের মাঝে এ সম্পর্ক বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্নভাবে নিয়ন্ত্রিত হত। প্রাচীন গ্রীস ও রোমে কনসাল নামক প্রতিষ্ঠান ভিনদেশে ব্যবসা করছে এমন নাগরিকদের স্বার্থকে পর্যবেক্ষণ করত। আধুনিক কালেও এ ধরনের প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক আইনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পরবর্তীতে ১৫তম শতাব্দীতে স্থায়ী কূটনৈতিক ব্যক্তিবর্গ নিয়োগের মাধ্যমে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত হত। ইতালির রাষ্ট্রে এ পদ্ধতির চালু হয় সর্বাগ্রে।

এ দু'ধরনের প্রতিষ্ঠান পরবর্তীকালে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন সৃষ্টির পেছনে ভূমিকা রাখে। কনসাল এবং কূটনীতিক নিয়োগের মাধ্যমে কেবল দ্বি-পক্ষীয় সমস্যা সমাধান সম্ভব হত, বহুপক্ষীয় বিষয়াদি আলোচনার জন্য, জাতিসমূহের মাঝে সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য পরবর্তীতে শুরু হল বহুজাতিক সম্মেলনের যুগ। এ ধরনের সম্মেলনের মাধ্যমে বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গ সমবেত হয়ে বহুপক্ষীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করত এবং বিভিন্ন চুক্তি স্বাক্ষরিত হত। আন্তর্জাতিক সংগঠন সৃষ্টির পেছনে যেসব চুক্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সেগুলোর ধারাবাহিক আলোচনায় প্রথমে আসে- The Peace of Westphalia 1648, এ চুক্তির মাধ্যমে ১৬১৮-৪৮ পর্যন্ত চলমান ৩০ বছরের যুদ্ধের অবসান ঘটে, যা ইউরোপে নতুন মানচিত্রের সৃষ্টি করে। এটি ছিল ইউরোপের জন্য একটি আন্তর্জাতিক সংবিধান। ১৭১৩ সালের Peace of Utrecht চুক্তি স্প্যানিশ যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটায় যা পরবর্তীতে ইউরোপে ক্ষমতার ভারসাম্যের ক্ষেত্রে ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। ১৮১৪ সালে স্বাক্ষরিত হয় প্যারিস শান্তি চুক্তি। এ চুক্তি অনুযায়ী গঠিত হয় আন্তর্জাতিক নদী কমিশন। ফ্রান্স বিপ্লবের পর ১৮১৫ সালের ভিয়েনা কংগ্রেস সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ইতিবাচক আন্তর্জাতিক আইন আর কূটনৈতিক আচরণ বিধির উন্নয়নের ক্ষেত্রে এ কংগ্রেসের সুস্পষ্ট প্রভাব ছিল। ভিয়েনা

কংগ্রেসের পর গড়ে ওঠে- Concert of Europe। যুদ্ধ না করে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় এই কনসার্ট। উনবিংশ শতাব্দীর পুরো ভাগেই ছিল কেবল সম্মেলন আর চুক্তি স্বাক্ষর। ১৮১৮ থেকে ১৮২২ সাল পর্যন্ত ৪টি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। ১৮১৮ সালে আয় লা স্যাপলে, ১৮২০ সালে ট্রপাউতে, ১৮২১ সালে লাইব্যাকে এবং ১৮২২ সালে ভেরোনাতে। ১৮৪০ থেকে ১৮৪৯ সালের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় নয়টি সম্মেলন। ১৮৫৬ সালে হয় প্যারিস কংগ্রেস। ১৮৭১ এবং ১৯১২ সালের লন্ডনে সম্মেলন। আফ্রিকায় উপনিবেশ গড়াকে কেন্দ্র করে ইউরোপীয় দেশগুলোর মাঝে যে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দূরত্ব সৃষ্টি হয়, ১৮৭৮ এবং ১৮৮৪ সালের বার্লিন কংগ্রেসের মাধ্যমে তা নিরসনের চেষ্টা করা হয়। ১৮৯৯ সালে এবং ১৯০৭ সালে হেগে সম্মেলন হয়। হেগ সম্মেলনে **Convention on the Pacific Settlement of Disputes** গৃহীত হয়, যার দ্বারা **Permanent Court of Arbitnation** প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে **Convention of the Laws and Customs of Warfare on Land and Maritime Warfare** গৃহীত হয়। সবশেষে ১৯২৮ সালে Paris Pact of 1928 গৃহীত হয়, যা Kellog-Briand চুক্তি হিসেবেও পরিচিত। এ চুক্তির মাধ্যমে জাতিসমূহ রাষ্ট্রনীতি থেকে যুদ্ধ বর্জনের ঘোষণা দেয়। পরিশেষে, উনবিংশ শতাব্দীর অসংখ্য সম্মেলন আন্তর্জাতিক সংগঠনের সুদৃঢ় পটভূমি রচনা করে যার উপর ভিত্তি করে পরবর্তীকালে জাতিপুঞ্জ আর জাতিসংঘের ন্যায় বৃহৎ আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে উঠে।

জাতিসংঘ

প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পর 'লীগ অব নেশনস্'-এর সৃষ্টি হয়। লীগ অব নেশনস্ যুদ্ধ বন্ধ করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। লীগের ব্যর্থতার ফসল হচ্ছে ২য় বিশ্ব যুদ্ধ। যুদ্ধের অপূরণীয় ক্ষতির কারণে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ ২য় বিশ্ব যুদ্ধ চলাকালীন সময়েই একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন সৃষ্টির ব্যাপারে মনোনিবেশ করেন। মার্কিন রাষ্ট্রপতি মিঃ রুজভেল্ট জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ১৯৪২ সালের ১ জানুয়ারি ২৬টি দেশের প্রতিনিধিবৃন্দ তিন অক্ষ শক্তি জাপান, জার্মানী, ইটালি'র বিরুদ্ধে একত্রে লড়াই করার প্রত্যয় ব্যক্ত করে। এসময় সর্বপ্রথম 'জাতিসংঘ' নাম ব্যবহার করা হয়। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করণ এবং মানবাধিকার রক্ষা করাই ছিল জাতিসংঘের মূল লক্ষ্য। ১৯৪৫ সালের ২৬ জুন সানফ্রানিসেকোতে স্বাক্ষরিত সনদের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় জাতিসংঘ। জাতিসংঘের মূল অঙ্গ ছয়টি। যেমন সাধারণ পরিষদ, নিরাপত্তা পরিষদ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ, অছি পরিষদ, আন্তর্জাতিক আদালত এবং সচিবালয়। এছাড়া ১৬টি বিশেষায়িত সংস্থা রয়েছে যেগুলো সবই জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে। জাতিসংঘ যে লক্ষ্যে গঠিত হয়েছিল সে লক্ষ্য অর্জনে অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থ হলেও এর সাফল্য কম নয়। শান্তিপূর্ণ, স্থিতিশীল পৃথিবী গঠনে জাতিসংঘ সর্বদাই সচেষ্ট। এ বিশাল সংগঠনটি রাতারাতি গড়ে ওঠে নি। অনেক ঐতিহাসিক প্রচেষ্টার ফসল এই জাতিসংঘ। সেসব প্রচেষ্টার ধারাবাহিক আলোচনায় প্রথমে আসে :

সেন্ট জেম্স প্যালেস এর ঘোষণা (জুন-১২, ১৯৪১) : ১৯৪১ সালের জুন মাসে লন্ডনে নয়টি দেশের নির্বাসিত সরকারের প্রতিনিধিবৃন্দ একত্রিত হন। গ্রীস, বেলজিয়াম, চেকোশ্লোভাকিয়া, লুক্সেমবার্গ, হল্যান্ড, নরওয়ে সহ প্রভৃতি নির্বাসিত সরকারের প্রতিনিধি এবং যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ফ্রান্স এবং দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারের প্রতিনিধিগণ লন্ডনের জেম্স প্যালেসে মিলিত হন এবং তারা শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে ১৯৪১ সালের ১২ জুনে একটি ঘোষণায় স্বাক্ষর করেন।

আটলান্টিক সনদ : জেম্স প্যালেসের ঘোষণার পর ১৯৪১ সালের অপর উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে– আটলান্টিক সনদের অনুমোদন। দুই প্রধান পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর যুক্তরাজ্যের সরকার প্রধান রুজভেল্ট আর উইনস্টন চার্চিল আটলান্টিক মহাসাগরের এক জাহাজে বৈঠক করেন। ১৯৪১ সালের ১৪ আগস্ট স্বাক্ষরিত এই সনদে নাৎসীবাদের বিরুদ্ধে যৌথ প্রচেষ্টার ঘোষণা দেয়া হয়, শক্তির জোরে অপরের ভূ-খণ্ড দখল করাকে অবৈধ বলা হয় এ ঘোষণায়।

জাতিসংঘ ঘোষণা : ১৯৪২ সালের ১ জানুয়ারি সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ম্যাক্সিম লিটাভিনভ, আমেরিকার রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট, বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী উইন্সটন চার্চিল ও চীনের টি,ভি, সং জাতিসংঘ ঘোষণায় স্বাক্ষর করেন। পরবর্তীতে আরো ২০টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা এ ঘোষণায় স্বাক্ষর করে। পারস্পরিক সহযোগিতা এবং শত্রু রাষ্ট্রের সাথে অস্ত্র চুক্তি না করার অঙ্গীকার ছিল এ ঘোষণায়। এ ঘোষণাতেই প্রথম 'জাতিসংঘ' নামটি ব্যবহার হয়।

মস্কো ঘোষণা : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অক্ষ শক্তির বিরুদ্ধে যৌথ অভিযানের ঘোষণা দিয়ে স্বাক্ষরিত হয় মস্কো ঘোষণা। ১৯৪৩ সালের ৩০ অক্টোবর বৃটেন, আমেরিকা, রাশিয়া এবং চীনের প্রতিনিধিগণ মস্কো ঘোষণায় স্বাক্ষর করেন।

তেহরান সম্মেলন : ১৯৪৩ সালের ১ ডিসেম্বর তেহরান সম্মেলনে উইন্সটন চার্চিল, রুজভেল্ট ও স্টালিন একটি ঘোষণায় স্বাক্ষর করেন। বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য এ সম্মেলনে একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে জোর দেয়া হয়।

ডাম্বারটন ওকস্ সম্মেলন : ১৯৪৪ সালের আগস্ট থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ওয়াশিংটনের ডাম্বারটন ওকস্ নামক স্থানে শক্তিশালী রাষ্ট্রসমূহের মাঝে সংলাপ পরিচালিত হয়। প্রথম পর্যায়ে ২১ আগস্ট থেকে ২৮ সেপ্টম্বর পর্যন্ত আমেরিকা, বৃটেন এবং সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের মাঝে সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে ২৯ সেপ্টম্বর থেকে ৭ অক্টোবর পর্যন্ত আমেরিকা, বৃটেন এবং চীনের মধ্যে সংলাপ চলে। অবশেষে ৯ অক্টোবর একটি চূড়ান্ত দলিল প্রকাশিত হয়। এ সংলাপের মাধ্যমেই বিশ্ব সংগঠনের 'জাতিসংঘ' নামকরণ করা হয়। এ সংলাপে জাতিসংঘের প্রধান অঙ্গগুলোর ব্যাপারে আলোচনা হয়। তবে ডাম্বারটন ওকসে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই অমীমাংসিত থেকে যায়, যা পরবর্তীতে মীমাংসা করা হয়। যেমন নিরাপত্তা পরিষদে ভোটাভুটির পদ্ধতি।

ইয়াল্টা সম্মেলন : ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথমদিকে রুজভেল্ট, চার্চিল এবং স্টালিন এবং তাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রীগণ রাশিয়ার ইয়াল্টায় একত্রিত হন যুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করতে। ইয়াল্টা সম্মেলনে নিরাপত্তা পরিষদে ভোট দান পদ্ধতির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। একই বিষয়ে পরবর্তী ডাম্বারটন ওক্সে আমেরিকা ভোটাভুটির ব্যাপারে যে প্রস্তাব দিয়েছিল, ইয়াল্টা সম্মেলনে সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ সম্মেলনে উপস্থিত সকলেই সানফ্রান্সিসকোতে ২৫ এপ্রিল আন্তর্জাতিক সংগঠন সংক্রান্ত সম্মেলনের ব্যাপারে সম্মত হন। সানফ্রান্সিসকো সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল ডাম্বারটন ওকস্ সংলাপের প্রস্তাব অনুযায়ী জাতিসংঘের সনদ প্রণয়নের ব্যাপারে আলোচনা করা।

সানফ্রান্সিসকো সম্মেলন : ১৯৪৫ সালের ২৫ এপ্রিল ৫১টি দেশের প্রতিনিধিবৃন্দ সানফ্রান্সিসকোতে সমবেত হয়। মূলত এই সম্মেলনে বিশ্বের ৮০% জনগণের প্রতিনিধিত্ব ছিল বলা যায়। এই সম্মেলনে ১০টি অধিবেশন বসে। সম্মেলনে জাতিসংঘ সনদ এবং আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের সংবিধির বিষয়ে সকলেই ঐকমত্য পোষণ করেন। এ সম্মেলনে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রগুলোর অব্যাহত চাপের ফলে প্রধান পাঁচটি রাষ্ট্রের 'ভেটো' দানের ক্ষমতা স্বীকৃতি পায়। এ সম্মেলনে জাতিসংঘ সনদ গৃহীত হয়। সনদ গৃহীত হওয়ার সাথে সাথে তা কার্যকর হয় নি। ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর ৫১টি রাষ্ট্র স্বাক্ষর করার মাধ্যমে সনদ কার্যকর হয় এবং 'জাতিসংঘ' নামক আন্তর্জাতিক সংগঠনের যাত্রা শুরু হয়। সে থেকে ২৪ অক্টোবর জাতিসংঘ দিবস হিসেবে পালন হয়। বর্তমানে জাতিসংঘের সদস্য ১৯১টি দেশ।

জাতিসংঘের সদস্যপদ : জাতিসংঘ সনদের অনুচ্ছেদ ৪ অনুসারে যে সকল শান্তিপ্রিয় দেশ জাতিসংঘ সনদের নীতিমালা এবং সংগঠনের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে ইচ্ছুক এবং জাতিসংঘ সনদের দায়িত্বসমূহ পালনে সক্ষম ও আগ্রহী তারা সবাই জাতিসংঘের সদস্য হতে পারবে। নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক একটি নতুন রাষ্ট্রকে জাতিসংঘের সদস্য হিসেবেগ্রহণ করা হয়। সনদের নীতিমালা লঙ্ঘন করলে সে দেশকে জাতিসংঘ থেকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার কিংবা সে দেশের সদস্যপদ স্থগিত রাখার বিধান রয়েছে। (অনুচ্ছেদ ৫ এবং ৬)।

সনদ সংশোধনের বিধান : সনদের অনুচ্ছেদ ১০৮ অনুসারে সাধারণ পরিষদের দুই তৃতীয়াংশ সদস্য রাষ্ট্রের ভোটে এবং নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচটি স্থায়ী সদস্যসহ জাতিসংঘের দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের অনুমোদনক্রমে সনদ সংশোধন করা যেতে পারে। ১৯৬৫ সালে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য সংখ্যা পরিবর্তনের জন্য সনদের ২৩ নং ধারা সংশোধন করে সদস্য সংখ্যা ১১ থেকে ১৫ করা হয়েছে। একই বছর ৬১ ধারা সংশোধন করে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সদস্যপদ ১৮ থেকে বাড়িয়ে ২৭ করা হয়, পরে ১৯৭৩ সালে তা আবার সংশোধন করে ৫৪ করা হয়েছে।

প্রধান অঙ্গ : জাতিসংঘ ৬টি প্রধান অঙ্গ নিয়ে গঠিত। এগুলো হচ্ছে সাধারণ পরিষদ, নিরাপত্তা পরিষদ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ, অছি পরিষদ, সচিবালয় এবং আন্তর্জাতিক আদালত।

সাধারণ পরিষদ

সাধারণ পরিষদ জাতিসংঘের আলাপ-আলোচনার মূল কেন্দ্র। অনু : ৯ অনুসারে, যে সকল দেশ জাতিসংঘের সদস্য তারা সবাই সাধারণ পরিষদেরও সদস্য। সাধারণ পরিষদ এসব সদস্যের প্রত্যেকের রয়েছে একটি করে ভোট। সাধারণ পরিষদে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে যেমন নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে কিংবা বাজেট সংক্রান্ত প্রশ্নে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। জাতিসংঘের সনদ অনুযায়ী সাধারণ পরিষদ শান্তি ও নিরাপত্তার খাতিরে যে কোন আন্তর্জাতিক বিষয় আলোচনা করে থাকে। আলোচনা কালে যদি কোন নির্দিষ্ট বিষয় নিরাপত্তা পরিষদের আলোচনাধীন না থাকে তবে সে বিষয়ের উপরও সাধারণ পরিষদ আলোচনা করতে পারে। (অনুচ্ছেদ-১০)। সাধারণ পরিষদ অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করে। সাধারণ পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ ও অছি পরিষদ সদস্যদের নির্বাচিত করা, নিরাপত্তা পরিষদের সঙ্গে একযোগে আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারকদের নির্বাচিত করা। সাধারণ পরিষদ নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে জাতিসংঘের মহাসচিব নিয়োগ দেয়। সনদে প্রদত্ত ক্ষমতার বাইরেও জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ আরো অপরাপর ক্ষমতা চর্চা করতে পারে। যেমন ১৯৫০ সালের নভেম্বর মাসে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত 'শান্তির জন্য ঐক্য' প্রস্তাব অনুযায়ী, যদি কোন ঘটনায় শান্তি বিঘ্নিত কিংবা নষ্ট হয়, কোন দেশ অপর কোন দেশের ওপর আগ্রাসন চালায় এবং নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যের মতানৈক্যের কারণে তারা কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হয়; এ ধরনের ক্ষেত্রে সাধারণ পরিষদ পদক্ষেপ নিতে পারে। এ ধরনের বিষয় তৎক্ষণাৎ বিবেচনা করা এবং সদস্যদের প্রতি যৌথ পদক্ষেপ নেয়ার সুপারিশ করার ক্ষমতা সাধারণ পরিষদের আছে। এসব ক্ষেত্রে সাধারণ পরিষদ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে সশস্ত্র বাহিনী ব্যবহারের পদক্ষেপ নিতে সুপারিশ করতে পারে।

সাধারণ পরিষদের অধিবেশন

প্রতিবছর সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় মঙ্গলবার সাধারণ পরিষদের নিয়মিত অধিবেশন শুরু হয় এবং সাধারণত ডিসেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত অধিবেশন চলে। প্রতিটি নিয়মিত অধিবেশনের আগে পরিষদ একজন নতুন সভাপতি, ২১ জন সহ-সভাপতি ও পরিষদের ছয়টি প্রধান কমিটির চেয়ারম্যানদের নির্বাচিত করে। প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে একটি ভৌগলিক সমতা বজায় রাখতে পরিষদের সভাপতি পদটি প্রতিবছর আফ্রিকা, এশিয়া, পূর্ব ইউরোপ, দক্ষিণ আমেরিকা, পশ্চিম ইউরোপ ও অন্যান্য রাষ্ট্র এ পাঁচটি অঞ্চল থেকে পালাক্রমে নির্বাচিত হয়। নিয়মিত অধিবেশন ছাড়াও সাধারণ পরিষদের বিশেষ অধিবেশনও বসতে পারে। সাধারণ পরিষদের নিয়মিত অধিবেশনের আগে একটি সাধারণ বিতর্কের আয়োজন করা হয়, সেখানে বিশ্বের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ আন্তর্জাতিক অনেক বিষয় নিয়ে তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। সাধারণ পরিষদের একার পক্ষে ব্যাপক সংখ্যক বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা অসম্ভব হওয়ার কারণে পরিষদ অধিকাংশ বিষয় তার অধিনস্থ কমিটিগুলোর ওপর ন্যস্ত করে। পরিষদের অধিনস্থ প্রধান কমিটি ৬টি –

১. নিরস্ত্রীকরণ ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বিষয়ক কমিটি (১ম কমিটি)

২. অর্থনীতি ও আর্থিক বিষয়ক কমিটি (২য় কমিটি)

৩. সামাজিক, মানবকল্যাণ ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক কমিটি (৩য় কমিটি)

৪. বিশেষ রাজনৈতিক ও উপনিবেশ বিলোপ বিষয়ক কমিটি (৪র্থ কমিটি)

৫. প্রশাসনিক ও বাজেট বিষয়ক কমিটি (৫ম কমিটি)

৬. আইন বিষয়ক কমিটি (৬ষ্ঠ কমিটি)

এসব কমিটিতে ভোটের নিয়ম হচ্ছে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা। পূর্ণাঙ্গ সভায় কোন রকম বিরোধ না দেখা গেলে আনুষ্ঠানিক ভোট গ্রহণ ছাড়াই ধ্বনি ভোটেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ হতে পারে কিংবা নাম ডাকের মাধ্যমেও ভোট গ্রহণ করা যেতে পারে। পরিষদের গৃহীত সিদ্ধান্তগুলোর ব্যাপারে পরিষদ বিশ্ব জনমত এবং বিশ্ব জনমতের নৈতিক কর্তৃত্বের ওপর নির্ভরশীল কেননা এসব সিদ্ধান্তের বাধ্যবাধকতামূলক কোন শক্তি নেই।

নিরাপত্তা পরিষদ

নিরাপত্তা পরিষদ জাতিসংঘের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং শক্তিশালী অঙ্গ। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদের ভেটো দানের ক্ষমতা একে অত্যাধিক ক্ষমতাধর করে তুলেছে। সনদ অনুযায়ী-নিরাপত্তা পরিষদের মূল কাজ হচ্ছে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা। অনুচ্ছেদ ২৩ অনুসারে, নিরাপত্তা পরিষদ ১৫টি সদস্য নিয়ে গঠিত। এর মধ্যে ৫টি সদস্য স্থায়ী এবং বাকি ১০টি অস্থায়ী, যেগুলো সাধারণ পরিষদ কর্তৃক দুই বছর মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হয়। নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী ৫টি সদস্য রাষ্ট্র হচ্ছে চীন, ফ্রান্স, রুশ ফেডারেশন, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র। অনুচ্ছেদ ২৭ অনুসারে, পরিষদের প্রত্যেক সদস্যের ১টি করে ভোট রয়েছে। কার্য পরিচালনা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত ছাড়া অন্যান্য সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে ৫টি স্থায়ী সদস্যের ভোটসহ ৯টি ভোট প্রয়োজন হয়। এটি হচ্ছে বৃহৎ শক্তির ঐকমত্য যা সাধারণত ভেটো ক্ষমতা নামে পরিচিত। কোন স্থায়ী সদস্য যখন কোন সিদ্ধান্তকে সমর্থন করতে না চায় আবার ভেটো প্রয়োগ করে তা বানচাল করতেও অনিচ্ছুক হয় সে ক্ষেত্রে ভোট দানে বিরত থাকতে পারে। সনদ অনুযায়ী জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ ও বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। জাতিসংঘের অপরাপর সংগঠন সরকারসমূহের কাছে কেবল সুপারিশ পেশ করতে পারে, কেবল নিরাপত্তা পরিষদই পারে এমন সিদ্ধান্ত নিতে যা সনদ অনুযায়ী সদস্য রাষ্ট্রগুলো পালনে বাধ্য।

নিরাপত্তা পরিষদের কার্যক্রম : (অনুচ্ছেদ ৩৩-৫৪)

নিরাপত্তা পরিষদের মূল কাজ হচ্ছে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা। অনুচ্ছেদ ৩৪ অনুসারে, যে সব ঘটনা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে পারে, নিরাপত্তা পরিষদ সেসব ঘটনা তদন্ত করবে এবং এসব বিষয়ে কি পদক্ষেপ নেয়া যায় সে ব্যাপারে সুপারিশ করবে। প্রয়োজনে নিরাপত্তা পরিষদ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা নেবে। নিরাপত্তা পরিষদ শান্তি ও নিরাপত্তার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার পাশাপাশি, সাধারণ পরিষদের সহযোগে জাতিসংঘের মহাসচিব ও আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বিচারকও নিয়োগ দিয়ে থাকে।

অনুচ্ছেদ ২৮ অনুসারে, নিরাপত্তা পরিষদের প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রের একজন প্রতিনিধিকে সর্বদা জাতিসংঘের সদর দপ্তরের উপস্থিত থাকতে হয়। নিরাপত্তা পরিষদের শীর্ষ বৈঠক সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত হয়। তবে প্রয়োজনের খাতিরে সদর দপ্তরের বাহিরেও বৈঠক বসতে পারে। ১৯৭২ সালে ইথিওপিয়ার আদ্দিস আবাবায় পরিষদের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তারপরের বছর হয় পানামার পানামা সিটিতে।

যখন শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার উপক্রম হয়, তখন পরিষদ, শান্তিপূর্ণভাবে বিবাদ মীমাংসার জন্য পক্ষগুলোকে সুপারিশ করে। (অনুচ্ছেদ ৩৩) কখনো কখনো পরিষদ নিজেই তদন্ত ও মধ্যস্থতার কাজ করে। এ ব্যাপারে পরিষদ প্রতিনিধি নিয়োগ করতে পারে কিংবা মহাসচিবকে ব্যক্তিগতভাবে বা তার অফিসের মাধ্যমে সে কাজ করতে অনুরোধ করতে পারে। কখনো কখনো পরিষদ শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য নীতিমালা নির্ধারণ করে দিতে পারে।

যখন কোথাও পারস্পরিক বিবাদ যুদ্ধের রূপ নেয় তখন জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ চেষ্টা করবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যুদ্ধ বন্ধ করতে। জাতিসংঘের জন্মের পর থেকে নিরাপত্তা পরিষদ বিশ্বের অনেক জায়গায় যুদ্ধের বিস্তাররোধে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। অনেক জায়গায় নিরাপত্তা পরিষদ শান্তি রক্ষী বাহিনী নিয়োগ করে বিবাদমান দেশগুলোকে পৃথক করতে সক্ষম হয় এবং উত্তেজনার প্রশমন ঘটিয়ে আলোচনার পরিবেশ সৃষ্টি করে। শান্তি বজায় রাখার স্বার্থে পরিষদ অর্থনৈতিক বিধি নিষেধ আরোপ, বল প্রয়োগ কিংবা যৌথ সামরিক কার্যক্রমের সিদ্ধান্তও নিতে পারে।

নিরাপত্তা পরিষদ যে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয়, সাধারণ পরিষদ নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশে- সে রাষ্ট্রের সদস্যপদের অধিকার ও সুযোগ সুবিধা রহিত করতে পারে। যখন কোন রাষ্ট্র ক্রমাগতভাবে জাতিসংঘ সনদের বিধান লঙ্ঘন করতে থাকে, সে ক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ পরিষদ সে রাষ্ট্রকে জাতিসংঘ থেকে বহিষ্কার করতে পারে।

অনুচ্ছেদ ৩২ অনুসারে যে রাষ্ট্রটি নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য নয় কিন্তু নিরাপত্তা পরিষদের আলোচ্য বিষয়ে সে রাষ্ট্রটির স্বার্থ নিহিত আছে বলে নিরাপত্তা পরিষদ মনে করলে সে রাষ্ট্র পরিষদের আলোচনায় উপস্থিত থাকতে পারবে। অবশ্য তার কোন ভোটাধিকার থাকবে না।

নিরাপত্তা পরিষদের বিবেচনাধীন কোন বিষয়ে যে দেশটি জাতিসংঘের সদস্যও নয় তাকেও পরিষদ আলোচনায় আমন্ত্রণ জানাতে পারবে। কিভাবে জাতিসংঘের অসদস্য একটি রাষ্ট্র পরিষদের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবে সে ব্যাপারে পরিষদ নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষমতা রাখে।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ

জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কার্যক্রম এবং বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানগুলোর মাঝে সমন্বয় সাধনের ভূমিকা পালন করে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ। অনুচ্ছেদ ৬১ অনুসারে, এ পরিষদ ৫৪ সদস্য নিয়ে গঠিত। সদস্যরা তিন বছরের জন্য নির্বাচিত হয়ে থাকে। প্রতি বছর ১৮টি সদস্য রাষ্ট্র তিন বছর মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হয় এবং যে ১৮টি সদস্য রাষ্ট্রের তিন বছরের মেয়াদ শেষ হয় তাদের স্থান পূরণ করা হয়। সদস্যদের প্রত্যেকের ভোট একটি। সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের কার্যক্রম

(অনুচ্ছেদ ৬২-৬৬) আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়সমূহ আলোচনার মূল কেন্দ্র হচ্ছে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ। পরিষদ এসব বিষয়ে সুপারিশমালা তৈরি করে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়াবলী ছাড়াও সাংস্কৃতিক, শিক্ষামূলক, স্বাস্থ্য ও সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ পরিষদ পর্যালোচনা করে এবং এসব বিষয়ে রিপোর্ট ও সুপারিশ প্রদান করে। মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকারের ব্যাপারে শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টিতে পরিষদ ভূমিকা রাখে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ জাতিসংঘের সাথে বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্পর্ক স্থাপনের লক্ষ্যে তাদের সাথে আলাপ আলোচনা করে। অতঃপর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের কাছে সুপারিশ করার মাধ্যমে কাজের সমন্বয় সাধন করে। পরিষদ সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে দায়িত্ব পালন করে তা হলো বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে জাতিসংঘের সম্পর্ক স্থাপন। এক্ষেত্রে তারা নিজেদের কার্যক্রম নিয়ে বেসরকারি সংস্থাগুলোর সাথে মতবিনিময় করে। পরিষদ বৎসরে দুইবার মাসব্যাপী অধিবেশনে বসে। একটি অধিবেশন নিউইয়র্কে আরেকটি হয় জেনেভায়। পরিষদ অধিনস্থ কমিটি, কমিশন ও অপরাপর প্রতিষ্ঠানের সহযোগে এর কাজ কর্ম বাস্তবায়ন করে। এসব অধিনস্থ কমিশন, কমিটি নিয়মিত বৈঠকে বসে এবং পরিষদের কাছে রিপোর্ট পেশ করে।

সহযোগী প্রতিষ্ঠান : অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ, অনেকগুলো সহায়ক প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় এর কার্যক্রম পরিচালনা করে। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে ছয়টি কার্যনির্বাহী কমিশন, পাঁচটি আঞ্চলিক কমিশন, ছয়টি স্থায়ী কমিটি; এসব কমিটি ও কমিশনের পাশাপাশি অপরাধ দমন ও নিয়ন্ত্রণ, উন্নয়ন পরিকল্পনা, কর বিষয়ক আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং বিপদজনক দ্রব্য পরিবহনের ওপর আরো কয়েকটি স্থায়ী বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

বেসরকারি সংগঠন, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ : জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী যে সব বিষয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের কাজের আওতায় রয়েছে সে সব বিষয়ে পরিষদ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি করতে পারে। (অনুচ্ছেদ ৬৩) পরিষদ মনে করে এসব প্রতিষ্ঠানের মতামত প্রকাশের অধিকার থাকা উচিত, কেননা পরিষদের মত একই বিষয় নিয়ে যেসব বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কাজ করে, সে ক্ষেত্রে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞতা পরিষদের কাজে সহায়ক ভূমিকা রাখে। পরিষদ তার কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে ৯০০টিরও বেশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে পরামর্শ করে। এসব বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো তিন ধরনের হয়ে থাকে। এমন কিছু প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেগুলো পরিষদের বেশির ভাগ কাজের সাথে জড়িত, আর দ্বিতীয় প্রকারে এমন কিছু বেসরকারি সংস্থা যেগুলো বিশেষ বিষয়ে কাজ করে। অন্য প্রকার বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো মাঝে মধ্যে পরিষদের কোন সহায়ক প্রতিষ্ঠান অথবা জাতিসংঘের অন্য কোন সংগঠনের কাজে সহযোগিতা করে থাকে।

আন্তর্জাতিক আদালত

আন্তর্জাতিক আদালত জাতিসংঘের প্রধান ৬টি অঙ্গের অন্যতম। এটি মূল বিচার বিভাগীয় সংগঠন। এটি 'আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের সংবিধি' (Statute of the International Court of Justice) অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করে। এই সংবিধি জাতিসংঘ সনদের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

আন্তর্জাতিক আদালত কার্যক্রম পরিচালনা করে নেদারল্যান্ডের হেগ শহর থেকে। এর বিচারক সংখ্যা পনের জন। বিচারকগণ নিরাপত্তা পরিষদ ও সাধারণ পরিষদ কর্তৃক পৃথক পৃথকভাবে ভোটে নির্বাচিত হন। বিচারক নিয়োগ দেয়া হয় যোগ্যতার ভিত্তিতে, জাতীয়তার ভিত্তিতে নয়; তবে লক্ষ্য রাখা হয় যেন পূর্ণাঙ্গ আদালতে বিশ্বের প্রধান প্রধান যে সব আইন ব্যবস্থা রয়েছে, সেগুলোর প্রতিনিধিত্ব যেন ঘটে। (অনুচ্ছেদ-৯, আন্তর্জাতিক আদালত সংবিধি)। সংবিধি অনুযায়ী, এক দেশ থেকে দু'জন বিচারক হতে পারেন না; এরূপ কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হলে বয়োঃজ্যেষ্ঠ্য বিচারক প্রাধান্য পাবেন। আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারকগণের মেয়াদ কাল ৯ বছর; তবে মেয়াদান্তে পুনঃনির্বাচিত হতে পারেন। আন্তর্জাতিক আদালতের সকল বিচারকের মেয়াদকাল এক সঙ্গে শেষ হয় না; প্রতি তিন বছর অন্তর অন্তর পাঁচজন বিচারকের পরিবর্তন হয়। বিচারকার্যের ধারাবাহিকতার স্বার্থে এরূপ বিধান জরুরি।

আন্তর্জাতিক আদালতের এখতিয়ার

আন্তর্জাতিক আদালতের কার্যক্রমে এখতিয়ারের প্রশ্নটিই সবচে' প্রকট। সার্বভৌম সদস্য রাষ্ট্রসমূহের উপরে এমন কোন কেন্দ্রীয় সংস্থা নেই, যার সিদ্ধান্ত আপনা-আপনিই রাষ্ট্রসমূহের ওপর বাধ্যকরী হতে পারে। আন্তর্জাতিক আদালতের সবচে' বড় দুর্বলতা এখানেই। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আদালত সম্পর্কে আমাদের যে পরিচিত ধারণা, আন্তর্জাতিক আদালতের প্রকৃতি তার থেকে ভিন্ন। আন্তর্জাতিক আদালতের ক্ষমতা নিহিত আছে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সম্মতির মাঝে। এই সম্মতির অবর্তমানে আন্তর্জাতিক আদালত একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে

অবশ্য বাধ্যকরী কোন সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষমতা রাখে না। **Corfu Channel মামলায় (১৯৪৯) আদালত নিজেই অকপটে স্বীকার করেছে তার এই দুর্বলতার কথা।** মামলাটি পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

আন্তর্জাতিক আদালতের এখতিয়ারকে আমরা দু'ভাগে ভাগ করতে পারি :

ক. বিরোধমূলক এখতিয়ার বা Contentious Jurisdiction

খ. উপদেশমূলক এখতিয়ার বা Advisory Jurisdiction

ক. বিরোধমূলক এখতিয়ার : আন্তর্জাতিক আদালতের সংবিধির অনুচ্ছেদ ৩৬-এ বিরোধমূলক এখতিয়ার সংক্রান্ত দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়। অনুচ্ছেদ ৩৬ কে বিশ্লেষণ করলে আমরা বিরোধমূলক এখতিয়ারকে আবার তিন ভাগে ভাগ করতে পারি –

১. স্বেচ্ছামূলক এখতিয়ার (Voluntay Jurisdiction)

২. বাধ্যতামূলক এখতিয়ার (Compulsory Jurisdiction)

৩. ঐচ্ছিক এখতিয়ার (Optional Jurisdiction)

স্বেচ্ছামূলক এখতিয়ার : আন্তর্জাতিক আদালতের স্বেচ্ছামূলক এখতিয়ার সে সমস্ত মামলার ক্ষেত্রে বর্তমান, যে মামলাগুলো বিরোধের কোন একটি পক্ষ আন্তর্জাতিক আদালতে বিচারের জন্য প্রেরণ করে এবং অপর পক্ষ বা পক্ষসমূহ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্মতির মাধ্যমে আদালতের এখতিয়ারকে মেনে নেয়। বিরোধমূলক এখতিয়ারটি আরও পরিষ্কার করার জন্য অনুচ্ছেদ ৩৬ (১) উল্লেখ এখানে প্রাসঙ্গিক :

অনুঃ ৩৬ (১) : আন্তর্জাতিক আদালতের এখতিয়ার নিম্নোক্ত সকল মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যে মামলাগুলো :

i. পক্ষগণ বিচারের জন্য আদালতে পাঠায়

ii. এমন বিষয় সংক্রান্ত, যা জাতিসংঘ সনদ অনুসারে সুনির্দিষ্টভাবে আদালতের এখতিয়ারভুক্ত

iii. কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুসারে আদালতের এখতিয়ারভুক্ত

অনুচ্ছেদ ৩৬(১)-এর প্রথম অংশকে অনুসরণ করলেই আমরা স্বেচ্ছামূলক এখতিয়ারের সন্ধান পাচ্ছি।

বাধ্যতামূলক এখতিয়ার

অনুচ্ছেদ ৩৬(১)-এর অবশিষ্ট অংশই বাধ্যতামূলক এখতিয়ারের দিক নির্দেশক; অর্থাৎ জাতিসংঘ সনদে যে বিষয়গুলোকে আদালতের এখতিয়ারভুক্ত বলে চিহ্নিত করা আছে কিংবা যে বিষয়গুলো কোন আন্তর্জাতিক চুক্তির অধীনে আদালতের এখতিয়ারভুক্ত,

স্বাভাবিক কারণেই সে সমস্ত বিষয়াবলী সংক্রান্ত মামলা আন্তর্জাতিক আদালতের অধীনে আসবে। আন্তর্জাতিক আদালতের এই ধরনের এখতিয়ারকে বলা হয় বাধ্যতামূলক এখতিয়ার বা Compulsory Jurisdiction.

অনুচ্ছেদ ৩৬(১)-এর শেষাংশে যে দু'টি বিশেষ শ্রেণীর চুক্তির বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে, তা খুবই ভ্রমাত্মক। প্রথমত: জাতিসংঘ সনদ নিজেই একটি চুক্তি, আর দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, জাতিসংঘ সনদে এমন কোন বিষয়ের উল্লেখ করা হয় নি যার উপর আন্তর্জাতিক আদালতের বাধ্যতামূলক এখতিয়ার প্রয়োগ করা যেতে পারে। প্রকৃত প্রস্তাবে, আন্তর্জাতিক আদালতের সংবিধি প্রণেতাদের পরিকল্পনা ছিল যে, সনদ প্রণয়নের সময় এ বিষয়ে একটি সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা থাকবে, যা আজও সম্ভব হয় নি; এমনকি সমকালীন আন্তর্জাতিক আইনেও এই সমস্যার কোন সমাধান পাওয়া যায় নি।

ঐচ্ছিক এখতিয়ার

আন্তর্জাতিক আদালতের ঐচ্ছিক এখতিয়ারের উৎস হলো সংবিধির অনুচ্ছেদ ৩৬(২), এই অনুচ্ছেদ অনুসারে পক্ষগণ ইচ্ছা করলে নিম্নোক্ত চারটি বিষয়ে আদালতের বাধ্যতামূলক এখতিয়ারের অধিভুক্ত হতে পারে। পারস্পরিক সম্মতি নির্ভর এরূপ ক্ষমতা অর্পণ পক্ষগণের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে বলে একে ঐচ্ছিক এখতিয়ার বলে। উল্লিখিত বিষয়গুলো হলো :

i. কোন চুক্তির ব্যাখ্যা

ii. আন্তর্জাতিক আইনের কোন প্রশ্ন

iii. কোন ঘটনা যার অস্তিত্ব প্রমাণিত হলে তা আন্তর্জাতিক দায়দায়িত্বের লঙ্ঘন বলে বিবেচিত হবে; এবং

iv. কোন আন্তর্জাতিক দায়দায়িত্ব ভঙের ফলে দেয় ক্ষতিপূরণের প্রকৃতি ও পরিধি নির্ধারণ।

অনুচ্ছেদ ৩৬(২)-এর মাধ্যমে একদিকে আদালতের এখতিয়ারের পথ কিছুটা প্রসারিত করে অপর দিকে তাকে সঙ্কুচিত করা হয়েছে অনুচ্ছেদ ৩৬(৩)-এর মাধ্যমে। অনুচ্ছেদ ৩৬(৩) অনুযায়ী অনুচ্ছেদ ৩৬(২)-এর অধীনে কৃত কোন ঘোষণা শর্তহীনভাবে করা যেতে পারে, আবার অন্যান্য রাষ্ট্রের অনুরূপ দায়িত্বগ্রহণের শর্ত সাপেক্ষেও করা যেতে পারে। এই ধরনের শর্তারোপ (Condition of Reciprocity) অনুচ্ছেদ ৩৬(২)-এর সুযোগকেই সঙ্কুচিত করেছে। দীর্ঘ দিনের চর্চায় দেখা গেছে যে, যে সকল রাষ্ট্র আদালতের এখতিয়ার গ্রহণ সংক্রান্ত ঘোষণা করেছে, তারা তা এতো বেশি শর্ত সাপেক্ষে করেছে যে, এ সমস্ত ঘোষণার কার্যকারিতা ন্যূনতম পর্যায়ে নেমে এসেছে।

আন্তর্জাতিক আদালতের উপদেশমূলক এখতিয়ার

আন্তর্জাতিক আদালতের কর্মকাণ্ডের একটি বড় অংশ জুড়ে আছে এর উপদেশমূলক এখতিয়ারের প্রয়োগ। জাতিসংঘ সনদের অনুচ্ছেদ ৯৬ অনুসারে আন্তর্জাতিক আদালত এই

ক্ষমতা ভোগ করে থাকে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ও নিরাপত্তা পরিষদ আইনগত প্রশ্নে আন্তর্জাতিক আদালতের কাছে উপদেশ (Advice) চাইতে পারে। শুধু তাই নয়, জাতিসংঘের অন্যান্য অঙ্গ সংগঠন এবং বিশেষায়িত সংস্থাগুলোও তাদের স্ব-স্ব কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে কোন আইনগত প্রশ্নে আদালতের মতামত চাইতে পারে। আন্তর্জাতিক আদালতের এই ধরনের এখতিয়ারকেই উপদেশমূলক এখতিয়ার (Advisory Jurisdiction) বলা হয়। আন্তর্জাতিক আদালতের উপদেশমূলক মতামতের কোনরূপ বাধ্যকরী প্রভাব নেই; এমনকি যে সংস্থা এই মতামত চাচ্ছে, তার উপর এর কোন বাধ্যকরী প্রভাব থাকবে না। তবে সংশ্লিষ্ট সংস্থা যদি চায়, তবে সে নিজেকে এর আওতায় বাধ্যকরী ভাবতে পারে। বাস্তবে দেখা যায় যে, সব অনুরোধকারী আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পক্ষ উপদেশমূলক অভিমত গ্রহণ করেছে এবং এ ধরনের অনেক উপদেশমূলক অভিমত নিঃসন্দেহে আন্তর্জাতিক আইনের অগ্রগতি ও ক্রমবিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, আন্তর্জাতিক আদালতের উপদেশমূলক অভিমতকে কেবলমাত্র একটি আইনগত অভিমত বলে ধরে নেয়ার সুযোগ নেই, এগুলোকে বিচার বিভাগীয় ঘোষণা (Judicial Pronouncement) হিসেবে ধরে নেয়া হয়। একাধিক মামলায় আদালত তার আইনগত প্রকৃতি সম্পর্কে বলেছে যে, এটা একটা বিচারিক প্রতিষ্ঠান; কাজেই আইনগত অভিমত প্রদানের মাধ্যমে একটি বিচারিক দায়িত্বই পালন করা হয়। এই অভিমত আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বিদ্যমান সর্বোচ্চ আদালতের অভিমত; কাজেই এর নৈতিক মূল্য ও প্রভাব অপরিসীম।

আন্তর্জাতিক আদালতের রায়ের গুরুত্ব

আন্তর্জাতিক আদালতের এখতিয়ার সম্পর্কিত পূর্ববর্তী আলোচনায় দেখা গেছে আদালত কর্তৃক সকল ধরনের এখতিয়ার প্রয়োগের ক্ষেত্রে পক্ষগণের সম্মতি আবশ্যক। এই সম্মতির অনুপস্থিতিতে আদালতের নিজস্ব কোন এখতিয়ার নেই। আন্তর্জাতিক আদালতের সবচে' বড় দুর্বলতা এটাই। শুধুমাত্র যখন পক্ষগণ একটি বিরোধপূর্ণ বিষয়ে আদালতের স্মরণাপন্ন হয়, কিংবা পরোক্ষভাবে আদালতের এখতিয়ারকে স্বীকার করে নেয়, তখনই কেবল আদালতের রায় তাদের উপর বাধ্যকরী হয়। আর এই কারণেই সাধারণত আন্তর্জাতিক বিরোধের পক্ষসমূহ আন্তর্জাতিক আদালতের রায় অমান্য করে না। তবে এক্ষেত্রেও দু'একটি ব্যতিক্রম আছে। যেমন : **Corfu Channel Case (1949)** এবং **Nuclear Test Case (1979)**। ফলে এটা বলা যায় যে, আন্তর্জাতিক আইনের রায় সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের কাছে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ; পক্ষসমূহ এই রায় দ্বারা বাধ্য।

তবে, আন্তর্জাতিক আদালতের সংবিধির অনুচ্ছেদ ৫৯ অনুসারে আন্তর্জাতিক আদালতের কোন রায় অপর কোন মামলায় নজির হিসেবে প্রয়োগযোগ্য নয়। এটি একটি বড় সীমাবদ্ধতা। তবে খুব সংকীর্ণ অর্থে এই বিধানকে ব্যবহার করার সুযোগ নেই, কারণ আদালত সাধারণত তার পূর্ববর্তী রায় থেকে বিচ্যুত হয় না। তাই সংবিধি অনুসারে নজির

(Precedent)-এর প্রয়োগের বিধান না থাকলেও বাস্তবে এর প্রয়োগ হচ্ছে। আর এভাবে আন্তর্জাতিক আইন বিকশিত হচ্ছে। আমরা যখনই আন্তর্জাতিক আদালতের রায়ের গুরুত্ব পর্যালোচনা করি, একটা বিষয় আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আন্তর্জাতিক আইন একটি বিকাশমান আইন; আর এই আইন বিকাশে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আন্তর্জাতিক আদালতের সিদ্ধান্তসমূহ। এর সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে আদালতের সংবিধিতেই। অনুচ্ছেদ ৩৮(১)(ঘ) অনুসারে আন্তর্জাতিক আদালত, আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে বিরোধ মীমাংসার ক্ষেত্রে আদালতের রায় প্রয়োগ করতে পারে। এছাড়াও ৫৯ নং অনুচ্ছেদের বাধা থাকলেও কোন মামলা বিচার করতে গিয়ে সুনির্দিষ্ট চুক্তি, প্রথা ইত্যাদি না পাওয়া গেলে আদালত স্বাভাবিকভাবেই দেখতে পারে, পূর্বে এধরনের সমস্যায় কি ধরনের সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছিল। এ দিক থেকে বিবেচনা করলে আন্তর্জাতিক আদালতের রায়, আন্তর্জাতিক আইনের বিকাশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সচিবালয়

(অনুচ্ছেদ ৯৭–১০১) নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে ও বাইরে কর্মরত জনশক্তি নিয়ে জাতিসংঘের সচিবালয় গঠিত। সচিবালয় থেকেই জাতিসংঘের দৈনন্দিন কাজ পরিচালিত হয়। সচিবালয় জাতিসংঘের অন্যান্য অঙ্গ সংগঠনের কাজে সহযোগিতা করে এবং তাদের দ্বারা গৃহীত কর্মসূচি ও নীতিসমূহ বাস্তবায়ন করে। সচিবালয়ের প্রধান হচ্ছেন মহাসচিব, তিনি নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক পাঁচ বছর মেয়াদ কালের জন্য নির্বাচিত হন।

অছি পরিষদ

(অনুচ্ছেদ ৮৬-৯১) অছি পরিষদ জাতিসংঘের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ সংগঠন। এ পরিষদের কাজ হচ্ছে অছি ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলগুলোর প্রশাসনিক কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ করা। এ পরিষদ চেষ্টা করে যেন অছি অঞ্চলের জনগণ উন্নয়ন, স্বাধীনতা ও স্বাধিকারের দিকে যেতে পারে। অছি পরিষদ সাধারণ পরিষদের অধীনে কাজ করে। তবে কিছু সাময়িকভাবে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে অছি পরিষদ নিরাপত্তা পরিষদের নেতৃত্বে কাজ করে। সনদ অনুযায়ী অছি পরিষদের অর্ধেক সদস্য হবে তারা যারা অছি অঞ্চলে শাসন করে আর অর্ধেক সদস্য হবে তারা যারা শাসন করে না। অছি অঞ্চলের সংখ্যা কমে যাওয়ায় এই পরিষদের সদস্য সংখ্যাও বর্তমানে কমে গেছে। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ৫। দেশগুলো হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র (শাসক দেশ) এবং নিরাপত্তা পরিষদের অন্যান্য স্থায়ী সদস্য দেশগুলো যেমন চীন, রুশ ফেডারেশন, ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্য। ভোট দানের ক্ষেত্রে পরিষদে সব সদস্যের ১টি করে ভোট। সিদ্ধান্ত হয় সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায়।

অছি পরিষদ, অছি অঞ্চলের জনগণের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষাগত উন্নয়নের ব্যাপারে শাসক মহলের প্রদত্ত রিপোর্ট সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করে এবং রিপোর্ট পরীক্ষা করে দেখে। অছি পরিষদ শাসক মহলের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে অছি

অঞ্চল থেকে দরখাস্ত গ্রহণ করে থাকে এবং নিয়মিত ও অনিয়মিতভাবে এসব অঞ্চল পরিদর্শন করে থাকে।

জাতিসংঘের এই অছি পরিষদ তার কর্মকাণ্ডে সর্বাধিক সফল। ১৯৯৪ সালে পালাউ স্বাধীনতা লাভ করার সাথে সাথে অছি পরিষদের কর্মকাণ্ডের সফল পরিসমাপ্তি ঘটে। এরপরে পরিষদ প্রয়োজনে অধিবেশনে মিলিত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

জাতিসংঘের আইনগত মর্যাদা

জাতিসংঘের আইনগত মর্যাদা সংক্রান্ত বিতর্ক একটি অতি পুরাতন বিষয়; বর্তমানে এতদসংক্রান্ত বিতর্কের কোন অবকাশ নেই। একটি আইনগত ব্যক্তি (Legal person) হিসেবে জাতিসংঘের মর্যাদা স্বীকৃত। এর প্রমাণ মেলে জাতিসংঘের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড থেকেই। জাতিসংঘের চুক্তিবদ্ধ হওয়ার ক্ষমতা, স্বনামে মামলা করার ক্ষমতা, নিজস্ব বাহিনী পরিচালনা, নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রাপ্ত সুবিধা ও দায়মুক্তি ইত্যাদি সবই জাতিসংঘের আইনী অস্তিত্বেরই পরিচায়ক। শুধু তাই নয়, আন্তর্জাতিক আদালতের রায়েই এই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়।

মামলা : Reparations Case; ক্ষতিপূরণ মামলা; (ICJ, 1949)

মামলার বিষয়বস্তু : ১৯৪৮ সালে Bernadatte নামক জাতিসংঘের একজন কর্মকর্তা ফিলিস্তিনে জাতিসংঘের পক্ষে সমঝোতাকারীর দায়িত্ব পালনকালে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে নিয়োগকারী সংস্থা হিসেবে জাতিসংঘ নিহতের পক্ষে ক্ষতিপূরণ দাবি করে ইসরাইলের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা দায়ের করে।

বিচার্য বিষয় : একটি সংগঠন হিসেবে জাতিসংঘ ক্ষতিপূরণ দাবি করে কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা দায়ের করতে পারে কি-না?

সিদ্ধান্ত : এই মামলার সিদ্ধান্তে আদালত জাতিসংঘের গঠনের পেছনে বিশ্ব সম্প্রদায়ের সম্মতি এবং জাতিসংঘের ব্যাপক ভিত্তিক কর্মকাণ্ডের উল্লেখ করে মত প্রকাশ করেন যে, যদি জাতিসংঘের আইনগত অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়, তবে এর কর্মকাণ্ড বাধাগ্রস্ত হবে এবং এরূপ সিদ্ধান্ত বাস্তবতা বিরুদ্ধ হবে। যদিও জাতিসংঘকে কোন রাষ্ট্রের সমতুল্য ভাবার কোন অবকাশ নেই, তথাপি জাতিসংঘের নিজস্ব একটি আইনী চরিত্র আছে এবং এই কারণেই জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক আদালতে ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারে। ১৯৪৯ সালের এই রায়ের পর জাতিসংঘের আইনী অস্তিত্ব একটি প্রতিষ্ঠিত রূপ পরিগ্রহ করেছে।

আন্তর্জাতিক আইনে বল প্রয়োগ ও হস্তক্ষেপ

Use of Force and Intervention in International Law

আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তি বা বল প্রয়োগের সম্ভাবনা আদৌ নেই বললেই চলে। শক্তি প্রয়োগ না করার নীতি মূলত প্রথা ভিত্তিক আন্তর্জাতিক আইনের একটি নীতি, যা বর্তমানে আন্তর্জাতিক আইনের অন্যতম মূলনীতি হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। জাতিসংঘ সনদের অনুচ্ছেদ ২(৪) এ স্পষ্টভাবেই বলা আছে যে–

'আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সকল সদস্য আঞ্চলিক অখণ্ডতার বিরুদ্ধে কিংবা অন্য কোন রাষ্ট্রের রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বল প্রয়োগের ভীতি প্রদর্শন থেকে এবং জাতিসংঘের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন কোন উপায় গ্রহণ করা থেকে নিবৃত্ত থাকবে।'

বল প্রয়োগ না করার এই নীতি পরবর্তীতে ১৯৭০ সালের 'জাতিসংঘ সনদ অনুসারে রাষ্ট্রসমূহের মধ্যকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এবং পারস্পরিক সহযোগিতা বিষয়ক আন্তর্জাতিক আইনের মূলনীতি সংক্রান্ত ঘোষণা'র মাধ্যমে বিস্তৃত রূপ লাভ করে। ১৯৭০ সালের এই ঘোষণায় স্পষ্ট করেই উল্লেখ করা হয় যে–

ক. আগ্রাসী যে কোন যুদ্ধই হচ্ছে শান্তির বিরুদ্ধে একটি আন্তর্জাতিক অপরাধ, যার জন্য আন্তর্জাতিক দায়-দায়িত্বের উদ্ভব ঘটে;

খ. রাষ্ট্রসমূহ বিদ্যমান আন্তঃরাষ্ট্রীয় সীমারেখা পরিবর্তন বা আন্তর্জাতিক বিরোধ নিরসনের জন্য বল প্রয়োগ বা বল প্রয়োগের হুমকি প্রদর্শন থেকে বিরত থাকবে;

গ. রাষ্ট্রসমূহ তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব অনুসারে এমন কোন প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে বাধ্য, যাতে শক্তি বা বল প্রয়োগের অবকাশ থাকে;

ঘ. জনগণকে তাদের আত্মঃনিয়ন্ত্রণের অধিকার বা স্বাধীনতার অধিকার থেকে বঞ্চিত করার লক্ষ্যে যে কোন ধরনের শক্তি বা বল প্রয়োগ থেকে রাষ্ট্রসমূহ নিবৃত্ত থাকবে;

ঙ. অন্য কোন রাষ্ট্রে রাজনৈতিক গোলযোগ বা সন্ত্রাসমূলক কর্মকাণ্ড সংগঠন, প্ররোচনা, সহায়তা প্রদান বা অংশগ্রহণ থেকে রাষ্ট্রসমূহ বিরত থাকতে বাধ্য।

উপরের এই নীতিসমূহের মাধ্যমে বল প্রয়োগের নীতিটি কতোটা সামগ্রিক অর্থে বিশ্লেষিত হওয়া প্রয়োজন, তা অনুধাবন করা কষ্টকর নয়। বস্তুত: আন্তর্জাতিক আইনে কোন অবস্থাতেই শক্তি প্রয়োগকে বৈধতা দান করা হয় নি। অবশ্য এক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রম রয়েছে; তা হলো– আত্মরক্ষার (Self defence) ক্ষেত্রে। অর্থাৎ কোন রাষ্ট্র তার ভূ-খণ্ডিক বা রাজনৈতিক অখণ্ডতা রক্ষার জন্য শক্তি প্রয়োগ করে থাকলে আন্তর্জাতিক আইনে তা বে-

আইনী বলে বিবেচিত না-ও হতে পারে। এই অবস্থার বিশ্লেষণের জন্য আমাদের প্রথমেই দু'টি ধারণা পরিষ্কার করে নেওয়া উচিত।

প্রথমত: বল প্রয়োগ বলতে কি বুঝায়? দ্বিতীয়ত: আত্মরক্ষার অধিকার বলতে কি বোঝানো হয়?

শক্তি বা বলপ্রয়োগ বলতে কি শুধুই সামরিক ও রাজনৈতিক শক্তিপ্রয়োগই বুঝায়; না কি এটি অর্থনৈতিক বা অন্যপ্রকার চাপ প্রয়োগকেও অন্তর্ভুক্ত করে, আন্তর্জাতিক আইনে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। সাম্প্রতিককালে সামরিক শক্তি প্রয়োগ কদাচিৎ হলেও একেবারেই যে হয় না, তা বলা যায় না; তথাপি বল প্রয়োগ শুধুমাত্র সামরিক বা রাজনৈতিক প্রয়োগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। অর্থনৈতিক বা অন্য কোন ধরনের চাপ প্রয়োগও বল প্রয়োগ বলে বিবেচিত হওয়া সমীচীন মনে হয়। তাই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সম্মতি ব্যতিরেকে কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যদি অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করা হয়, সেটিও বল প্রয়োগের একটি প্রকার বলে দৃশ্যমান। এক্ষেত্রে কিউবার বিরুদ্ধে আমেরিকার গত ৪০ বছরের অধিক সময় ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক আরোপিত অবরোধ, শক্তি প্রয়োগ বলে বিবেচনা করা যায়। তেমনিভাবে ১৯৭৩-৭৪ সালে পেট্রোলিয়াম রপ্তানীকারক দেশগুলোর সংগঠন (OPEC) আরব রাষ্ট্রসমূহের চাপে তৈলকে যে পশ্চিমা রাষ্ট্রসমূহের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছিল, সেটিকেও বল প্রয়োগ বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। এতে করে বোঝা যায় যে, বল প্রয়োগ শুধু সামরিক বল প্রয়োগের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়।

এবার আসা যাক 'আত্মরক্ষা'র প্রসঙ্গে। আত্মরক্ষার অধিকারটি কি এবং কখন আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে বল প্রয়োগ আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন বলে বিবেচিত হবে না, সে অবস্থার একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় **Caroline Case, 1948-এ**।

মামলা : Caroline Case; ক্যারোলিন মামলা; (1948)

মামলার ঘটনা : কানাডা যখন বৃটেনের উপনিবেশ ছিল, সে সময় কানাডার একটি বিদ্রোহী গ্রুপ সে দেশের সরকারকে উৎখাত করার চেষ্টা করে। Caroline নামক একটি জাহাজ আমেরিকার অভ্যন্তরীণ নায়াগ্রা থেকে অস্ত্র ও যোদ্ধা বহনের মাধ্যমে ঐ বিদ্রোহী গ্রুপকে সহযোগিতা প্রদান করতে থাকে। বৃটেন আমেরিকার সরকারের এরূপ কর্মকাণ্ডের কঠোর প্রতিবাদ করেও কোন ফললাভে ব্যর্থ হয়। ফলশ্রুতিতে বৃটিশ সৈন্যরা আমেরিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে জাহাজটিকে আটক করে।

বিবেচ্য বিষয় : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বৃটেনের এই কাজের কঠোর নিন্দা করে এবং বৃটেনকে তার এহেন কাজের যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে বলে।

সিদ্ধান্ত : বৃটেন তার এরূপ কাজের যৌক্তিকতা প্রমাণে ব্যর্থ হয় এবং এর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।

এই মামলায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রী বৃটেনের পররাষ্ট্র মন্ত্রীকে যে পত্র লিখেছিলেন, সেখানে আত্মরক্ষার অধিকারের একটি সংজ্ঞা পাওয়া যায়, যা বর্তমানে স্বীকৃত সংজ্ঞা, সেখানে আত্মরক্ষার অধিকারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন যে, **'আত্মরক্ষার প্রয়োজনীয়তা হতে হবে তাৎক্ষণিক, সর্বগ্রাসী, সর্বশেষ পন্থা এবং যখন চিন্তা-ভাবনার কোন অবকাশ থাকে না।'** সুতরাং আত্মরক্ষার প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই আমাদের পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে, আত্মরক্ষার জন্য শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা কতোটা গভীর, বিকল্প ব্যবস্থা অনুসন্ধানের কোন সম্ভাবনা বিরাজ করে কি-না এবং বিকল্প সম্ভাবনা বাস্তবায়নের কোন সময় আদৌ আছে কি-না। এরূপ ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগকে আন্তর্জাতিক আইন বৈধতা দান করে। তবে মনে রাখতে হবে যে, এমনকি আত্মরক্ষার জন্য শক্তি প্রয়োগও যেন অযৌক্তিক **(Unreasonable)** এবং অতিরিক্ত **(Excessive)** না হয়।

আত্মরক্ষার এরূপ অধিকার জাতিসংঘ সনদেও স্বীকৃত। জাতিসংঘ সনদের অনুচ্ছেদ ৫১-তে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা আছে যে–

'জাতিসংঘের কোন সদস্যের উপর কোন সশস্ত্র আক্রমণ ঘটলে যতক্ষণ পর্যন্ত না আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি নিরাপত্তা পরিষদ গ্রহণ করছে, ততক্ষণ সেই রাষ্ট্রের একক সহজাত অধিকার বা যৌথ আত্মরক্ষার অধিকার সম্বন্ধে বর্তমান সনদের কোন অংশই অন্তরায় হবে না। আত্মরক্ষার এই অধিকার কার্যকর করার জন্য সদস্যগণ কর্তৃক অবলম্বিত ব্যবস্থাদি সঙ্গে সঙ্গেই নিরাপত্তা পরিষদের নিকট পেশ করতে হবে এবং এর ফলে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সংরক্ষণ বা পুনরুদ্ধারের জন্য এই সনদ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় বিধি ব্যবস্থা গ্রহণে নিরাপত্তা পরিষদের কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব কোন মতেই বাধাগ্রস্ত হবে না।'

অবশ্য নিকারাগুয়া মামলা (নিকারাগুয়া বনাম ইউ.এস.এ; আন্তর্জাতিক আদালত, ১৯৮৬) ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার অধিকারের বিস্তৃতি নিয়ে মত পার্থক্য লক্ষ্য করা গিয়েছিল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক নিকারাগুয়ার সরকার বিরোধী Contra বিপ্লবীদের প্রতি সাহায্যকে আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগের উদাহরণ হিসেবে দেখানোর প্রয়াস পেয়েছিল; যদিও আন্তর্জাতিক আদালত এরূপ যুক্তিকে প্রত্যাখ্যান করে।

আত্মরক্ষার এই অধিকার বিশেষ করে দু'টি ক্ষেত্রে অনুভূত হয় :

১. সশস্ত্র আক্রমণ

২. বিদেশে অবস্থানরত নাগরিক ও সম্পত্তি সংরক্ষণের জন্য

বলাই বাহুল্য যে প্রতিটি ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে হুমকি হতে হবে প্রকৃত এবং কখনোই ধারণা প্রসূত নয়। যে কোন ক্ষেত্রেই এবং জাতিসংঘ সনদের অনুচ্ছেদ ৫১ হতে এটি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান যে, আত্মরক্ষা হতে পারে একক এবং যৌথ। আবার যৌথ আত্মরক্ষা দু'টি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে :

১. একটি চুক্তিতে রাষ্ট্রসমূহের একক আত্মরক্ষার অধিকারের সমন্বয় সাধন, অর্থাৎ এটি বিভিন্ন রাষ্ট্রের আত্মরক্ষার অধিকারের যোগফল

২. যৌথ-আত্মরক্ষা বলতে আঞ্চলিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাকেও বুঝানো যেতে পারে; যেমন ন্যাটো বা অধুনালুপ্ত ওয়ারসো প্যাক্টের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ।

আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে যদি প্রথম অর্থে এটিকে ব্যবহার করা হয়, তাহলে প্রায়শঃই যে সমস্যার সৃষ্টি হয়, তা হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট রাষ্ট্রের প্রতি হুমকি, প্রকৃত হুমকি কি-না? কারণ অনেক ক্ষেত্রে হুমকিটি সুস্পষ্ট না-ও হতে পারে; সেক্ষেত্রে আত্মরক্ষার জন্য শক্তি প্রয়োগ কতোটা যুক্তিপূর্ণ, সে বিষয়ে বিশদ আলোচনার সুযোগ থাকে, তবে সাধারণতঃ যৌথ আত্মরক্ষাকে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অধিক ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তবে এরূপ যৌথ আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগের জন্য দু'টি শর্তপূরণ আবশ্যক। এই শর্তসমূহ নিকারাগুয়া মামলায় আন্তর্জাতিক আদালত কর্তৃক নির্নিত হয়েছে। শর্তগুলো হচ্ছে :

ক. আক্রান্ত রাষ্ট্র কর্তৃক পূর্ব ঘোষণা

খ. আক্রান্ত রাষ্ট্র কর্তৃক যৌথ আত্মরক্ষার অনুরোধ

উদাহরণ স্বরূপ ১৯৯১ সালের বহুজাতিক বাহিনী কর্তৃক কুয়েতে সামরিক অভিযানের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। স্মর্তব্য যে, ইরাক কর্তৃক কুয়েত দখল হবার পর বিদেশে অবস্থানরত কুয়েতী সরকার ইরাকী আগ্রাসন সম্পর্কে ঘোষণা দিয়েছিল; ঠিক তেমনিভাবে জাতিসংঘের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে সাহায্যের আবেদন জানানো হয়েছিল, যার মাধ্যমে জাতিসংঘ সনদের অনুচ্ছেদ ৫১-এর বাস্তবায়ন ঘটানো হয়।

হস্তক্ষেপ (Intervention)

হস্তক্ষেপ না করার নীতিটি প্রথাভিত্তিক আন্তর্জাতিক আইন থেকে উৎসারিত এবং সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহের আঞ্চলিক ভূ-খণ্ডতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ধারণার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনের অন্যতম প্রধান যে মূলনীতি– রাষ্ট্রসমূহের সার্বভৌম সমতার নীতি, তা ব্যাখ্যা করলে এটি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, প্রত্যেকটি রাষ্ট্র স্বাধীনভাবে তার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা এবং পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের অধিকার সংরক্ষণ করে। এর কোন ক্ষেত্রেই অন্য কোন রাষ্ট্র কোনভাবেই হস্তক্ষেপ করতে পারে না। যে কোন ধরনের হস্তক্ষেপই আন্তর্জাতিক আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন বলে বিবেচিত হতে বাধ্য। পূর্বের আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, শক্তি প্রয়োগ বলতে শুধু সামরিক শক্তি প্রয়োগকেই বুঝায় না, এটি যে কোন ধরনের অযাচিত চাপ প্রয়োগকেই বোঝায়। তাই হস্তক্ষেপ না করার নীতির লঙ্ঘন প্রকারান্তরে শক্তি প্রয়োগ না করার নীতিরই বহিঃপ্রকাশ।

আধুনিক বিশ্ব ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপের ঘটনা সচরাচর ঘটে থাকে গৃহযুদ্ধের অবস্থাকালীন সময়ে। গৃহযুদ্ধ সাধারণতঃ রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয় হিসাবেই বিবেচিত হয়ে থাকে; তবে যদি কোন জনগোষ্ঠী বা জনসমষ্টি আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামরত থাকে, তবে এটিকে কোনভাবেই গৃহযুদ্ধ বলে বিবেচনা করা হয় না। পূর্ব বাংলার জনগণের স্বাধিকার আন্দোলনের সংগ্রাম তাই পাকিস্তানের গৃহযুদ্ধ হিসেবে নয় বরং পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার সংগ্রাম হিসেবেই বিবেচিত হয়েছে।

গৃহযুদ্ধ যেহেতু রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ সমস্যা, সেহেতু সেক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগের বিষয়টি সন্দেহের উদ্রেক করে; অর্থাৎ গৃহযুদ্ধের মোকাবেলায় সরকার বা রাষ্ট্রকর্তৃক শক্তি প্রয়োগ, আন্তর্জাতিক আইনের শক্তি প্রয়োগ না করার নীতির লঙ্ঘন কি-না, তা অনেক সময় বিতর্কের সৃষ্টি করে। অনেক আইনবিদ মনে করেন যে, জাতিসংঘ সনদের অনুচ্ছেদ ২(৪)-এ বল প্রয়োগ না করার যে নীতির কথা বলা হয়েছে, তা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং তাই এই সকল আইনবিদদের মতানুসারে গৃহযুদ্ধের সময় রাষ্ট্র বা সরকার কর্তৃক বল প্রয়োগ আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন বলে বিবেচিত হতে পারে না। সামগ্রিক অর্থে এই যুক্তিটি গ্রহণযোগ্য হলেও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সমকালীন আন্তর্জাতিক আইনে, এমনকি অভ্যন্তরীণ বিষয়েও শক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে একটি রাষ্ট্র সীমাহীন স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে না এবং রাষ্ট্রকর্তৃক শক্তি প্রয়োগ যখনই মানবাধিকার লঙ্ঘনের পর্যায়ে পড়ে, তখনই তা আন্তর্জাতিক আইনে বিবেচ্য হয়ে দাঁড়ায়।

গৃহযুদ্ধের সময়ে এরূপ শক্তিপ্রয়োগ অনেক সময় অন্য রাষ্ট্রের সহায়তাতেও হতে পারে, যা হস্তক্ষেপের সমতুল্য। তবে অনেক সময়ই তৃতীয় রাষ্ট্র কর্তৃক হস্তক্ষেপকে বৈধ হিসেবে প্রতিভাত করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় এই যুক্তিতে যে, অপর একটি রাষ্ট্র ইতোমধ্যেই গৃহযুদ্ধরত কোন একটি পক্ষকে সাহায্য ও সহযোগিতা করছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, ১৯৭৫-৭৬ সালে এঙ্গোলার গৃহযুদ্ধের সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন ও কিউবা যখন এঙ্গোলার সরকারের সামরিক সাহায্যে এগিয়ে আসে এবং অনেক রাষ্ট্রই এটিকে অবৈধ হস্তক্ষেপ হিসেবে ঘোষণা দেয়, তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও কিউবা তাদের হস্তক্ষেপের পেছনে যে যুক্তি প্রদর্শন করে, তা হলো-দক্ষিণ আফ্রিকা কর্তৃক এঙ্গোলার সরকার-বিরোধীদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা প্রদান। তবে এখানে উল্লেখ্য যে, প্রতিষ্ঠিত সরকারকে যদি সাহায্য প্রদান করা হয়ে থাকে, তা সামরিক বা অন্য যেকোনভাবেই হোক না কেন, তা কোন ভাবেই হস্তক্ষেপ বলে বিবেচনা করা হয় না। তবে আন্তর্জাতিক আইনে সমস্যা দেখা দেয় প্রতিষ্ঠিত সরকারের সংজ্ঞা নির্ধারণে। এখানে দু'টো ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে:

১. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক গ্রানাডা আগ্রাসন

১৯৮৪ সালে গ্রানাডায় বিশপ সরকার নির্বাচনে জয়ী হয়। বিশপ ছিলেন বামপন্থী এবং এ কারণেই মার্কিন মদদপুষ্ট হয়ে কিছু গ্রুপ দেশটিতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। এমনই এক অবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশপের বিপরীতে অবস্থানগ্রহণ করে এবং এরই এক পর্যায়ে মার্কিন বাহিনী গ্রানাডায় আগ্রাসন চালায় এই যুক্তিতে যে গ্রানাডার মেডিক্যাল কলেজে অধ্যয়নরত মার্কিন নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যুক্তরাষ্ট্রের দায়িত্ব। এভাবেই যুক্তরাষ্ট্র, গ্রানাডার নির্বাচিত বামপন্থী বিশপ সরকারকে প্রতিহত করার জন্য অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় তার আগ্রাসনকে বৈধতা প্রদানের চেষ্টা করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুক্তি প্রদান করে যে গ্রানাডার গভর্নর-জেনারেল যিনি বৃটেনের রানী কর্তৃক মনোনীত, হস্তক্ষেপ করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিল।

২. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক পানামা আগ্রাসন

পানামার স্বৈরশাসক জেনারেল নরিয়েগা ছিলেন মার্কিন মদদ পুষ্ট একজন শাসক। মার্কিন প্রভাবপুষ্ট হয়ে তিনি পানামার জনগণের উপর বিভিন্ন ধরনের নিপীড়ন চালান এবং মাদক ব্যবসার সাথে নিজেকে যুক্ত করেন। কিন্তু পানামা খাল নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তার বিরোধ সৃষ্টি হলে এবং এর পাশাপাশি নরিয়েগার বিরুদ্ধে ব্যাপক জন অসন্তোষের প্রেক্ষিতে তাদের মধ্যকার সম্পর্কের অবনতি ঘটে। ইত্যবসরে নরিয়েগা স্বৈরশাসকের ভাবমূর্তি দূরীকরণার্থে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আয়োজন করে তাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং রহস্যজনকভাবে পরাজিত হন। এরূপ পরাজয় মেনে নিতে নরিয়েগা অস্বীকার করেন এবং ক্ষমতা হস্তান্তরে অস্বীকার করেন। ১৯৮৯ সালের এই ধরনের পরিস্থিতিতে নির্বাচিত সরকারের অনুরোধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করে এবং এর ফলশ্রুতিতে আন্তর্জাতিক মাদক ব্যবসার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগ তুলে নরিয়েগাকে গ্রেফতারের চেষ্টা চালায়। নরিয়েগা গ্রেফতার এড়াতে পানামায় অবস্থিত ভ্যাটিকান দূতাবাসে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং পরবর্তীতে বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নরিয়েগা মার্কিন বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে।

এই দু'টি ঘটনা হতে এটা দৃশ্যমান যে, হস্তক্ষেপের যৌক্তিকতা তুলে ধরতে যুক্তরাষ্ট্র একদিকে গ্রানাডায় যেমন নির্বাচিত বৈধ সরকারকে বিবেচ্য বিষয় মনে করে নি, অন্য দিকে পানামায় নির্বাচিত সরকারের আবেদনকেই তার আগ্রাসনের পক্ষে জোড়ালো যুক্তি হিসেবে উপস্থাপন করেছে।

হস্তক্ষেপ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আইনের বিধান মতে যদি কোন পতনশীল সরকার সাহায্য চায় এবং যদি তাকে সাহায্য করা হয়, তবে অবশ্যই এটি হস্তক্ষেপ বলে বিবেচিত হয়। আর যদি বিদ্রোহীদের সাহায্য করা হয়, তবে এটি আন্তর্জাতিক আইনে হস্তক্ষেপ বলে বিবেচিত হবে কি-না, তা একটি প্রশ্নের উদ্রেক করে। এক্ষেত্রে সাধারণ নীতিটি হলো বিদ্রোহীদের সাহায্য করা আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন। *বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সংক্রান্ত ১৯৭০ সালের জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ঘোষণায়* এটি স্পষ্ট। তবে যদি কোনো তৃতীয় সরকারের পক্ষ থেকে অবৈধ হস্তক্ষেপের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে, তবে সেক্ষেত্রে বিদ্রোহীদের সাহায্য করাটা হস্তক্ষেপ বলে বিবেচিত হবে না। এক্ষেত্রে আফগানিস্তানের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন আফগান বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে, তখন তারা এই যুক্তি দেখিয়েছিল যে, সৌদি আরব এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই প্রথম আফগানিস্তানে হস্তক্ষেপ করেছিল, যার

পরিপ্রেক্ষিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন হস্তক্ষেপ করে এবং এরূপ পরবর্তী হস্তক্ষেপ অবৈধ নয়।

আবার কিছু কিছু হস্তক্ষেপ আছে, যেগুলোকে মানবিক হস্তক্ষেপ বলে বিবেচনা করা হয়। যদিও এটা আন্তর্জাতিক আইন স্বীকৃত বৈধ নীতি নয়, তথাপি কোন একটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে যদি মানবাধিকারের সীমাহীন লঙ্ঘন ঘটতে থাকে, তখন মানব জীবন রক্ষার খাতিরে হস্তক্ষেপ করা হলে তাকে সাধারণতঃ অবৈধ হস্তক্ষেপ বলে বিবেচনা করা হয় না। আন্তর্জাতিক আইন এই ধরনের হস্তক্ষেপকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ভারত কর্তৃক হস্তক্ষেপ ছিল এই ধরনেরই মানবিক হস্তক্ষেপ। তবে এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, খুব সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়ীত অবস্থাতেই কেবল আন্তর্জাতিক আইন এই ধরনের হস্তক্ষেপকে অনুমোদন করে থাকে।

তবে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের নামে কোন হস্তক্ষেপ আন্তর্জাতিক আইনে কোনভাবেই বৈধ হস্তক্ষেপ বলে বিবেচিত হতে পারে না। অতি সম্প্রতি (২০০৩ সালে) ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী কর্তৃক ইরাকে হামলা এই ধরনেরই অবৈধ হস্তক্ষেপের উদাহরণ।

কাজেই উপরোক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায় যে, একটি রাষ্ট্রকে কোন কিছু করতে বা করতে বিরত রাখতে চাপ প্রয়োগকে হস্তক্ষেপ ধরতে হবে। এই হস্তক্ষেপ সামরিক হতে পারে, অর্থনৈতিকও হতে পারে; হতে পারে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ। এই ধরনের হস্তক্ষেপ যদি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মতামতের প্রেক্ষিতে করা হয়, তবে সেটাকে অবৈধ বলা যাবে না। যেমন– ইরাকে অর্থনৈতিক অবরোধ।

আন্তর্জাতিক আইনে আরও এক ধরনের হস্তক্ষেপের কথা বলা যায়, তা হলো পৃষ্ঠপোষকতামূলক হস্তক্ষেপ। নব্য উপনিবেশবাদের ফলাফল হচ্ছে এই হস্তক্ষেপ। এর মাধ্যমে শক্তিধর রাষ্ট্রসমূহ কোন বিশেষ অঞ্চলে 'প্রভাব বলয় (Spheres of influence) সৃষ্টি করে থাকে। তবে এটি আন্তর্জাতিক আইনে স্বীকৃত কোন নীতি নয় এবং কোনভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়; যদিও বাস্তবে আমরা এরূপ হস্তক্ষেপ লক্ষ্য করে থাকি।

যুদ্ধ ও নিরপেক্ষতা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আইন

International Law on war and Neutrality

আন্তর্জাতিক আইনের ইতিহাস পর্যালোচনা পর্বে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, প্রাচীন যুগের আন্তর্জাতিক আইনের সময়কাল থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভিক পর্যায় পর্যন্ত আন্তর্জাতিক বিরোধ নিরসনে শক্তির ব্যবহার অবৈধ বলে বিবেচিত হতো না। আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনে মূলত: আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তির প্রয়োগের উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয় এবং আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন হিসেবে স্বীকৃত হয়। পূর্বে শক্তির প্রয়োগ যখন অবৈধ ছিল না, তখনও শক্তির প্রয়োগ কতোটা নিয়ন্ত্রিত ও সীমিত রাখা যায়, তা নিয়ে মানব সমাজ চিন্তা করেছে এবং নানা ধরনের পদক্ষেপওগ্রহণ করেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, সেই প্রাচীন কালে সুমেরীয়দের মধ্যে যুদ্ধের ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম-কানুন মেনে চলা হতো। সে সময়কার যুদ্ধে শত্রু পক্ষের সংবাদ বাহকরা বিশেষ সুবিধা ভোগ করতো এবং শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের একাধিক ঘটনার প্রমাণ পাওয়া যায়। একইভাবে ব্যাবিলনের সম্রাট হাম্বুরাবি প্রণয়ন করেন এক সংহিতি (code), যাতে মুক্তিপনের বিনিময়ে যুদ্ধবন্দিদের মুক্তি দেয়ার বিধান রাখা হয়। এই সংহিতি'র শুরুতেই উল্লেখ করা হয় যে-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে 'সবলের নির্যাতন হতে দুর্বলদের রক্ষা করা।' একই ধরনের প্রথা চালু ছিল মিশরীয়দের মধ্যেও। যে সাতটি কাজকে 'প্রকৃত দয়া' (True Mercy) বলে উল্লেখ করা হতো, সেগুলো হলো : ক্ষুধার্তকে অন্ন প্রদান, তৃষ্ণার্তের পিপাসা মেটানো, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র প্রদান, পরিব্রাজককে আশ্রয় প্রদান, বন্দিদের মুক্তি প্রদান, অসুস্থের চিকিৎসা করা এবং মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা। ইতিহাসে বিভিন্ন জাতির মধ্যে এরূপ বহু দৃষ্টান্ত আছে, যার মাধ্যমে যুদ্ধ সংক্রান্ত বিধানাবলী ধীরে ধীরে নিয়মের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে আন্তর্জাতিক মানবিক আইনে রূপান্তরিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের এই দিকটি সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয় উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে এবং যার নাম যুদ্ধ সংক্রান্ত আইনের মানবিকীকরণের সঙ্গে ওতোপ্রতোভাবে যুক্ত, তিনি হচ্ছেন হেনরী ড্যুনান্ট। মূলত তারই উদ্যোগে এবং পৃষ্ঠপোষকতায় ১৮৬৪ সালে **'যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈন্যদের কষ্ট দূরীকরণ সংক্রান্ত কনভেনশন'** (Geneva Convention on the Amelioration of the Condition of Wounded Armies in the Field)। পরবর্তীতে ১৮৯৯ ও ১৯০৭ সালের হেগ কনফারেন্সে যুদ্ধ সংক্রান্ত বিধানাবলীকে সংহিতিবদ্ধ করা হয়। মূলত এই হেগ কনফারেন্সেই স্থল ও নৌযুদ্ধ সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি কনভেনশন গৃহীত হয়, যা অদ্যবধি এই ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আইনের ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃত।

বর্তমানে আন্তর্জাতিক মানবিক আইন বলতে প্রধানত ১৯৪৯ সালে জেনেভাতে স্বাক্ষরিত 'রেডক্রস কনভেনশনগুলোকে বুঝানো হয়ে থাকে। এগুলো হলো–

১. যুদ্ধক্ষেত্রে আহত ও অসুস্থ সৈন্যদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত জেনেভা কনভেনশন

২. সমুদ্রে যুদ্ধরত জাহাজের আহত, অসুস্থ সৈন্য ও নিমজ্জিত জাহাজের সৈন্যদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত জেনেভা কনভেনশন

৩. যুদ্ধবন্দিদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত জেনেভা কনভেনশন

৪. যুদ্ধকালীন সময়ে বেসামরিক জনগণের নিরাপত্তা সংক্রান্ত জেনেভা কনভেনশন।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ১৯৪৯ সালেই প্রথমবারের মতো যুদ্ধকালীন সময়ে বেসামরিক জনগণের নিরাপত্তার বিষয়টি সংযোজিত হয় এবং আন্তর্জাতিক মানবিক আইনে এটি একটি নতুন মাত্রা যোগ করে। পরবর্তীতে ১৯৭৭ সালে, ১৯৪৯ সালের কনভেনশনসমূহের অতিরিক্ত আরও দু'টি প্রটোকল গৃহীত হয়। এই অতিরিক্ত প্রটোকলগুলো স্বাধীনতাযুদ্ধ, ভাড়াটে সৈন্য, বর্ণবাদ ইত্যাদি অবস্থায় মানবাধিকার রক্ষার জন্য বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে।

প্রথম অতিরিক্ত প্রটোকলটি আন্তর্জাতিক সশস্ত্র বিরোধে ক্ষতিগ্রস্তদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য প্রণীত এবং **দ্বিতীয় প্রটোকলটি** অ-আন্তর্জাতিক সশস্ত্র বিরোধে ক্ষতিগ্রস্তদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য প্রণীত। প্রথম প্রটোকলটি শুধু আন্তঃরাষ্ট্রীয় যুদ্ধের ক্ষেত্রেই নয় এটি সেই সকল সশস্ত্র বিরোধের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যেখানে জনগণ উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে বা বিদেশী দখল-দারিত্বের বিরুদ্ধে বা বর্ণবাদী শাসনের বিরুদ্ধে তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামরত। দ্বিতীয় প্রটোকলের নাম থেকেই বোঝা যায় যে, প্রথম প্রটোকলটি যেক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, দ্বিতীয়টি সেই ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তবে এটি অভ্যন্তরীণ গোলযোগ যেমন– দাঙ্গা বা বিচ্ছিন্ন বা বিক্ষিপ্ত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বা অনুরূপ ঘটনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়; কেননা সেগুলোকে সশস্ত্র বিরোধ হিসেবে গণ্য করা যায় না।

আন্তর্জাতিক মানবিক আইন প্রধানতঃ যুদ্ধাবস্থায় তার কার্যকারিতা প্রকাশ করে। আধুনিক আন্তর্জাতিক আইন সকল ধরনের আগ্রাসী যুদ্ধকে বেআইনী হিসেবে ঘোষণা করেছে। তথাপি আমরা জানি, বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধ একটি বাস্তবতা। দু'টো রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধাবস্থার সৃষ্টি হলে তা কিছু নির্দিষ্ট আইনগত ফলাফলের জন্ম দেয়, যেমন–

ক. কূটনৈতিক ও কনস্যুলার সম্পর্কের অবসান ঘটে

খ. যুদ্ধরত রাষ্ট্র ও তাদের নাগরিকদের স্বার্থ সংরক্ষণের দায়িত্ব কোন নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের উপর বর্তায়

গ. যুদ্ধরত রাষ্ট্রের ভূ-খণ্ডে অবস্থিত শত্রু রাষ্ট্রের নাগরিকদের ক্ষেত্রে নানা ধরনের বিধি নিষেধ আরোপিত হয়

ঘ. যুদ্ধের শুরু হওয়া মাত্রই যুদ্ধরত রাষ্ট্রসমূহ দ্বারা স্বাক্ষরিত আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহের উপর বিরূপ প্রতিঘাত পরিলক্ষিত হয়।

এছাড়াও যুদ্ধের কারণে যুদ্ধরত রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক রাজনৈতিক চুক্তিসমূহের কার্যকারিতা লোপ পায় বা সেগুলো রহিত হয় এবং যুদ্ধের সঙ্গে সম্পর্কিত স্বাক্ষরিত চুক্তিসমূহের কার্যকারিতা শুরু হয়।

যুদ্ধাবস্থার সঙ্গে যুদ্ধ ক্ষেত্র (**Theatre of war**) ধারণাটি নিবিড়ভাবে জড়িত। যুদ্ধক্ষেত্র বলতে যুদ্ধরত উভয় রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রসমূহের স্থল, নৌ ও আকাশ সীমানা এবং উন্মুক্ত সাগর ও তার উপরে অবস্থিত আকাশ সীমানাকে বোঝানো হয়, যেখানে যুদ্ধরত রাষ্ট্রসমূহ তাদের সামরিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারে। তবে স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে কোন নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের স্থল, নৌ বা আকাশ সীমানাকে যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করা একান্তভাবেই নিষিদ্ধ।

নিরপেক্ষতা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আইন

নিরপেক্ষতার মূল অর্থ হচ্ছে অন্য কোন রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে চলমান বিরোধে অংশগ্রহণ না করা। নিরপেক্ষতার আইনগত মর্যাদা এমনই যে যুদ্ধরত কোন রাষ্ট্রকে সহায়তা প্রদান করা যেমন নিষিদ্ধ, তেমনি যুদ্ধরত রাষ্ট্রসমূহ নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতাকে সম্মান করতে বাধ্য। যে কোন নিরপেক্ষ রাষ্ট্র কর্তৃক নিরপেক্ষতা সংক্রান্ত একটি ঘোষণা প্রদান করা বাঞ্ছনীয়। যদিও নিরপেক্ষ রাষ্ট্র যুদ্ধরত কোন রাষ্ট্রকে সহায়তা প্রদান থেকে বিরত থাকতে বাধ্য, এর অর্থ এই নয় যে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের কোন নাগরিক যুদ্ধরত কোন রাষ্ট্রকে সাহায্য করলে তা রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতাকে ক্ষুণ্ন করবে। এর কারণ বোধ করি এই যে, স্বেচ্ছাসেবী বা ভাড়াটে সৈন্যদের অংশগ্রহণ আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন হিসেবে বিবেচিত হয় না। যুদ্ধের সময় একটি রাষ্ট্র যেমন নিরপেক্ষ হিসেবে ঘোষণা দিতে পারে, ঠিক তেমনিভাবে কোন রাষ্ট্রকে স্থায়ীভাবে নিরপেক্ষ করার অবকাশও রয়েছে। অনেক সময় কোন আন্তর্জাতিক সংগঠনের সদস্যপদ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা কোন বাধা হিসেবে খাড়া হতে পারে কি-না, তা বিতর্কের সূত্রপাত ঘটাতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, জাতিসংঘ সনদের অনুচ্ছেদ ৪৮ অনুসারে –

১. আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা অক্ষুণ্ন রাখার উদ্দেশ্যে নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্তসমূহ পালন করার জন্য যে কর্মপন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন হবে, তা নিরাপত্তা পরিষদের নির্দেশানুযায়ী জাতিসংঘের সকল সদস্য বা কিছু সংখ্যক কর্তৃক কার্যকর করা হবে।

২. এই সিদ্ধান্ত জাতিসংঘের সদস্যগণ কর্তৃক সরাসরি অথবা তাদের সদস্যভুক্তি রয়েছে এরূপ উপযুক্ত আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের কাজের মধ্য দিয়ে পালিত হবে।

এক্ষেত্রে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের কি ভূমিকা হবে? এই অবস্থাটি আরও স্পষ্ট করে বোঝানো যেতে পারে। কুয়েত দখলের পর জাতিসংঘ ইরাকের বিরুদ্ধে সামরিক শক্তি প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়। কোন নিরপেক্ষ রাষ্ট্র এই সিদ্ধান্ত মেনে চলতে বাধ্য কি-না? অষ্ট্রিয়া নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও মনে করে যে, জাতিসংঘের সদস্যপদ এবং সনদের ৪৮ নং অনুচ্ছেদ তার নিরপেক্ষতাকে কোনভাবেই ক্ষুণ্ন করে না; তাই অষ্ট্রিয়া জাতিসংঘের সদস্যপদ গ্রহণ করেছে, তার নিরপেক্ষতাকে ক্ষুণ্ন না করেই। অন্যদিকে সুইজারল্যান্ড মনে করে যে অনুচ্ছেদ ৪৮ অনুসারে কোন সদস্য রাষ্ট্র যদি জাতিসংঘের সামরিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ না-ও করে, তথাপি সনদের ৪৯ অনুচ্ছেদ অনুসারে সদস্য রাষ্ট্রসমূহ এমন কিছু কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য, যা স্পষ্টতই তার নিরপেক্ষতাকে ক্ষুণ্ন করে এবং এই যুক্তিতেই সুইজারল্যান্ড

জাতিসংঘের সদস্যপদ প্রার্থীতা থেকে তাকে বিরত রেখেছিল। অবশ্য অধুনা সুইজারল্যান্ডের এই দৃষ্টি ভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছে এবং এটি জাতিসংঘের সদস্যপদ গ্রহণ করেছে।

রাষ্ট্রীয় আচরণ (State Practice) ব্যাখ্যা করলে কোন আন্তর্জাতিক সংগঠন কর্তৃক যুদ্ধরত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শান্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ সদস্য রাষ্ট্র যে ধরনের আচরণ করতে পারে, তা হলো–

১. বিরত থাকার দায়িত্ব

২. বিরোধ নিরসনের দায়িত্ব

৩. মৌন সম্মতির দায়িত্ব

সমকালীন আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে এর কোনটিই রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতাকে ক্ষুণ্ন করে বলে মনে করা হয় না। তবে এ কথাও বলা প্রয়োজন যে, নিরপেক্ষ রাষ্ট্র তার নিরপেক্ষতা রক্ষা করার উদ্দেশ্যে তার নিকট সম্ভব সকল পন্থা এমনকি সশস্ত্র বাহিনীকে ব্যবহার করতে পারে এবং তা কখনোই নিরপেক্ষতার লঙ্ঘন বলে মনে করা হয় না।

যুদ্ধ পরিচালনার আইন

আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে আন্তঃরাষ্ট্রীয় বিরোধ নিরসনের উপায় হিসেবে যুদ্ধকে যদি এড়ানো সম্ভব না-ই হয়, তাহলে যুদ্ধ এমনভাবে পরিচালনা করতে হবে, তা যেন শুধু সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং কোন ক্ষেত্রেই বেসামরিক জনগণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত না হয়। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আইন যোদ্ধা (Combatant) এবং অ-যোদ্ধা (Non-Combatant) এর মাঝখানে সুনির্দিষ্ট পার্থক্য নির্ণয় করেছে। ১৯৪৯ সালের কনভেনশন অনুসারে সকল যোদ্ধাই বৈধ, যদি –

ক. তারা এমন কোন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, যিনি তার অধীনস্থদের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত

খ. দূর থেকে সনাক্তযোগ্য কোন বিশেষ চিহ্ন ব্যবহার করে

গ. প্রকাশ্যে অস্ত্র বহন করে

ঘ. যুদ্ধের আইন ও প্রথা অনুসারে তাদের যুদ্ধ পরিচালনা করে

ভাড়াটে সৈন্যরা, এমনকি যদি তারা উপরোক্ত শর্তসমূহ পূরণ করে, বৈধ যোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃত নয়। ১৯৭৭ সালের অতিরিক্ত প্রটোকল এই দিকটি স্পষ্ট করেছে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ১৯৪৯ সালের কনভেনশনসমূহ যুদ্ধাহত, অসুস্থ ও বেসামরিক জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণে প্রণীত ও গৃহীত হয়েছে। উপরোক্ত কনভেনশনসমূহ বিশেষ করে যে ধরনের আচরণ স্পষ্টতঃই নিষিদ্ধ করেছে, তা হলো–

ক. জীবন ও ব্যক্তি সত্তার বিরুদ্ধে সন্ত্রাস, বিশেষ করে যে কোন ধরনের হত্যা, অঙ্গচ্ছেদ, নিষ্ঠুর আচরণ এবং নির্যাতন

খ. জিম্মি হিসেবে আটক করা

গ. ব্যক্তিগত মর্যাদা হানিকর আচরণ, বিশেষ করে অপমানজনক ও মর্যাদাহানীকর আচরণ; এবং

ঘ. নিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত আদালতের রায় ব্যতিরেকে দণ্ডপ্রদান ও তা কার্যকরকরণ

উপরের এই সব বিধি-নিষেধ যুদ্ধবন্দিদের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য।

যুদ্ধ ঘোষণার মাধ্যমে যেমন যুদ্ধাবস্থার সৃষ্টি হয়, তেমনিভাবে ঘোষণার মাধ্যমে যুদ্ধাবস্থার অবসান ঘটানো যেতে পারে। অন্য আরও যে পন্থায় যুদ্ধাবস্থার অবসান ঘটাতে পারে, তা হচ্ছে–

ক. শর্তহীন আত্মসমর্পণ

খ. সাময়িক যুদ্ধ বিরতি চুক্তি

গ. শান্তিচুক্তি সম্পাদন

অবরোধ : যুদ্ধকালীন সময়ে অবরোধ আরোপ একটি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। অবরোধ এমনকি শান্তিকালীন সময়েও আরোপিত হতে পারে। তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, অবরোধ শুধুমাত্র যুদ্ধরত শত্রুরাষ্ট্রের বিরুদ্ধেই আরোপিত হতে পারে এবং তৃতীয় রাষ্ট্রের বৈধ স্বার্থকে ক্ষুণ্ন করতে পারে না। এই নীতিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে **Oriental Navigation Co. Claims (1928)** মামলায়, যা পরবর্তীতে আরও স্পষ্টভাবে সুদৃঢ় হয়েছে ১৯৫৩ সালের **China Mutual Trading Co. Vs. American President Lines** মামলায়। শেষোক্ত এই মামলার সিদ্ধান্তে আদালত সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে, শান্তিপূর্ণ অবরোধ শুধুমাত্র অবরুদ্ধ জাহাজের বিরুদ্ধেই হতে পারে, তৃতীয় রাষ্ট্রের জাহাজের বিরুদ্ধে নয়। এমনকি এ ক্ষেত্রেও সব ধরনের জাহাজের ক্ষেত্রে অবরোধ বৈধ হবে বলে মনে করার কোন কারণ নেই। এখানে ১৯০০ সালের **Paquet Havana** মামলা স্মরণ করা যেতে পারে।

মামলা : The Paquete Habana Case; প্যাকেত হাবানা মামলা; (USSC, 1900)

ঘটনা : ১৮৯৮ সালে স্পেন-আমেরিকা যুদ্ধের সময় মার্কিন নৌ বাহিনী লোলা ও প্যাকেত হাবানা নামক দু'টো জাহাজ আটক করে। কিউবান বংশোদ্ভূত স্প্যানিশ নাগরিকের মালিকানাধীন ও স্প্যানিশ পতাকাবাহী এই জাহাজ দু'টো কিউবার উপকূলীয় জলভাগে মৎস শিকারে নিয়োজিত ছিল। এই জাহাজ দু'টোর নাবিকদ্বয়ের কোন ধারনাই ছিল না যে, স্পেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছে এবং যুক্তরাষ্ট্র স্প্যানিশ বন্দরগুলো অবরোধের ঘোষণা দিয়েছে। মার্কিন নৌ-বাহিনী জাহাজ দু'টো আটক করে ফ্লোরিডার জেলা আদালতের সরানাপন্ন হয় এবং জেলা আদালত জাহাজ দু'টো এবং মাছ ভর্তি কার্গো দু'টি বিক্রির ডিক্রি প্রদান করেন। এই ডিক্রির বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করা হয়।

বিচার্য বিষয়

১. শান্তিপূর্ণভাবে মাছ ধরায় নিয়োজিত জাহাজ prize of war হিসেবে আটক করা আন্তর্জাতিক আইনে বৈধ কি-না?

২. এরূপ আন্তর্জাতিক আইন দ্বারা মার্কিন আদালত বাধ্য কি-না?

রায় : এই মামলায় আদালত সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে, আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে শান্তিপূর্ণভাবে এবং নিরস্ত্র অবস্থায় মৎস শিকার কালে কোন জাহাজকে যুদ্ধকালীন অবরোধের আওতায় আনা যাবে না। কাজেই আদালত মার্কিন জেলা আদালতের রায় পাল্টে দেন এবং ক্ষতিগ্রস্থ জাহাজ মালিককে ক্ষতিপূরণ প্রদানের আদেশ প্রদান করেন। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, যদিও আন্তর্জাতিক আইনে এ বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট বিধিবিধান নেই তথাপি আদালত প্রথাগত আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে এই রায় প্রদান করেন। দীর্ঘদিনের চর্চায় এই প্রথা আইনের মর্যাদা লাভ করেছে। ১৪০৩ খ্রীষ্টাব্দেও ইংল্যান্ডে এরূপ চর্চা দেখা যায়। এমনকি ১৮৪৬ সালের ম্যাক্সিকান যুদ্ধের সময়ও যুক্তরাষ্ট্র উপকূলীয় মাছ ধরা জাহাজসমূহকে অবরোধের আওতামুক্ত রেখেছিল। কাজেই দেখা যাচ্ছে এই মামলায় একদিকে যেমন মৎস শিকারে নিয়োজিত জাহাজকে যুদ্ধকালীন অবরোধের আওতামুক্ত রাখার নীতি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, তেমনিভাবে অন্যদিকে প্রথাগত আন্তর্জাতিক আইনকে রাষ্ট্রীয় আদালত কর্তৃক বলবৎ করার দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়েছে।

এতদ্বসত্ত্বেও Bay of Pigs সংকট (Missile Crisis) কালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিউবার চারপাশে যে অবরোধ স্থাপন করেছিল, তাকে তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রপতি জন এফ কেনেডী আত্মরক্ষামূলক অবরোধ (Defensive Quarantine) হিসেবে অভিহিত করে একে বৈধতা দেয়ার চেষ্টা করেছিলেন। আন্তর্জাতিক আইনের চোখে এরূপ অবরোধ আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন হিসেবেই বিবেচিত হয়ে থাকে। তেমনিভাবে, যৌথ আত্মরক্ষার অজুহাতে আরোপিত অবরোধও আন্তর্জাতিক আইনের বিচারে বৈধ হিসেবে বিবেচিত হয় না; এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে **নিকারাগুয়া মামলা**, যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। এই মামলার obiter dicta তে আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারকগণ উল্লেখ করেন যে, যৌথ আত্মরক্ষার অধিকার কোন একক রাষ্ট্রের ব্যাখ্যা অনুসারে প্রযোজ্য হতে পারে না; এর কতক অনুসঙ্গ আছে–

ক. হুমকি হতে হবে প্রকৃত, অস্পষ্ট বা ধারণা প্রসূত নয়

খ. ক্ষতিগ্রস্ত রাষ্ট্রকর্তৃক আত্মরক্ষার জন্য স্পষ্ট অনুরোধ জ্ঞাপন

এই দুই শর্তের কোন একটির অবর্তমানে যৌথ আত্মরক্ষার অধিকার প্রযোজ্য নয়।

আন্তর্জাতিক পরিবেশ আইন
International Environmental Law

আন্তর্জাতিক আইনের তুলনামূলক একটি নতুন শাখা আন্তর্জাতিক পরিবেশ আইন। আন্তর্জাতিক পরিবেশ আইনের বিকাশ ঘটেছে আন্তর্জাতিক আইনের সু-প্রতিষ্ঠিত ভিত্তির উপর, তাই একাধারে আন্তর্জাতিক আইনের সাধারণ নীতিমালা যেমন আন্তর্জাতিক পরিবেশ আইনে সুস্পষ্টরূপে প্রতিফলিত হয়েছে, তেমনি আবার আন্তর্জাতিক পরিবেশ আইনের বিভিন্ন গতিধারা আন্তর্জাতিক আইনে ঘটিয়েছে নব সংযোজন। তাই পরিবেশ আইন হয়ে উঠেছে আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

পূর্বেই আলোচিত হয়েছে আন্তর্জাতিক আইনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সাবজেক্ট 'রাষ্ট্র'– এই রাষ্ট্র আবার সার্বভৌম। সুতরাং রাষ্ট্রের সম্মতি ব্যতিরেকে রাষ্ট্রের উপর বাধ্যবাধকতা অর্পণ আন্তর্জাতিক আইনের ক্ষমতা বহির্ভূত।

অন্যদিকে বিশ্ব পরিবেশ ও পরিবেশ এর উপযোগীতা সম্পর্কিত মানব জ্ঞান বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার সাথে সাথে পরিবর্তিত হচ্ছে।

তৃতীয়ত, পরিবেশ বিপর্যয় রোধে একক রাষ্ট্রের উদ্যোগ কার্যকরী নয়, বস্তুত পরিবেশ এর উপাদানগুলি অনন্য ও পরস্পর নির্ভরশীল।

তাই পরিবেশের অধিকার রক্ষায় আন্তর্জাতিক আইনের আশ্রয় গ্রহণ অনিবার্য; অন্যদিকে আন্তর্জাতিক আইনে পরিবেশের অধিকার আধুনিক কালে মানবাধিকার এর সাথে সংযুক্ত করে বিবেচনা করবার একটা অভিপ্রায় ও প্রচলন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। একই সাথে পরিবেশের অধিকার ও উন্নয়নের অধিকারের দ্বান্দ্বিক সম্পর্কও গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হচ্ছে।

এ সব বিষয়ই পরিবেশ আইনের গঠনরূপ দেয়ার পিছনে সক্রিয় অবদান রেখেছে। তাই পরিবেশ আইন বিকাশের ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে আন্তর্জাতিক আইন ও পরিবেশ আইনের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ও পরিবেশ আইনের বর্তমান অবস্থান ধারাবাহিক ব্যাখ্যার দাবি রাখে।

তবে আন্তর্জাতিক পরিবেশ আইন বিবেচনা করার জন্য এর বিকাশের দু'টো ধাপ অবশ্যই মনে রাখতে হবে :

প্রথমত: পরিবেশ ও রাষ্ট্রীয় দায় (State responsibility and the environment).

দ্বিতীয়ত: পরিবেশ ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা (International Co-operation & Environment).

এ দু'টো ধাপ হচ্ছে যে নীতি বা আদর্শ সামনে রেখে পরিবেশ আইন নির্দিষ্ট সময় কালের মধ্যে বিকাশ লাভ করেছে তা। আবার পরিবেশ সংক্রান্ত চুক্তি ও আইন নীতিমালাসমূহ

যেভাবে অগ্রগতি লাভ করেছে সেভাবে বিবেচনা করলে পরিবেশ আইনের বিবর্তনের পর্যায়কে চারটি পর্বকালে ভাগ করা যায়।

প্রথম পর্বকাল (১৯৪৫ ও তৎপূর্ব) : প্রাথমিক পর্যায়ের চুক্তিসমূহ

দ্বিতীয় পর্বকাল (১৯৪৫–১৯৭২ খ্রী.) : জাতিসংঘ ও পরিবেশ আইনের বিকাশ– স্টকহোম ঘোষণা

তৃতীয় পর্বকাল (১৯৭২-১৯৯২ খ্রী.) : স্টকহোম ঘোষণার পরবর্তীকাল ও

চতুর্থ পর্বকাল (১৯৯২-   ) : রিও ঘোষণা ১৯৯২, UNCED এবং পরবর্তী প্রবাহ

আন্তর্জাতিক পরিবেশ আইন বিকাশের এই চারটি পর্বকালের মধ্যে প্রথম পর্বকাল (–১৯৪৫) : প্রাথমিক পর্যায়ের চুক্তিসমূহকে পরিবেশ ও রাষ্ট্রীয় দায় নীতির অনুসারী সময় কালের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। অপর তিনটি পর্বকালে পরিবেশ আইন সংক্রান্ত ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা নীতির সূচনা ও সম্প্রসারণ ঘটে।

রাষ্ট্রীয় দায় ও পরিবেশ {প্রথম পর্ব : প্রাথমিক পর্যায়ের চুক্তিসমূহ (–১৯৪৫)}

পরিবেশ আইনের প্রথম পর্যায় শুরু হয় মূলত উনিশ শতকে সম্পাদিত কিছু দ্বি-প্যাক্ষিক মৎস্য চুক্তির মধ্য দিয়ে। এ পর্যায় মোটামুটিভাবে জাতিসংঘের গঠন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। এ সময় জনগণ ও জাতি গোষ্ঠী উপলব্ধি করতে শুরু করে যে, শিল্পায়ন ও উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে হলে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার এর উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ ও এ সম্পর্কিত আইনি নীতিমালা প্রণয়ন জরুরি। এ সময় মানুষ আরো উপলব্ধি করতে শেখে যে, প্রাকৃতিক সম্পদ অফুরন্ত নয় তাই এর নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার প্রয়োজন।

প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায় এ সময়ের আইনি নীতিমালার অন্যতম মূলনীতি ছিল রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও রাষ্ট্রীয় দায়। তবে চূড়ান্ত সার্বভৌমত্বের নীতি ততদিনে ম্রিয়মান হয়ে এসেছিল বরং প্রথাগত আন্তর্জাতিক নীতি / আইন, 'রাষ্ট্রীয় দায়' প্রচলিত ছিল।

তখন আন্তর্জাতিক প্রথাআইনের বলে পরিবেশ রক্ষায় রাষ্ট্রের উপর কিছু গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক দায়দায়িত্ব অর্পিত ছিল। রাষ্ট্রের একটি মৌলিক দায়িত্ব ছিল এমন কিছু না করা যাতে করে অন্য রাষ্ট্রের কোন ক্ষতি হয়।

পরিবেশগতভাবে বিশ্লেষণ করলে এ নীতিটির প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বহিঃপ্রকাশ ঘটে **Trail Smelter Arbitration (1938).**

মামলা : Trail Smelter Arbitration; ট্রেইল স্মেলটার সালিশ; (1938)

আরবিট্রেশনটিতে কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি বিরোধ বিবেচিত হয়।

ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার ট্রেইয়ালে অবস্থিত কানাডার কোম্পানির খনিজ আকরিক উত্তোলন ও গলানোর প্লান্ট থেকে নিগর্ত সালফার ডাই-অক্সাইড বহুদিন যাবত যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্তবর্তী

এলাকার শস্য, চারণভূমি, গাছপালা ও চাষবাসের ক্ষতি করে চলছিল। ১৯০৬ সালের পর ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা যথেষ্ট বেড়ে গেল এবং ১৯২৫ এবং ১৯২৭ এ দেখা গেল পর্যায়ক্রমে বিষাক্ত গ্যাসের কারণে ক্ষতির মাত্রা বেড়েই চলেছে। অতপর ১৯০৯ সালে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মধ্যে সম্পাদিত সীমান্ত পানিচুক্তির মাধ্যমে গঠিত যৌথ কমিশন এর কাছে বিষয়টি বিবেচনার্থে প্রেরণ করা হল।

১৯৩১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যৌথ কমিশন যুক্তরাষ্ট্রকে ১৯৩২ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত যতটা ক্ষতি হবে তার জন্য $ ৩৫০,০০০ ক্ষতিপূরণ প্রদান করে এবং কমিশন আরো সুপারিশ করে যে, ১৯৩২ সালের পর থেকে যেন এমন ধরনের যান্ত্রিক ব্যবস্থা নেয়া হয় যাতে সালফার নির্গমন কমে আসে।

কিন্তু ১৯৩৫ সালে যুক্তরাষ্ট্র আবার ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে বলে পুনরায় ক্ষতিপূরণ দাবি করে। অতঃপর দুই দেশের সম্মতিক্রমে বিষয়টিকে তিনজন আরবিট্রেটর ও দুই দেশের প্রতিনিধিত্বকারী দু'জন বিজ্ঞানীর সমন্বয়ে গঠিত পাঁচ সদস্যের আরবিট্রেশন কমিটিতে পাঠানো হয়। বিষয়টি বিবেচনা করে ট্রাইবুনাল রায় দেয় যে–

"আন্তর্জাতিক আইনের নীতি অনুসারে... কোন দেশ নিজের ভূ-খণ্ড এমনভাবে ব্যবহার করতে পারে না যাতে করে নিজ ভূ-খণ্ড হতে নির্গত ধোঁয়া বা অন্য কোন কারণে অন্য ভূ-খণ্ডের, অন্য ভূ-খণ্ডের অধিবাসী কিংবা অবস্থিত সম্পত্তির কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়।

উপরোক্ত আরবিট্রেশনটি আন্তর্জাতিক আইনের সাধারণ নীতিমালা ব্যবহার করে Transboundary air pollution কিংবা পরিবেশ দূষণ এর উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ এবং অন্য দেশের পরিবেশে ক্ষতির কারণে রাষ্ট্রীয় দায় প্রতিষ্ঠার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

পরবর্তী পর্যায়ে আরোও কিছু গুরুত্বপূর্ণ মামলায় আন্তর্জাতিক আদালত এ নীতিটি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে, এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য **Corfu Channel Case (1949).** এ মামলায় আদালত ধার্য করে যে প্রত্যেক রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে জ্ঞানত নিজের ভূ-খণ্ড এমনভাবে ব্যবহার করতে না দেয়া যাতে অন্য রাষ্ট্রের অধিকার লঙ্ঘিত হয়। **Nuclear Tests Case (1974)** এও একই নীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রথম পর্যায়ে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আরবিট্রেশন **Pacific Fur Seal Arbitration (USA Vs. UK (1893).**

মামলা : Pacific Fur Seal Arbitration; প্রশান্ত মহাসাগরীয় ফার সীল সালিশ; (U.S.A & U.K,1893)

উক্ত বিরোধে গ্রেট ব্রিটেন রাষ্ট্রের সীমানার বাইরের ফার সীল ধরার অধিকার দাবি করে। তাদের যুক্তি ছিল এগুলো প্রাকৃতিক সম্পদ এবং এগুলোর উপর অধিকার চর্চা করা সঙ্গত। কিন্তু আদালত প্রাকৃতিক সম্পদের রক্ষা ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তাদের এ যুক্তিকে নাকচ করে দেয়।

এ পর্যায়ে সম্পাদিত চুক্তিসমূহ সাধারণত অর্থনৈতিক স্বার্থে সম্পাদিত হয়েছে। এ

চুক্তিসমূহের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল অর্থনৈতিক কারণে প্রাকৃতিক সম্পদের রক্ষণ। এ চুক্তিসমূহের মধ্যে Convention to Protect Birds Useful to Agriculture (1902). উল্লেখ্য চুক্তিটি যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের মধ্যে সম্পাদিত প্রথম পরিবেশ সংক্রান্ত দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি।

নির্দিষ্ট এলাকার বন্যসম্পদের রক্ষণ এর জন্য প্রথম চুক্তি Convention Destinee a Assurer la Conservation des Diverses Especes Animales Vivant a l'Erat Sauvage en Aprique qui Sont Utiles a l' Honme ou Inoffensive, 1900 এটি লন্ডন কনভেনশন নামেও পরিচিত। এটি আফ্রিকার ইউরোপিয়ান উপনিবেশভুক্ত দেশসমূহের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সংক্রান্ত উপনিবেশিক রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সম্পাদিত একটি চুক্তি।

রাষ্ট্রীয় দায়নীতির সমস্যা ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা নীতির উদ্ভব

কিছু দিনের মধ্যেই দেখা গেল যে, তথাগতভাবে রাষ্ট্রের দায়িত্ব ভঙ্গ হলে দায় উদ্ভূত হওয়া এবং ক্ষতিগ্রস্ত রাষ্ট্রের ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে দায় উত্তরণের নীতি পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে তেমন ফলপ্রসূ হচ্ছে না। কেননা এ নীতি প্রয়োগ করতে গেলে প্রমাণ করতে হবে যে, কোন একটি রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট কোন কার্যক্রমের ফলে অন্য আরেকটি রাষ্ট্রের ক্ষতি সাধিত হয়েছে। কিন্তু পরিবেশগত ক্ষতির ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রমাণনির্ভর ক্ষতিপূরণ কেবল অল্প কিছু ঘটনার এই সমাধান দিতে সক্ষম হল। কেননা পরিবেশের উপাদানগুলো এতটাই আন্তনির্ভরশীল ও জটিল অবস্থায় বিরাজ করে যে, কোন একটা দেশের কার্যক্রম যে কেবল পাশের দেশেই প্রভাব ফেলতে পারে তাই কেবল নয় বরং বহু দূরবর্তী অন্য দেশগুলোতে প্রভাব ফেলতে পারে। অর্থাৎ একটি রাষ্ট্রের কৃতকার্যের জন্য পরিবেশের উপর যে ক্ষতিকর প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা থাকে তা কেবল একটা রাষ্ট্রের ভূ-খণ্ডেই সীমাবদ্ধ থাকবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই এবং প্রায়শই তা থাকে না। এমনকি এ ক্ষতির মাত্রা সকল সময় নিশ্চিতভাবে নিরূপণও সম্ভব নয়। সুতরাং আলোচনা হতে বোঝা যাচ্ছে পরিবেশের ক্ষতি মূলতঃ একটি গ্লোবাল সমস্যা, সুতরাং দ্বি-পাক্ষিক বা আঞ্চলিক পর্যায়ে এর মীমাংসা সকল ক্ষেত্রে সমাধান আনতে পারবে না, বরং এর সমাধান করবার জন্যও প্রয়োজন Global or pan-state response. এ উপলব্ধিই আন্তর্জাতিক পরিবেশ আইন বিকাশের ক্ষেত্রে 'সহযোগিতার নীতির' উন্মেষ ঘটায়।

আন্তর্জাতিক সহযোগিতা

(দ্বিতীয় পর্বের সূচনা) জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠাকাল হতে স্টকহোম ঘোষণা (১৯৪৫-৭২)।

জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই মূলত আন্তর্জাতিক পরিবেশ আইনের দ্বিতীয় পর্ব কালের সূচনা ঘটে। এ পর্বের উল্লেখযোগ্য তিনটি বৈশিষ্ট্য হল;

প্রথমত : জাতিসংঘ ও বিশেষায়িত সংস্থাসমূহের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পরিবেশ আইন রূপ লাভ করতে থাকে এবং আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংগঠনগুলো পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে কার্যক্রম শুরু করে;

দ্বিতীয়ত : নির্দিষ্ট Ultra hazardous কার্যক্রমের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষিত হয় এবং

তৃতীয়ত : অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সাথে পরিবেশ সংরক্ষণের সম্পর্ক সামান্য মাত্রায় হলেও স্বীকৃতি লাভ করে।

এ পর্যায়ে পরিবেশ আইনের অগ্রযাত্রায় যেসব কনভেনশন অবদান রেখেছে সেগুলো হচ্ছে- **The 1959 Antarctic Treaty; The United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) এর যানবাহন হতে নির্গত ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রমালগেশন; কাউন্সিল অব ইউরোপ এর মন্ত্রী কমিটির বায়ু দূষণ এর ফলাফল সংক্রান্ত প্রথম আন্তর্জাতিক এ্যাক্ট-১৯৬৬ ও ১৯৬৮ সালের আফ্রিকান নেচার কনভেনশন।**

জাতিসংঘের সনদে যদিও পরিবেশ রক্ষা ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত কোন বিধান উল্লেখিত নেই, কিন্তু অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কিংবা মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবেশ সমস্যাকে বিবেচনা করে জাতিসংঘ এ সকল সমস্যা সমাধানে অগ্রবর্তী হয়।

এ সময়ই আন্তর্জাতিক আদালত ১৯৪৯ সালে **Corfu Channel Case** এর রায় দেন।

১৯৬২ সালে সাধারণ পরিষদ রেজ্যুলেশন ১৮৩১ (XVII) (১৯৬২) এর মাধ্যমে জাতিসংঘ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিবেশ রক্ষণ-এর সম্পর্ক মূল্যায়ন করে।

১৯৭১ সালে Ramsar Convention-এর মাধ্যমে প্রথমবারের মত বাস্তুসংস্থান সংরক্ষণের নীতি গৃহীত হয়।

যদিও এ সময় আন্তর্জাতিক পরিবেশ আইনের যথেষ্ট নীতি ও নিয়মের উদ্ভব ঘটে কিন্তু প্রত্যেকটি ছিল বিচ্ছিন্ন এবং সমন্বয়হীন। সকল আইনের সমন্বয় করবার জন্য কোন সংগঠন ছিল না এবং আন্তর্জাতিক পরিবেশ আইনে এ সময় পর্যন্ত Procedural obligation-এর ধারণা ছিল সম্পূর্ণ অপরিচিত। এ সব দিক থেকে বলা চলে স্টকহোম ডিকলারেশন আন্তর্জাতিক পরিবেশ আইনে এক নব দিগন্তের সূচনা ঘটিয়েছে।

স্টকহোম মানব পরিবেশ সম্মেলন

বস্তুত ষাটের দশকের শেষে জাতিসংঘ পৃথিবীর পরিবেশ সমস্যার প্রতি রাষ্ট্রসমূহের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং ক্রমবর্ধমান এই সমস্যা সমাধানের জন্য সকল রাষ্ট্রের সহযোগিতা ও সম্মিলিত প্রয়াস ত্বরান্বিত করতে সচেষ্ট হয়। এরই ফল হচ্ছে ১৯৬৮ সালের জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের প্রস্তাবের ভিত্তিতে ১৯৭২ সালের ৫-১৫ জুন স্টকহোমে প্রথম মানব পরিবেশ সম্মেলন অনুষ্ঠান। আন্তর্জাতিক সমঝোতার মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষা ও উন্নতকরণের সার্বজনীন সমস্যা সমাধানের এটাই বড় ধরনের উদ্যোগ। বলা যায়, এই সম্মেলনের ফলাফলই আন্তর্জাতিক পরিবেশ আইনের গোড়াপত্তন করে।

স্টকহোম সম্মেলনে পরিবেশ সংরক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং এ ব্যাপারে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করা হয়। সম্মেলনে একটি 'কার্য পরিকল্পনা' গ্রহণ করা হয়। এই পরিকল্পনা হচ্ছে বস্তুত রাষ্ট্র ও সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংগঠনসমূহ কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য কিছু সুপারিশমালা। পরিকল্পনায় বিশ্বব্যাপী পরিবেশ মনিটরিং অবকাঠামো গড়ে তুলে এ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের উপর জোর দেয়া হয়। কার্য পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্যই ছিল বিশ্বব্যাপী পরিবেশ সংকট ও সমস্যাবলি চিহ্নিতকরণ ও অবহিতকরণের জন্য জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক কার্যক্রম ও সহযোগিতা ত্বরান্বিত করা।

সম্মেলনে মানব পরিবেশের উপর একটি ঘোষণা গৃহীত হয়। ঘোষণায় প্রত্যেকটি মানুষের বিশুদ্ধ পরিবেশে বাস করার অধিকার এবং সে পরিবেশ সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে তার দায়িত্বের কথা উল্লেখ করা হয়। মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে ১৯৪৮ সালের সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা যেমন তাৎপর্যপূর্ণ, ১৯৭২ সালের এই ঘোষণাটিকে পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে অনুরূপ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হয়।

মানব পরিবেশের ঘোষণায় মূলত পরিবেশ রক্ষার অঙ্গীকার ব্যক্ত এবং এ সংক্রান্ত কিছু নীতিমালা (২৬টি) উল্লেখ করা হয়েছে যার দ্বারা পরিবেশ রক্ষায় ভবিষ্যত কার্যক্রম ও কর্মসূচী পরিচালিত হবে। এই ঘোষণা কোন অবশ্যপালনীয় বিধান সৃষ্টি না করলেও এটি পরিবেশ রক্ষায় মানুষের সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গি গঠন এবং উপযুক্ত পরিবেশ নৈতিকতা ও সংস্কৃতি সৃষ্টির একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল বলে বিবেচিত, এটি আন্তর্জাতিক পরিবেশ আইন সৃষ্টির একটি বলিষ্ঠ প্রথম পদক্ষেপ। উন্নয়নের সঙ্গে পরিবেশ রক্ষার সম্পর্কের বিষয়টি এ সম্মেলনে যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়। উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটিয়ে স্টকহোম ঘোষণায় উল্লেখ করা হয় যে, অনুন্নয়নও (Under development) পরিবেশগত সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।

বিশ্বব্যাপী এমন পরিবেশ নীতিগ্রহণ করতে হবে যেন তা উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত না করে বরং ত্বরান্বিত করে। মনে রাখতে হবে, উৎকৃষ্টতম পরিবেশ মান সব সময় উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে। তবে উন্নয়নের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়েই তাদের জন্য সে মান নির্ধারণ করতে হবে বা পরিবেশ পরিণতি মোকাবেলায় তাদেরকে সাহায্য করতে হবে।

স্টকহোম সম্মেলন পরিবেশ সংক্রান্ত সম্ভাব্য সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে তা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় বিধান তৈরির উপর গুরুত্ব আরোপ করে আন্তর্জাতিক পরিবেশ আইনের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে।

তবে পরিবেশ আইন বিকাশের তৃতীয় পর্বকালে মানব সমাজের উল্লেখযোগ্য যে উপলব্ধি ঘটে তা হচ্ছে কেবল অর্থনৈতিক কারণে পরিবেশ রক্ষা নয় বরং পরিবেশের কারণে পরিবেশ রক্ষার মানবের জন্য পরিবেশ রক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। এ উপলব্ধির আরো বিকাশ ঘটে তৃতীয় পর্বে।

তৃতীয় পর্বকাল (১৯৭২-৯২) : স্টকহোম থেকে রিও

স্টকহোম ঘোষণার ফলে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক পর্যায়ে পরিবেশ আইনের ক্ষেত্রে এক ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটে। এই পর্যায়কে UNCED গঠনকাল পর্যন্ত চিহ্নিত করা হয়। এই পর্বের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, এ সময় ব্যাপক হারে আন্তর্জাতিক পরিবেশ সংগঠনসমূহ গড়ে ওঠে এবং এরা বিস্তৃত পর্যায়ে পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যাবলী বিবেচনায় আনতে থাকে এবং এদের কার্যক্রম আন্তর্জাতিক পরিবেশ আইনের নতুন উৎস হিসেবে বিবেচিত হতে থাকে। চুক্তির ভিত্তিতেও এ পর্যায়ে নতুন নতুন পরিবেশবাদী নীতি প্রয়োগ করা হয়। এ পর্যায়ে আরও উল্লেখযোগ্য যা ঘটে তা হচ্ছে পরিবেশ রক্ষার মানদণ্ড ও পরিবেশের উপর বিভিন্ন পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের প্রভাব নিরূপণের (EIA) কৌশল উদ্ভাবন হতে থাকে এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পরিবেশ ও উন্নয়ন উভয় চিন্তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে একাত্ম করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

স্টকহোম ঘোষণার পরপরই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য যেসব চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য –

- বর্জ্য দ্রব্য ও অন্যান্য পদার্থ ফেলে (dumping) সামুদ্রিক দূষণ নিরোধ সংক্রান্ত কনভেনশন (১৯৭২);
- বিশ্ব সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্য (heritage) সংরক্ষণ কনভেনশন (১৯৭২);
- বিলুপ্ত প্রায় বন্য প্রাণী ও বৃক্ষরাজির আন্তর্জাতিক ব্যবসায় সংক্রান্ত কনভেনশন (১৯৭৩);
- জাহাজ থেকে দূষণ নিরোধ সংক্রান্ত কনভেনশন (১৯৭৩); এবং
- স্থলভিত্তিক উৎস হতে সমুদ্র দূষণ নিরোধ কনভেনশন (১৯৭৪)।

এ পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য আঞ্চলিক অগ্রগতির মধ্যে অন্যতম;

ইউরোপিয়ান কমিশনের পরিবেশ রক্ষা সংক্রান্ত বিধিমালা তৈরি;

OECD-তে পরিবেশ কমিটি গঠন;

বন কনভেনশন বা স্থান পরিবর্তনকারী প্রজাতি রক্ষা বিষয়ক বহুপাক্ষিক চুক্তি;

দূরপাল্লার আন্তঃসীমানা বায়ু দূষণ কনেভনশন (১৯৭৯);

উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে পরিবেশ সংক্রান্ত সহযোগিতা চুক্তি বা Lome convention (1989).

ক্রমবর্ধমান জনমত ও সরকারি চাপে এ সময় বিশ্ব ব্যাংকও প্রথমবারের মত তাদের ঋণদান প্রক্রিয়াতে পরিবেশ রক্ষামূলক শর্তারোপে বাধ্য হল এবং পরিবেশ বিভাগ অন্তর্ভুক্ত করলো। এ নীতি অন্যান্য আঞ্চলিক ব্যাংক-এর কার্য নীতিতেও প্রতিফলিত হল।

তবে স্টকহোম কনফারেন্স এর সবচাইতে বড় অর্জন ইউনেপ এর গঠন।

ইউনেপ (United Nations Environmental Programme)

স্টকহোম পরিবেশ সম্মেলনের সুপারিশের ভিত্তিতে সাধারণ পরিষদ জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি 'ইউনেপ' (UNEP) প্রতিষ্ঠা করে। সত্তর দশকের প্রথম থেকে ইউনেপ সারা বিশ্বে পরিবেশ সংরক্ষণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে আসছে। বিশ্বব্যাপী পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি, রাষ্ট্রসমূহকে পরিবেশ রক্ষায় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ, পরিবেশ রক্ষায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি, পরিবেশের নিয়মিত ও অব্যাহত পরিবর্তন সম্পর্কে সদা সতর্কবাণী উচ্চারণ, পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন সমীক্ষা পরিচালনা ও বাস্তব কর্মসূচি গ্রহণ এবং জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা যেমন – UNDP, FAO, WHO, IAEA, WMO অনেক আন্তর্জাতিক, জাতীয়, সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনায় ইউনেপ প্রশংসনীয় সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছে।

জাতিসংঘ কর্তৃক সৃষ্ট পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক বিশ্ব কমিশন– United Nations World Commission on Environment and Development

যা Brundtland Commission নামেও পরিচিত। ১৯৮৭ সালে 'আমাদের অভিন্ন ভবিষ্যৎ' (Our Common Future) শিরোনামে একটি প্রতিবেদন সাধারণ পরিষদে পেশ করে। এই প্রতিবেদনের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল পরিবেশ ও উন্নয়ন। এই প্রতিবেদনেই পরিবেশ উপযোগী বা টেকসই উন্নয়ন sustainable development এর ধারণা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়। দারিদ্র্য বিমোচন ও সভ্যতার বিকাশের জন্য উন্নয়ন অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু তা পরিবেশকে বিনষ্ট করে নয়, পরিবেশ রক্ষা করেই উন্নয়ন সম্ভব। তার জন্য চাই উপযুক্ত পরিকল্পনা ও প্রযুক্তি। পরিকল্পনাহীন উন্নয়নে পরিবেশ নষ্ট হলে দীর্ঘ মেয়াদে উন্নয়নই ব্যাহত হবে। পৃথিবীও বাসোপযোগী রাখা কঠিন হয়ে পড়বে। তাই বর্তমানে বিশ্বব্যাপী উন্নয়নের ধারাকে পরিবেশ আশ্রয় করা, অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত দিকসমূহ সমন্বিত করার সুপারিশ করা হয়েছে এই প্রতিবেদনে। এছাড়া যে বিষয়টির উপর বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে পরিবেশ রক্ষায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের যৌথপ্রয়াস। পরিবেশের কোন রাষ্ট্রীয় সীমানা নেই। 'আমাদের অভিন্ন ভবিষ্যত' শীর্ষক প্রতিবেদনের বক্তব্য ও সুপারিশসমূহ ১৯৮৭ সালে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক প্রণীত ২০০০ সাল এবং তার পরের পরিবেশ রূপরেখায় Environmental Perspective to the Year 2000 and Beyond- এ স্থান দেয়া হয়েছে। এটি পরিবেশ সহায়ক উন্নয়ন অর্জনের জন্য সমস্ত স্তরে প্রচেষ্টা গ্রহণের একটি কাঠামো বিশেষ। বিগত বছরসমূহে পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যসমূহ সন্তোষজনকভাবে অর্জিত হয় নি। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা এবং নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে উন্নয়ন ও পরিবেশের ভাবনাগুলো একীভূত করার তেমন প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয় নি। তাই পরিবেশ সংরক্ষণ প্রচেষ্টা আরো জোরদার করার উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজন দেখা দেয়। এরকম প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতেই ১৯৮৯ সালের ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ পরিবেশের উপর এক মহাসম্মেলন ডাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সম্মেলনের লক্ষ্য স্থির করা হয়, একবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশের আগেই পরিবেশের অবনতির ধারা রোধ করে নতুন আঙ্গিক সৃষ্টি এবং টেকসই জীবন ও উন্নয়ন পদ্ধতি উদ্ভাবন করা।

এ পর্যায়ে এসে যদি আন্তর্জাতিক পরিবেশ আইনের অবস্থান বিবেচনা করি তবে দেখবো এতদিনে আন্তর্জাতিক আইন এক সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। আন্তর্জাতিক পরিবেশ নামে একটি ভিন্ন শাখারই প্রচলন ঘটে গেছে। বহু মৌলিক পরিবেশ সংক্রান্ত আইন ও নীতিমালা এ শাখাকে সমৃদ্ধ করে তুলছে। আন্তর্জাতিক আইনের এ শাখাটি এখন আর কেবল রাষ্ট্রীয় দায়নীতির উপরই সবর্ব নির্ভর করে নেই, বরং Polluter-pays, precautionary principle-এর মত আরো নতুন নতুন নীতি এ আইনে সংযুক্ত হয়েছে। যে নীতির সূচনা এ পর্যায়ে সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় তা হচ্ছে 'ধারণযোগ্য উন্নয়ন'– এ নীতিটি যদিও এখনো পুরোপুরি Principle হিসেবে গণ্য হয় না, তবুও এ ধারণাটি এতই সম্ভাবনাময় যে ভবিষ্যতে যদি সম্পূর্ণ আন্তর্জাতিক পরিবেশ আইন এ নীতিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে তবে তা খুব একটা বিচিত্র হবে না।

চতুর্থ পর্ব (১৯৯২-এ পর্যন্ত)

এ পর্বের সূচনা ঘটে UNCED থেকে, এ পর্বের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে 'সমন্বয়'। পরিবেশ সংক্রান্ত সকল আইন-কানুন ও নীতিমালাকে পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কর্মে সমন্বয়ের এক প্রক্রিয়া এ পর্যায় হতে শুরু হয়। এ পর্বের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা রিও ঘোষণা, এটি ১৯৯২ এর জাতিসংঘ সম্মেলনে গৃহীত হয়।

পরিবেশ ও উন্নয়নের উপর জাতিসংঘ সম্মেলন, ১৯৯২

জাতিসংঘ আহূত উল্লিখিত সম্মেলন পরিবেশ ও উন্নয়নের উপর জাতিসংঘ সম্মেলন–United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) নামে ৩–১৪ জুন ব্রাজিলের রাজধানী রিও দ্য জেনেইরোতে অনুষ্ঠিত হয়। বহুল আলোচিত এই সম্মেলনে, যা ধরিত্রী শীর্ষ সম্মেলন বা Earth Summit নামে পরিচিতি লাভ করেছে, ১৭৮ টি রাষ্ট্র এবং অসংখ্য NGO ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল পরিবেশ সমস্যার প্রধান ইস্যুগুলোর উপর আন্তর্জাতিক ঐকমত্য সৃষ্টি এবং সে অনুযায়ী কর্মসূচী প্রণয়ন করা। সম্মেলনে যে সমস্ত বিষয়ের উপর আলোচনা প্রাধান্য পায় সেগুলো হচ্ছে :

ক. বায়ুমণ্ডল রক্ষা (আবহাওয়া পরিবর্তন, ওজোন স্তরের ক্ষয়, বায়ু দূষণ);

খ. ভূ-সম্পদ রক্ষা (বন ধ্বংস, ভূমিক্ষয়, মরুকরণ ও অনাবৃষ্টি);

গ. বিশুদ্ধ পানি রক্ষা;

ঘ. সমুদ্র ও উপকূলীয় এলাকা রক্ষা এবং সমুদ্রের প্রাণিজ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও উন্নয়ন;

ঙ. ক্ষতিকারক দ্রব্য ও বর্জ্যের অবৈধ বাণিজ্য নিরোধ;

চ. বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণিজ ও বনজ সম্পদ রক্ষা;

ইউনেপের কার্যক্রম, সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রস্তুতিপর্বে সম্মেলনের প্রস্তাবিত আলোচ্যসূচী ও আলোচ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তুর উপর ঐকমত্য সৃষ্টির লক্ষ্যে পরিচালিত দীর্ঘ কূটনৈতিক আলাপ-আলোচনা এবং উল্লিখিত ব্রাণ্ডটল্যান্ড কমিশনের প্রতিবেদন সম্মেলনের কাজের

উপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। সম্মেলনে এজেন্ডা-২১ এর আওতায় একবিংশ শতাব্দীর জন্য পরিবেশ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণের রূপরেখা তৈরি করা হয়।

সম্মেলনে দুইটি আন্তর্জাতিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। একটি হচ্ছে পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি নিরোধ কল্পে আবহাওয়া পরিবর্তন বিষয়ক রূপ রেখা চুক্তি এবং অপরটি হচ্ছে প্রাণিজ ও বনজ সম্পদ রক্ষার জন্য জীব-বৈচিত্র্য চিত্র। প্রথমোক্ত চুক্তির ভিত্তিতেই পরবর্তীতে ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর জাপানের কিয়োতোতে গ্রীন হাউস গ্যাস উদগীরণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত প্রোটকল স্বাক্ষরিত হয়।

রিও ঘোষণা

স্টকহোম ঘোষণার ন্যায় রিও দ্য জেনেইরোতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনেও একটি ঘোষণা গ্রহণ করা হয়। 'পরিবেশ ও উন্নয়নের উপর ঘোষণা' শিরোনামে এই দলিলে উন্নয়নের সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্কের উপর অধিকতর জোর দেয়া হয়। পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে মূল লক্ষ্য ও নীতিসমূহ ১৯৭২ সালের ঘোষণার অনুরূপ হলেও সমস্যার গভীরতর ও অধিকতর বিস্তৃতি উপলব্ধির আলোকে ৯২-এর ঘোষণার লক্ষ্য ও নীতিসমূহ পুনঃনির্ধারণ করা হয় এবং তারই আলোকে ভবিষ্যতের কর্মসূচী গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়। ঘোষিত নীতিমালা আন্তর্জাতিক পরিবেশ আইনের ভবিষ্যত বিকাশের পথ নিদের্শক। ঘোষণায় উল্লিখিত নীতিসমূহ হচ্ছে:

ক. প্রত্যেক রাষ্ট্রের নিজস্ব পরিবেশ ও উন্নয়ন নীতি অনুসারে নিজস্ব সম্পদ ব্যবহারের অধিকার এবং নিজস্ব কার্যদ্বারা অন্য রাষ্ট্র বা নিজ সীমানার বাইরের পরিবেশ ক্ষতি না করার দায়িত্ব;

খ. শুধু বর্তমানই নয়, ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্যও উন্নয়ন ও পরিবেশের প্রয়োজনের কথা মনে রেখে উন্নয়ন অধিকার বাস্তবায়নের বাধ্যবাধকতা;

গ. টেকসই উন্নয়ন (Sustainable Development), দারিদ্র্য বিমোচন এবং উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহকে সাহায্য প্রদানের বিষয়সমূহের পারস্পরিক সম্পৃক্ততা;

ঘ. পরিবেশ রক্ষার জন্য কার্যকর রাষ্ট্রীয় আইনের প্রয়োজনীয়তা এবং অনেক ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহের জন্য উন্নত রাষ্ট্রসমূহের পরিবেশ আইনের অনুপযোগিতা;

রিও ঘোষণায় যে বিষয়টি লক্ষ্যণীয় তা হচ্ছে এতে উন্নয়নকে অধিকার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, এতে করে দ্বিতীয় পর্বে পরিবেশের উপর যে জোর প্রতিষ্ঠিত হয়ে তৃতীয় পর্বে চূড়ান্ত বিস্তৃতি লাভ করেছিল, অনেকের মতে চতুর্থ পর্বে তা অনেকটা পশ্চাদমুখী হয়ে পড়েছে, অর্থাৎ আবারো উন্নয়নকে প্রথম লক্ষ্য ধরে পরিবেশকে রক্ষার কথা উঠছে।

অতএব বর্তমান কালে 'উন্নয়নের জন্য পরিবেশ' নাকি 'স্বয়ং পরিবেশ' আন্তর্জাতিক পরিবেশ আইনের মূল লক্ষ্য হবে তা নিয়ে এক দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতি ও বির্তকের সূচনা হয়েছে। তবে গ্রহণযোগ্য উন্নয়ন ধারণাটি দু'টো বিষয়বস্তুর মধ্যেই এক সুষম সহাবস্থান আনার চেষ্টা করছে। তাই বর্তমানে পরিবেশ আইন কেবল পরিবেশ রক্ষণ বা সংরক্ষণ সম্পর্কিত নিয়মাবলীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই বরং পরিবেশ আইন অর্থনীতি, উন্নয়ন চিন্তা ও আইন সকল বিষয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে চলেছে এবং এর আওতা দিনকে দিন আরো সম্প্রসারিত হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক আইনের ভবিষ্যত : নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিত

Future of International Law : New Possibitities

বিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষ পর্যন্ত যে আন্তর্জাতিক আইনের সঙ্গে আমরা পরিচিত, তা মূলত জাতি রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। সার্বভৌমত্বের ধারণা ও এর পবিত্রতা আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনের আধুনিক যুগের ইতিহাসে বিজ্ঞানের এই শাখাকে সচল রেখেছে। নিজ ভূ-খণ্ড পরিবেষ্টিত অনেক জাতিরাষ্ট্র তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের জন্য যে বিধিমালা প্রণয়ন ও অনুসরণ করেছে, তাই আন্তর্জাতিক আইন হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। আন্তর্জাতিক আইনের বাস্তবতাকে সম্পূর্ণ রূপে অস্বীকার করতে না পারলেও কতিপয় আইন বিজ্ঞানী আন্তর্জাতিক আইনের আইনী চরিত্র নিয়ে সন্দেহ পোষণ করেছেন এবং একদল আইনজীবী আইনের এই শাখাকে নৈতিকতা বা সুনীতির স্তরে রেখে আন্তর্জাতিক আইনের উপর কুঠারাঘাত করে এর যথার্থতা মেনে নিতে অস্বীকার করেছেন। বস্তুতঃ এই সকল আইনবিদ রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক আন্তর্জাতিক আইনের প্রতিপালনের তুলনায় আইনের লঙ্ঘনের ঘটনার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আন্তর্জাতিক আইনের অসারতা প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন। সংখ্যায় নগণ্য এই আইনবিদগণ আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণে আন্তর্জাতিক আইনের ভূমিকাকে খাটো করবার চেষ্টা করে যদিও সফল হন নি, তথাপি আন্তর্জাতিক আইনের পেছনে বাধ্যকরী কোন শক্তির অভাব এই আইন সম্পর্কে অনেকের মনেই প্রশ্নের উদ্রেক করেছে। এ সবই ছিল আন্তর্জাতিক আইনের ক্রম বিকাশের আধুনিক কাল পর্যন্ত বিস্তৃত। অর্থাৎ একবিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে আমরা আন্তর্জাতিক আইন বলতে যা পাই, তা হলো –

ক. আন্তর্জাতিক আইন একটি Positive আইন, কেননা সকল রাষ্ট্রই, বিশেষ করে যারা আইন বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত, সকলেই এটিকে Positive আইন হিসেবে গণ্য করে এবং প্রত্যেকটি রাষ্ট্রই নিজেকে আন্তর্জাতিক আইন দ্বারা বাধ্য বলে স্বীকার করে।

খ. আধুনিক রাষ্ট্রের সংবিধানই আন্তর্জাতিক আইনের গুরুত্ব ও ভূমিকাকে স্বীকৃতি দেয়। এটি বিশেষ করে প্রযোজ্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত রাষ্ট্রসমূহের ক্ষেত্রে, উদাহরণ স্বরূপ- ১৯৫৮ সালের ফরাসি সংবিধান (প্রস্তাবনা), ১৯৪৭ সালের ইটালীর সংবিধান (অনুচ্ছেদ ১০), ১৯৪৯ সালের ফেডারেল জার্মানীর সংবিধান (অনুচ্ছেদ ২৫), ১৯৮৩ সালের হল্যান্ডের সংবিধান (অনুচ্ছেদ ৯০-৯৫), ১৯৭২ সালের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (অনুচ্ছেদ ২৫) ইত্যাদি।

গ. সাধারণত লক্ষ্য করা যায় যে, যে কোন কূটনৈতিক আলোচনায় রাষ্ট্রসমূহ তাদের স্বীয় অবস্থানকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াসে সর্বদাই আন্তর্জাতিক আইনকে ব্যবহার করে এবং একমাত্র আন্তর্জাতিক আইনের উপর নির্ভর করেই পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। সম্ভবত এই কারণেই আধুনিক বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আন্তর্জাতিক আইন বিষয়ক শাখা রয়েছে।

ঘ. আধুনিক বিশ্ব ব্যবস্থায় প্রত্যেকটি রাষ্ট্রই কোন না কোন আঞ্চলিক বা সার্বজনীন আন্তর্জাতিক সংগঠনের সদস্য। এরূপ প্রত্যেকটি আন্তর্জাতিক সংগঠনই তাদের সদস্য রাষ্ট্রের প্রতি প্রধান যে দাবি জানায়, তা হলো সদস্য রাষ্ট্র কর্তৃক আন্তর্জাতিক আইনের প্রতিপালন। উদাহরণ স্বরূপ জাতিসংঘ সনদের মুখবন্ধে জাতিসংঘভুক্ত জনগণ এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করেছেন যে,

'ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা এবং বিভিন্ন চুক্তি ও আন্তর্জাতিক আইনের বিভিন্ন উৎসপ্রসূত বাধ্যবাধকতার প্রতি সম্মান বজায় রাখার মত অবস্থা সৃষ্টি করার জন্য এবং ব্যাপকতর স্বাধিকারের মাধ্যমে সামাজিক অগ্রগতি সাধন ও জীবনমান উন্নয়নের জন্য জাতিসংঘভুক্ত জনগণ তাদের সমস্ত শক্তি একত্রিত করতে স্থির সিদ্ধান্ত করেছে।'

তাছাড়া সনদের ১.১ অনুচ্ছেদে জাতিসংঘের উদ্দেশ্য হিসেবে যা বর্ণিত হয়েছে, তা স্পষ্টতঃই আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের বিশেষ আস্থা প্রকাশেরই নামান্তর। উল্লেখিত অনুচ্ছেদে বলা আছে –

"জাতিসংঘের উদ্দেশ্য হলো আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সংরক্ষণ এবং এতদুদ্দেশ্যে শান্তি ভঙ্গের হুমকি নিবারণ ও দূরীকরণের জন্য এবং আক্রমণ অথবা অন্যান্য শান্তিভঙ্গকর কার্যলাপ দমনের জন্য কার্যকর যৌথ কর্মপন্থা গ্রহণ এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে ন্যায়বিচার ও আন্তর্জাতিক আইনের নীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আন্তর্জাতিক বিরোধ বা শান্তিভঙ্গের আশংকাপূর্ণ পরিস্থিতির নিষ্পত্তি বা সমাধান।"

ঙ. অনস্বীকার্য যে, রাষ্ট্রীয় আদালত কর্তৃক আন্তর্জাতিক আইনের প্রয়োগ অনেকাংশেই নির্ভর করে সেই রাষ্ট্রের আইনে, বিশেষ করে সংবিধানে, আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি কি ধরনের মনোভাব প্রকাশ করা হয়েছে, তার উপর। তবে আন্তর্জাতিক আইনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে যে সত্যটি বের হয়ে আসে, তা হচ্ছে সংবিধান বা আইনে এতদ্বসংক্রান্ত কোন বিধান সংযোজিত না থাকলেও প্রায় সর্বত্রই কমন ল'-এর সাধারণ নীতিমালা অনুসৃত হয়েছে, যা হলো– 'আন্তর্জাতিক আইন হচ্ছে রাষ্ট্রীয় আইনেরই একটি অংশ'। শুধু তাই নয়, অনেক রাষ্ট্রই আন্তর্জাতিক আইনকে সাংবিধানিক আইনের মর্যাদা প্রদান করেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬ এবং বৃটেনের সংবিধানিক রীতিনীতির কথা।

আর যদি আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালের কথা বলা হয়, তাহলে প্রথমেই বলা প্রয়োজন যে, এদের জন্মই হয়েছে আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে এবং আন্তর্জাতিক আইনের অনুসরণ ও প্রতিপালনের জন্য।

চ. বিংশ শতাব্দীর '৭০ এর দশকের পর থেকে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীর ভূমিকা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা রক্ষার ক্ষেত্রে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তদুপরি ১৯৯০ সালে ইরাক কর্তৃক কুয়েত দখলের পর জাতিসংঘের অধীনে ও তত্ত্বাবধানে বহুজাতিক বাহিনী কর্তৃক ইরাকের বিরুদ্ধে সামরিক শক্তি প্রয়োগ আন্তর্জাতিক আইনের জন্য এক নতুন দুয়ার উন্মোচন করেছে। পরবর্তীতে বসনিয়া ও সার্বিয়া অর্থাৎ যুগোশ্লোভিয়াতে জাতিসংঘ ও ন্যাটো কর্তৃক সামরিক শক্তির ব্যবহার (অবাধ্য রাষ্ট্রকে আন্তর্জাতিক আইন পালনে বাধ্য করার জন্য যে

শক্তি প্রয়োগ করা হয়েছে) ইতোপূর্বের আন্তর্জাতিক আইনের দুর্বলতা অনেকাংশে প্রশমিত করেই ক্ষান্ত হয় নি, বরং আন্তর্জাতিক আইনের শক্তিশালী রূপকে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। এর ফলে শুধু তাত্ত্বিকভাবেই নয়, বাস্তব অর্থেও আন্তর্জাতিক আইন Positive আইন হিসেবে তার অবস্থান আরও সুদৃঢ় করেছে।

বিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষে এসে এমন কিছু ঘটনার উদ্ভব হয়েছে, যা আন্তর্জাতিক আইনের দুর্বলতাকে ম্লান করে এর শক্তিশালী দিকগুলোকে আরও উজ্জ্বলভাবে উন্মোচিত করেছে। উদাহরণ স্বরূপ –

ক. গণযোগাযোগ ব্যবস্থার বৈপ্লবিক উন্নতির ফলে বিশেষ করে ইন্টারনেটের উদ্ভাবন রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের বেড়াজাল ডিঙ্গিয়ে সকল রাষ্ট্র ও জাতিকে একই কাতারে দাঁড় করিয়েছে। যে সকল রাষ্ট্র বিদেশী ধ্যান-ধারণা, আচার, প্রথা ইত্যাদিকে বিভিন্ন কারণে পরিত্যাজ্য হিসেবে গণ্য করে নানাভাবে তাদের রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ বন্ধ করে রেখেছিল, ইন্টারনেট ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সেই লৌহ যবনিকার অবসান ঘটিয়ে এক মুক্তাবস্থার সৃষ্টি করেছে।

খ. মানব জাতির ভেতরে ভাবের আদান-প্রদান শীঘ্রই প্রাকৃতিক মানুষের এক রাষ্ট্র থেকে অন্য রাষ্ট্রে স্থানান্তরের প্রক্রিয়া অর্থাৎ অভিবাসনের পথকে ত্বরান্বিত ও সুগম করেছে। মানুষে-মানুষে নানা ধরনের ভেদাভেদ বাস্তব কারণেই দূরীভূত হয়েছে এবং মানবাধিকারের অংগনকে সুপ্রশস্ত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

গ. বিংশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তে এসে পশ্চিমা বুর্জোয়া গণতন্ত্র ও পূর্ব ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের প্রভেদ আরও স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে এবং বিশ্বব্যাপী মানবাধিকারের পতাকা হাতে নিয়ে জনগণ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এই সংগ্রাম উপনিবেশবাদ, নব্য উপনিবেশবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের যুদ্ধ হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকবে। লক্ষ্যণীয় যে, এই যুদ্ধের আইনগত ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে প্রাকৃতিক আইনের ধারণা। অর্থাৎ যে প্রাকৃতিক আইনের ধারণা আন্তর্জাতিক আইনের বিকাশে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে, বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে ভিন্ন বিশ্ব পরিস্থিতিতে সেই প্রাকৃতিক আইনের ধারণাই জনগণকে সংঘবদ্ধ করেছে এবং জনগণের সহজাত মানবাধিকার আদায়ের সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে অনুপ্রাণিত করেছে।

ঘ. বিশ্ব রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে মিখাইল গর্বাচেভের আবির্ভাব : বিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে সোভিয়েট ইউনিয়নের নেতা হিসেবে মিখাইল গর্বাচেভের আবির্ভাব একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। রাষ্ট্রের অহমিকার চেয়ে ব্যক্তির স্বাধীনতা তার নিকট অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়েছে এবং তার কর্মকাণ্ড পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের পতনের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছে। সমাজতন্ত্রকে একটি মানবিক চেহারা দেবার প্রয়াসে তিনি প্রকারান্তরে সমাজতন্ত্রের ভিত্তিকে নড়বড়ে করে দিয়েছেন। এতদ্বসত্ত্বেও মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে তার অবদান অনস্বীকার্য। সোভিয়েত আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে তার অবস্থানই বার্লিন দেয়াল অপসারণের প্রধান কারণ। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে মানবাধিকারের যে উচ্চ আদর্শে দিক্ষিত হয়ে তিনি তার নীতি ও কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছিলেন, সেটিই প্রকারান্তরে সমাজতন্ত্রের পতন ঘটিয়ে এককেন্দ্রিক পুঁজিবাদী বিশ্বের জন্ম দিয়েছে। এই এককেন্দ্রিক

পুঁজিবাদী বিশ্ব যতই একগুঁয়ে হোক না কেন, তা আন্তর্জাতিক আইনকে যেমন উপেক্ষা করতে পারে না, ঠিক তেমনি আন্তর্জাতিক আইনের উপর সমাজতন্ত্রের প্রভাবকেও অস্বীকার করতে পারে না। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি, জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের নীতি, আন্তর্জাতিক বিরোধ নিরসনে শক্তির পরিহার ইত্যাদি সকল নীতিই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের কল্যাণে আন্তর্জাতিক আইনে সংযোজিত হয়েছে।

ঙ. বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া : সমাজতন্ত্রের পতন, বাজার অর্থনীতি ও এককেন্দ্রিক বিশ্ব বিশ্বায়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছে। এই প্রক্রিয়ার ফলে আন্তর্জাতিক অর্থনীতি সম্পূর্ণ নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে এবং তা আন্তর্জাতিক আইনের বিকাশকেও দারুণভাবে প্রভাবিত করেছে। বর্তমানে বিশ্বায়নের এই প্রক্রিয়ায় আরও অধিকহারে আন্তর্জাতিক চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে substantive law প্রণীত হচ্ছে, যা আন্তর্জাতিক আইনকে আরও বলিষ্ঠ করছে।

বিশ্বায়নের এই প্রক্রিয়ার ফলেই বিশেষ করে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো আরও শক্তিশালী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে, যা চূড়ান্ত পর্যায়ে জাতি রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি সৃষ্টি করেছে। যদিও এই ধরনের হুমকি বা এর ফলে সৃষ্ট আন্তর্জাতিক বিরোধ নিরসনে আন্তর্জাতিক আইনে নানা ধরনের ব্যবস্থা রয়েছে, তথাপি এককেন্দ্রিক বিশ্বে সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রায় সমমর্যাদায় অবস্থিত কোম্পানি বা কর্পোরেশনের সঙ্গে সৃষ্ট বিরোধে এই ব্যবস্থা কতোখানি কার্যকর হবে, তা বিভিন্ন প্রশ্নের উদ্রেক করতে পারে।

চ. আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ : এককেন্দ্রিক বিশ্ব নতুন আধিপত্যবাদের সূচনা করেছে এবং সঙ্গত কারণেই এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে বিভিন্ন রাষ্ট্রের দুর্বল জনগোষ্ঠী বা রাষ্ট্র হতাশার চরম অভিব্যক্তি হিসেবে সন্ত্রাসবাদের পথ বেছে নিয়েছে। দু' মেরুর বিশ্বে শক্তির যে ভারসাম্যতা দুর্বল ও ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহকে বিশেষ করে শক্তিশালী ও আধিপত্যবাদী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণে সাহায্য করেছে, এক মেরুর বিশ্বে তা অসম্ভব। তাই একদিকে ক্ষুদ্র ও দুর্বল রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন যেমন হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে, ঠিক তেমনি বিশ্ব পুঁজির অর্থনৈতিক চাপে সাধারণ মানুষ অনেক সময়ই দিশেহারা হয়ে পড়েছে। এসবই সোভিয়েত পরবর্তী বিশ্ব ব্যবস্থা ও বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ারই ফলাফল।

আমরা তাই দেখতে পাচ্ছি যে একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে আন্তর্জাতিক আইনের অভ্যন্তরে এক দ্বান্দ্বিক ঘাত-প্রতিঘাতের অবস্থা বিরাজ করছে। এটি একদিকে আন্তর্জাতিক আইনকে (যেমন- মানবাধিকার) আরও শক্তিশালী করেছে, অপর দিকে রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে ও সার্বভৌমত্বকে (যে ধারণাটি আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনের প্রাণ হিসেবে স্বীকৃত) নানাভাবে দুর্বল করেছে। যে কোন রাষ্ট্রীয় আইনের ন্যায় আন্তর্জাতিক আইনের পেছনেও যে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় প্রদেয় বাধ্যকরী শক্তি রয়েছে, তা আজ আর কোন প্রশ্নের উদ্রেক করে না। আবার অন্যদিকে পুঁজিবাদী আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার যাঁতাকলে পিষ্ট ক্ষুদ্র ও দরিদ্র রাষ্ট্র বা নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী যদি আত্মনিয়ন্ত্রণের দুর্বার আকাঙ্ক্ষায় ভিন্ন পথ পরিক্রমনে উদ্যত হয়, তাহলে সেটিকে যে সন্ত্রাসবাদ হিসেবে আখ্যায়িত করা হবে না, তারই নিশ্চয়তা বা কোথায়? ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার এই দ্বান্দ্বিক সম্পর্কই হচ্ছে উত্তর-আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনের বর্তমান পরিচয়। এই পরিচয়টি নির্দিষ্ট কোন রূপ পরিগ্রহ করবে কি না, তার উত্তর দিতে পারে কেবল অনাগত ভবিষ্যত।